আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান

[ALLAMA FOZLUL KARIM NOXBONDI MUZADIDY(RH.) ঃ HIS CONTRIBUTION TO PREACH AND SPREAD OF ISLAM]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুহাম্মদ ইসমাইল কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান** [ALLAMA FOZLUL KARIM NOXBONDI MUZADIDY(RH.) ঃ HIS CONTRIBUTION TO PREACH AND SPREAD OF ISLAM]" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি তাঁর মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্যত্র ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং গবেষককে এম.ফিল ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান** [ALLAMA FOZLUL KARIM NOXBONDI MUZADIDY(RH.) ঃ HIS CONTRIBUTION TO PREACH AND SPREAD OF ISLAM]" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। আমি এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

মুহাম্মদ ইসমাইল
এম.ফিল. গবেষক
রেজি. নং- ৪৫
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যাঁর একান্ত মেহেরবানীতে আমি আমার **"আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান** [ALLAMA FOZLUL KARIM NOXBONDI MUZADIDY(RH.) ঃ HIS CONTRIBUTION TO PREACH AND SPREAD OF ISLAM]" শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। অগণিত দুরূদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে আজমা'ঈন, তাবে'ঈন, তাবে' তাবে'ঈনসহ কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবেন তাঁদের প্রতি।

যথাযথ সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ স্যারের প্রতি। যিনি আমাকে হাতে-কলমে গবেষণাকর্ম শিখিয়েছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি পর্যায়ে তিনি আন্তরিকতার সাথে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান, উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। যিনি নিরলস সময় ব্যয় করে এ অভিসন্দর্ভটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে তা প্রাণবন্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি, অধ্যায় বিন্যাস এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁরই আন্তরিক সহযোগিতায়।

এছাড়া আমি অধ্যাপক আব্দুল মালেক, অধ্যাপক ড. আ. র. ম আলী হায়দার, অধ্যাপক ড. আব্দুল বাকী, অধ্যাপক. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যার সহ বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহা. শফিকুর রহমান এবং সকল শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ সময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মাওলানা এ.টি.এম. রফিক উল্লাহ্ ও মা উম্মুল খায়ের সাহেদা খানমকে। তাঁদের দু'আ আজও আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় হয়ে রয়েছে। সন্তানের সুখ-সম্মৃদ্ধি কামনায় তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরনীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার পিতা-মাতার পবিত্র আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সহধর্মিণীকে যার অকৃত্রিম ত্যাগ, ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা আমার এ গবেষণাকর্মকে সুন্দর করেছে। আমার গবেষণাকর্ম নির্বিঘ্ন করার ক্ষেত্রে তার ত্যাগ অতুলনীয়।

গবেষণা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন বই ও সাময়িকী অনুসন্ধানের জন্য আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ধরনের লোকের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়েছি। বিশেষত আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ)-এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও উত্তরসূরীগণ এবং তাঁর গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ী অনুসারী পরম্পরার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের একান্ত সহযোগিতা ছাড়া আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন দুঃসাধ্য হতো। সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসইটি লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীর প্রতি যাঁরা আমাকে হৃদ্যতাপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সবশেষে আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। অমীন।

- মুহাম্মদ ইসমাইল

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا	=	অ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	ছ
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	ঝ
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ/য
ط	=	ত/ ত্ব
ظ	=	য
ع	=	‘

غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ওয়া
ه	=	হ
ء	=	’
ي	=	য়
عَ	=	‘আ
عِ	=	‘ই
عُ	=	‘উ
يا	=	ইয়া
ـِي	=	য়ি
إي	=	ী
أى	=	ঈ

أُ	=	উ
أُو	=	ঊ
يى	=	য়ী
وُ	=	ঊ
وُو	=	ঊ
ي	=	ইয়া
ا	=	আ
عو	=	‘ঊ
و	=	ু
وِى	=	বী/ভী
يو	=	ইয়ু
ـَ	=	া
ـِ	=	ি
ـُ	=	ু

বিদ্রঃ

- উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কোন কোন বানান বাংলাভাষায় অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

- যেসব ‘আরবী শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল-কুর'আন, ১০ : ২০	প্রথম সংখ্যা সূরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
আ.	'আলায়হিস্ সালাম
ইমাম বুখারী	আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ আছ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমাদ	আহমাদ ইব্ন হাম্বল
ইমাম ত্বাহাবী	আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আত-ত্বাহাবী
ইব্ন কাছীর	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কুরতুবী	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন ফার্‌রাহ আল-কুরতুবী
তাবারানী	আবুল কাসেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ আত-তাবারানী
বায়হাকী	আহমাদ ইবন হুসায়ন আল-বায়হাকী
যাহাভী	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'উছমান আয-যাহাভী
রাযী	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'উমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসায়ন ফখরুদ্দীন আর-রাযী
শাওকানী	মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী
খ্রি.পূ.	খ্রিস্ট পূর্ব
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
তা.বি	তারিখ বিহীন
(রহ.) /(র.)	রহমাতুলাহ 'আলায়হি
(রা.)	রাদিয়ালাহু 'আনহু/ 'আনহুম/'আনহা/'আনহুমা/'আনহুন্না
(সা.)/ (স.)	সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম।
ed.	Ediotor(s) /Edited
Ibid.	ibidem
N.D	No Date.
Op.cit	Opera citato
P. pp	page/ pages.
Vol.	Volume(s)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান

ভূমিকা

পরম করুণাময়ের মহান দরবারে আমাদের কৃতজ্ঞতার মস্তকাবনত অনন্তকাল, যিনি যুগ থেকে যুগান্তরে কাল থেকে কালান্তরে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাঁরই গুণগানের এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু রাসূল আকরামের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালামের ধারাবাহিকতা রক্ষার উপায় বাতলে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে সাহাবীগণ (রা.) তাবেঈন, তাবে' তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, সালফে সালেহীন, উলামায়ে হক্কানীয়ীন (রহ.) বিশেষত: ইলমে হাদীস চর্চার অক্লান্ত সাধক ও বিরামহীন ত্যাগ-তিতিক্ষাকারী প্রাণপুরুষ আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা যিনি বাতিলের বহুমুখী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সুবিস্তৃত জাল ছিন্ন করে সুন্নীয়তের অঙ্গনকে আবাদ রেখেছেন। যিনি ছিলেন নবী প্রেমিক মনীষীগণের অন্যতম। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী, মর্মস্পর্শী বাগ্মিতা ও হৃদয়গ্রাহী পাঠদান ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা, আদর্শ, আমল-আখলাক, তাহযীব-তমুদ্দুন সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব বঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে অসাধারণ মেধাবী এ ব্যক্তিত্বের জন্ম। যুগে যুগে এরূপ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের ইহধামে আবির্ভাব ঘটেছে। যাঁরা ধর্মীয় প্রচার প্রসারে স্বীয় সহায় সম্পদ ও জীবন বিলীণ করে দিয়ে জাতীয় পর্যায় হতে আন্তর্জাতিক অঙ্গন পর্যন্ত সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন; তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একাডেমিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আত্মগঠন করে তিনি শিক্ষকতার মহান পেশা ও ওয়ায নসিহতের ভিত্তিতে বাংলার জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নেন। তাঁর প্রমাণ ভিত্তিক দৃঢ়চেতা বক্তব্য, আপোষহীন বিতর্কানুষ্ঠান ও কলম যুদ্ধ মানুষের হৃদয়কে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। তিনি মানব সমাজের হৃদয়স্পন্দন হয়ে আছেন স্বীয় কঠোর সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও জনসেবার মাধ্যমে। তাঁর সংস্পর্শে এসে বহু শিক্ষার্থী বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথার্থ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

কবির সে উচ্চারণ "মরিতে চাহিনা আমি এ সুন্দর ভূবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" তবুও মানুষের বিশ্ব স্রষ্ঠার নিয়ম মেনে গ্রহণ করতে হয় মৃত্যুর স্বাদ। সকল ধর্মের অলংঘনীয় বাণী- "কুল্লু নাফসিন যাইকাতুল মাউত (প্রত্যেক প্রাণেরই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে)।"[১] এর আলোকে মানুষ বিদায় নিলেও তাঁর কর্ম বেঁচে থাকে উত্তর প্রজন্মে। স্মৃতিময় হয়ে উঠেন তিনি তাঁর কর্মেই। অনাগত প্রজন্মে চলে যায় তাঁর কাজের মূল্যায়ন

১. আল-কুরআন, ৩ : ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ও পর্যালোচনা। যাঁর কর্ম পরিধি যতো বিস্তৃত, তিনি মানুষের স্মৃতিতে শ্রদ্ধার সাথে ততো বেশী দিন বেঁচে থাকেন। তাই শত বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে হারিয়ে যাওয়া কবি আধুনিক প্রজন্মের সাথে কথা বলেন, "আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি মোর কবিতা খানি কৌতুহল ভরে।"[২] কোন ব্যক্তিত্বের স্মৃতি রক্ষিত হলে এভাবেই প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে মানুষের তৎপরতা, বেঁচে থাকে তার কর্মের যশ-খ্যাতি ও গীতি গাথা ইত্যাদি।

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান, "তোমরা তোমাদের প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের সুন্দর আচরণগুলো স্মরণ কর।"[৩] এছাড়া "হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা (হাদিস) শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবে অন্যজনের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। অনেক সময় এরূপ হয় যে, মূল হাদীস শ্রবণকারীর চেয়ে যাদের কাছে বর্ণনা করা হয়, তাদের অনেকে অধিক বোধ সম্পন্ন ও সংরক্ষণকারী হন।"[৪]

মুহাদ্দিস জগতের কিংবদন্তী, অসংখ্য মুহাদ্দিসের প্রাণপ্রিয় উস্তাদ, যাঁর স্মৃতি আজো বিশ্ব বিবেককে উদ্বুদ্ধ করে। যাঁর বিনয়, নম্রতা, সরল অভিব্যক্তি, অমায়িক আচরণ, নবীপ্রেম মানবতাকে নাড়া দেয়। শত পারঙ্গমতায়ও যাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি অহংবোধ, তাঁর নিরহংকার, নিভৃতাচারণ, জ্ঞান-সাধনা, প্রচার বিমুখতা, সদা হাস্যোজ্বল, লাস্যময় ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)।

বস্তুতপক্ষে, অন্যায়-অত্যাচারী, অপরাধী ও বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী এবং সদা সচেতন ও জাগ্রত বিবেক এ মহৎ ব্যক্তির জীবন-কর্মের মাঝে তাঁর অবদানসমূহ তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য অভিসন্দর্ভের আলোকপাত।

---

২. রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা* (ঢাকা : তাজিন বই ঘর, ২০১০), পৃ. ১৪২
৩. ইমাম শেখ ওলিউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতিব আত-তিবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কিতাবুল আদব, বাবু খুলুকুল হাসানি, হাদীস নং- ১৭, পৃ. ২৯
৪. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৬, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান

সূচীপত্র

প্রত্যয়নপত্র II
ঘোষণা পত্র III
কৃতজ্ঞতা স্বীকার IV
প্রতিবর্ণায়ন VI
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা VII
সূচীপত্র VIII
ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় : আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.)-এর জন্মের পূর্বকালীন অবস্থা ৪-১৭
প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক অবস্থা.....৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক অবস্থা ৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা.....১০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক অবস্থা.....১৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : পারিবারিক অবস্থা ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) সমকালীন পরিবেশ ১৮-৪০
প্রথম পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক পরিবেশ.....১৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সামাজিক পরিবেশ.....২২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ২৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিক্ষার পরিবেশ.....২৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ৩৯

তৃতীয় অধ্যায় : আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) : জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিবারিক জীবন। ৪১-৬০
প্রথম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও বংশ পরিচয়.....৪২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শৈশব, কৈশোর ও বাল্যকাল ৪৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা জীবন ৪৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ গমন.....৪৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর তাসাউফ চর্চা ও আধ্যাত্মিক জীবন ৬১-৯৩

প্রথম পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক শিক্ষার হাতেখড়ি ৬২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রিয়াসাতে রামপুরের বাইয়াত, ইযাজাত ও খিলাফাত গ্রহণ ৬৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ছারছীনা অধ্যয়নকালীন বাইয়াত ৬৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ফুরফুরা শরীফের বাইয়াত ও দীক্ষা গ্রহণ ৬৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইসলাম প্রচারে তাসাউফের চর্চা ও প্রয়োগ ৭০

পঞ্চম অধ্যায়: আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর কর্মজীবন ৯৪-১২৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : মুহাদ্দিস পদে ৯৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উপাধ্যক্ষ পদে ১০৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অধ্যক্ষ পদে.....১০৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শায়খুল হাদীস পদে..... ১১১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আল্লমা নক্সবন্দীর ইনতিকাল, কাফন ও দাফন... ১১৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর অবদান ১২৫-১৯৫
প্রথম পরিচ্ছেদ : লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ১২৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাগ্মীতার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ১৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সম্মুখ মুনাযারার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ১৪৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : চরিত্র ও কারামতের প্রভাব.....১৫১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আদর্শ ও সফল শিক্ষকতা, পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষানুরাগ ১৫৮

উপসংহার ১৯৫
গ্রন্থপঞ্জি ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.)-এর জন্মের পূর্বকালীন অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক অবস্থা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক অবস্থা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : পারিবারিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.)-এর জন্মের পূর্বকালীন অবস্থা

"আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে তার ইহধামে আবির্ভাব পূর্বকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিপার্শ্বিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থাসহ যাবতীয় এবং সাবির্ক অবস্থা তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। স্বভাবতই কোন মনিষী পৃথিবীতে আগমনকালীন বিশ্ব স্রষ্টার পক্ষ হতে বিভিন্ন নিদর্শনাবলী পরিলক্ষিত হয়। যা কেবল জ্ঞানবান, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ তথা গবেষকমাত্র উপলব্ধি করতে পারেন। এ জন্যেই মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেন-

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

অর্থ- হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা গবেষণা কর।[১]

অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন,-

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

অর্থ- নিশ্চয়ই তাতে (পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবর্তনে) চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ নিদর্শন বিদ্যমান।[২]

সুতরাং যাবতীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদির সম্পূর্ণ কিছুর মধ্যেই মহান আল্লাহর বিশেষ কিছু রহস্য (Mistry) অন্তর্নিহীত রয়েছে। যুগে যুগে আল্লাহর নবী, রাসূল, ওলী, গাউছ, কুতুব তথা মহামানবগণ ধরায় আভির্ভাবকালীন আল্লাহ তায়ালা এ সকল নিদর্শনাবলীর অবতারণা করেন, যা দ্বারা বিশ্ব মানবতা চক্ষুষ্মান হয়ে শিক্ষা নিতে সক্ষম হন।

লক্ষ্মীপুর সদর থানার অন্তর্গত ২নং দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়নস্থ নন্দনপুর গ্রামের অধিবাসী শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লাম আল্লামা মাওলানা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) ইহধামে আগমনপূর্ব কালেও এরূপ বিশেষ কিছু অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। নিম্নে তারই সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হলো:

---

১. আল-কুরআন, ৫৯ : ০২
২. আল-কুরআন, ০৩ : ১৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক অবস্থা

যে কোন সমাজের সামাজিক ইতিবৃত্তের প্রভাব ঐ সমাজের সাধারণ ব্যক্তি পরিবার থেকে আরম্ভ করে সমাজ সত্ত্বার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেমন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বিশ্বাস, জাত, শ্রেণি, আচার-আচরণ, নীতি-প্রথা, শিক্ষা-দীক্ষা, সভা-সমিতি, সংগঠন-আন্দোলন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সভ্যতা, সংগীত, আনন্দ-উৎসব, চারু-কারু, লোকশিল্প, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, আন্তঃশ্রেণি সম্পর্ক, খ্যাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা ইত্যাদির মধ্যে প্রবেশ করে। উল্লেখিত সকল কিছুই ঐ সমাজের সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

ইসলাম ধর্ম ও মুসলিমদের প্রেক্ষিতে যদিও বাঙালী মুসলিমগণের মাঝে হিন্দু সমাজের ন্যায় কঠোর বর্ণবৈষম্য এবং পুরোহিত শাসন বিদ্যমান ছিল না, তথাপি কার্যত: মুসলিমগণ ভারতের সর্বত্র বংশ গৌরবকে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট বৈষম্যবোধ গড়ে তুলেছিল।[৪]

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ বাংলা 'ইসলাম প্রচারক' ধর্ম বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় "সমাজ : কালিমা' নিবন্ধে মুসলিম সমাজের একটি চিত্র এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

> "ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের নিকট হইতে অনেক নিকৃষ্ট আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কাণ্ড আয়ত্ব করিয়া লইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন 'কুলীন' আছেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও সেরূপ 'শরীফ' আছেন। ... এই সকল হীনচেতা শরীফ মহোদয়গণ কৌলিন্য মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নীচ শ্রেণীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে বা কৃষক শ্রেণির লোকের কন্যা গ্রহণ করিবার সময় 'বিবাহের পন' দাবী করিয়া বসেন। ... এইরূপ ব্যবসা মুসলমান ধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।"[৫]

ভাদ্র, ১৩২৬ বাংলা 'আল-এসলাম' মাসিক পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় মোহাম্মদ ময়জুর রহমান লিখিত 'সমাজ চিত্র' নিবন্ধে সেই সময়ের অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়।

> ".... শরিফ মুসলমানগণ অশরিফ মোসলমানগণকে সভ্য হইতে ও বিদ্যার্জন করিতে দিতে বড়ই নারাজ, পাছে অশরিফরা নিজেকে শরীফ বলিয়া ফেলে আর শরীফের সমকক্ষ হয়। শরীফগণ মনে করে যে তাহাদের রক্ত, মাংস, অস্থি মজ্জা, আত্মা যাহা কিছু আছে সবই পৃথক, অশরিফগণের একটার সহিতও মিল নাই। অতএব, শরিফগণ যাহার অধিকারী অশরিফগণ তাহার অধিকারী নহে।"[৬]

অগ্রাহয়ন, ১৩২৬ বাংলা, 'আল-এসলাম' ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যায় মুনিরুজ্জামান এসলামাবাদী কর্তৃক লিখিত 'সমাজ সংস্কার' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়-

---

৩. ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩খ্রি.), খ.৩, পৃ. ০৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৫. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭খ্রি.), পৃ. ৬১
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

> "উত্তর বঙ্গে বাদিয়া, নিকারী ও আসামের মাঠিয়া উপাধি বিশিষ্ট মোসলমানগণ এক সঙ্গে অন্য মোসলমানের সহিত বসিয়া আহার করা দূরে থাকুক এক মছজেদে, এক ঈদগাহ বা মাঠে নামাজ পড়িতেও পারে না। মধ্য বংগে নদীয়া, চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে কোন নীচু জাতীয় হিন্দু মোসলমান হইলে তাহাকে সমাজে নেয়া হয় না, জুমা জামাতে শরীক করা হয় না।"[৭]

মাওলানা আকরাম খাঁ তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপন করেন-

বাংলার মুসলিম সমাজের সামাজিক ইতিহাস জানতে হলে বঙ্গ দেশের ও তার সমসাময়িক হিন্দু অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে জানা দরকার। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে রাক্ষস, পিশাচ, অসুর প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেছেন।[৮]

"মূলত: ফার্সী সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী ভাবধারা বাংলার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছে এবং দীর্ঘকাল পরে বিভিন্ন বিকৃত মতবাদগুলো উর্দু সাহিত্যের মধ্যে বিপুল পরিমাণে প্রবেশ লাভ করে।"[৯]

তাহলে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো যে, আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে যখন সামাজিক কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী ভাবধারা মুসলিম সমাজে হানা দেয়, ঠিক এমনই এক সময়ে **১৯৩১** খ্রি. সনের কোন এক উষা লগ্নে ইহধামে আগমন করেন।[১০] তাঁর আগমনকালীন সমাজের মুসলিম ধারায় ছিল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য নিয়ে বিরোধ-বিসম্বাদ আর পাশাপাশি হিন্দু সমাজের কৌলিন্য ও উচু-নীচু শ্রেণির দ্বন্দ্ব সর্বদা লেগেই ছিল।

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৮. মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা : আজাদ অফিস, ১৯৬৫খ্রি.), পৃ. ৫৮-৫৯

৯. মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

১০. হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আব্দুল আলীম রিজভী, *আসলাফ-ই-জামেয়া* (চট্টগ্রাম : জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া শিক্ষক পরিষদ, ষোলশহর, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭), পৃ. ৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক অবস্থা

বাংলার মুসলিমগণের বহুবিধ বংশীয়, গোত্রীয়, ইত্যাদি ধারায় বিভিন্নভাবে বিভক্ত মানব সমাজের মাঝে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠা ছিল খুবই দুরূহ বিষয়। তবুও, বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলের মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নে বাংলার মুসলিমদের রাজনৈতিক পুনঃজাগরণে যে দু'জন মনিষী বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তাঁরা হলেন- (১) স্যার সৈয়দ আহমদ ও (২) স্যার সৈয়দ আমির আলী।

মুসলিম নেতৃবৃন্দের মাঝে সৈয়দ আমির আলী সর্বপ্রথম মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন এবং ১৮৭৭ খ্রি. তিনি মুসলিমদের জন্য সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে "Centeral National Mohammadan Association" বা কেন্দ্রীয় জাতীয় মোহামেডান সংস্থা স্থাপন করেন।[১১]

১৯০৫ সালে বাংলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে হিন্দু সমাজের বঙ্গভঙ্গ রদ আরেক দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলিম সমাজের তা রক্ষার চেষ্টা প্রচেষ্টায় উভয় গোষ্ঠীর মাঝে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। এরই প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষে ১৯০৬ খ্রি. মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা মুসলিম সমাজকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর করে দেয়। আর এতে মুসলিম লীগ নেতা জনাব নবাব সলিমুল্লাহ ও এ.কে. ফজলুল হকের অবদান ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ।[১২]

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে যখন আন্দোলনে বঙ্গের মুসলিমগণ অগ্রসর হতে থাকেন তখনই এবং তার পরবর্তী সময় তা ১৯০৬ খ্রি. ও তৎপরবর্তী সময়গুলোতে বাংলার রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ফলে বৃটিশদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল।[১৩]

সর্বদিকে বৃটিশ বিরোধী হিন্দু-মুসলিম আন্দোলনে তারা ছিল দিশেহারা। পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি বাংলায় জনগণের জাগরণেও বৃটিশদের মাঝে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে।

---

১১. ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৮৭ ; ড. এম.এ.রহীম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ১৬০

১২. ড. এম.এ.রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১; ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪

১৩. ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯

অবশ্য মুসলিম লীগ গঠনের পর এ দলের নেতৃত্বেই মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলন সমূহ অব্যাহত থাকে।

এ সময়কালে বিশ্বব্যাপী যেমন জাতি রাষ্ট্রের (Nation State[14]) উদ্ভব ঘটতে থাকে তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশেও আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস ও বৃটিশদেরকে বিপাকে ফেলে দেয়। কেননা, একদিকে কংগ্রেস অপরদিকে মুসলিম লীগের ন্যায় রাজনৈতিক দলসমূহের ছায়াতলে সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষোভ বিরোধ অবলীলায় সাহসের সাথে প্রকাশ করতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে বৃটিশ শাসনকে নতি স্বীকারে বাধ্য করা হয়। পরাজিত হয় বৃটিশ Divide and Rule বা ভাগ কর, শাসন কর নীতি।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করে জাতীয় আইন পরিষদে এই সমিতির নেতৃত্ব প্রদান ও এ দলটি কৃষক সমাজের মুখপাত্ররূপে কাজ করার সুযোগ লাভ করে।[১৫]

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী যতই চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুক না কেন ধীরে ধীরে তাদের শাসনের-শোষনের যাবতীয় কলা-কৌশল অস্তমিত হয়ে পরাজয়ের গ্লানির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সময়ে বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি, সঠিক অবস্থা ছিল অতীব উত্তেজনাকর ও বেদনাদায়ক। এজন্যই বলা হয় ১৯৩৭ খ্রি. হতে ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত এ দশকটি বাংলার জন্য উত্তেজনাময় ও বেদনাদায়ক ছিল।[১৬]

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ফলে সর্বত্র এক অসহিষ্ণু পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। একদিকে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থান, অন্যদিকে জনগণের বিক্ষোভ-বিদ্রোহের কারণে কোথাও কোথাও সাংঘর্ষিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ব্যাপকভাবে জনগণের আহত-নিহতের পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়। এ অসহিষ্ণু প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী আর টিকতে না পেরে বাধ্য হন এ জাতিকে স্বাধীন করে দিতে। সৃষ্টি হয় দুটি দেশ 'পাকিস্তান' ও 'ভারত'।

চারিদিকে যখন স্বাধীকার আন্দোলনের অবস্থা বিরাজিত। সে মুহূর্তেই আল্লামা নক্সাবন্দীর (রহ.) ইহধামে আগমন ঘটে।

---

১৪. Nation State : এরূপ জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা প্রথম প্রদান করেন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক ম্যাকিয়াভেলী। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ The Prince-এ। একটি জনগোষ্ঠী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে সচেতন হয়ে উঠলে এবং একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র গঠনে আগ্রহী হলে, তখনই জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৫. ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

১৬. ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

মুসলিম বাংলা এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী মুসলিম রাষ্ট্র যার সীমান্তে কোন একটি ইসলামী বা মুসলিম দেশের সীমান্ত নেই। তবুও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুসলিম স্বাধীন দেশরূপে আত্মপ্রকাশ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। বিশ্বের অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হলো বাংলাদেশ। এটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশও বটে।

আর এদেশের ধর্মীয় অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও বিভিন্নমূখী। এ বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে শাসকগণ ইসলাম ধর্মকে বিভিন্নভাবে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। সুলতানগণ ও তাঁদের পরিবার-পরিজন, তুর্কি সামরিক অভিজাততন্ত্র, সূফী পণ্ডিতশ্রেণি ও তাঁদের সহচরগণ কিছু সংখ্যক বিদেশী ব্যবসায়ী ও স্থপতি কারিগরের সমন্বয়ে একটি নগর কেন্দ্রিক সামাজিক স্তর গড়ে উঠেছিল। কিছুটা সরলভাবে বলা যায়- এ স্তরের সংস্কৃতি ছিল নগর ভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতি।[১৭]

এদেশের ধর্মীয় রীতি-নীতিতে প্রায়ই সূফীভাবাপন্ন মরমীবাদীগণের প্রভাব সর্বদাই ছিল। সূফী-সাধকগণই এদেশের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে ছিলেন। বিশেষত ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতকে বাংলার সূফীভাবাপন্ন মরমী কবিগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নেতৃত্ব দেন।[১৮]

পরবর্তী সময়ে মুসলিম ধর্মীয় রীতি-নীতিতে কিছুটা হিন্দু, বৌদ্ধসহ বিধর্মীদের রসম ও রেওয়াজ প্রবেশ করতে দেখা যায়। তা অবশ্য ধীরে ধীরে তীরোহিত হয়ে যায়। তখন (মুসলিম বিজয়কালীণ সময়) রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে-সাহিত্যে দৈনন্দিন জীবনে যৌথ অনাচার, নির্লজ্জ কামপরায়নতা, মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিহীনতা এবং অলংকার বাহুল্যের বিস্তার সমাজদেহে দুষ্টখতের ন্যায় প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল।[১৯]

ভিনদেশী শক্তির আবির্ভাবপূর্ব কালেও এদেশে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। অসংখ্য দেবদেবীর পূজা-অর্চনা দেশের আনাচে কানাচে চলতো, এ সকল দেব দেবীর বিশ্লেষণে এটা পরিলক্ষিত হয় যে, তাদের মধ্যকার অনেকেরই রূপকল্পনায় বহু দেশী-বিদেশী আর্য-অনার্য ও সংস্কৃত-লোকজ উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। দেব-দেবীর মাঝে প্রায়ই যাদুশক্তি ও প্রজনন শক্তির প্রতীক বিদ্যমান ছিল। পাল ও সেন আমলে জৈন ও বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। গ্রামীণ কৃষি সমাজে কতগুলো পুজা ও ব্রত চালু

---

১৭. আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলার ধর্মজীবন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭খ্রি., খ.১), পৃ. ২৪২

১৮. আব্দুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাংগালী সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) পৃ. ১৮৯-১৯০

১৯. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২বাংলা), পৃ. ৭১২

ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু দেবমন্দির ও বৌদ্ধ তীর্থস্থান নির্মিত হয়। বিষ্ণুর উপসনাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও পূর্ব ভারতীয় সমাজে কম ছিল না। মুসলিম সমাজের অগ্রগতিতে হিন্দু রাজশক্তি ও সামন্ত শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তবে, অবশ্য কৌম সমাজের রূপান্তরিত মুসলমানদের অনার্য দেবদেবী চর্চা ও লৌকিক পার্বন অব্যাহত ছিল। এ ধর্ম ও ইসলামী নীতি-আদর্শের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে প্রধানত প্রশাসকদের উদ্যোগে মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, দরবার, মোহাফেজখানা, ইয়াতিমখানা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল। মাদরাসাগুলোতে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, আরবী, ফার্সী, উর্দু ইত্যাদি বিষয়সহ কয়েকজন সূফী সাধকের জীবনীকে সিলেবাসরূপে পাঠদান করা হত।

তাফসীর হাদীস, আইনশাস্ত্র, ধর্মীয় দর্শন ইত্যাদি পাঠের পাশাপাশি ঐতিহাসিক ধর্মীয় বিষয়বস্তু চর্চার সাথে সাথে সূফী আধ্যাত্মিকতাও তাঁরা অনুশীলন করতেন।

সূফীগণের খানকা ও দরবারসমূহে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সমাগম হতো। সূফীগণের কারামত, অলৌকিক ঘটনারাজি, তাঁদের সহজ-সরল জীবন যাপন ও আন্তরিক ধর্মপরায়নতায় অনেকেই মুগ্ধ হতেন। এছাড়া বৌদ্ধ, গুপ্ত সহ বিভিন্ন কাওমের লোকজন এবং অন্তজ ও পতিত শ্রেণির হিন্দু ছিল ব্রাহ্মন্য বর্ণব্যবস্থার বাইরে। তাঁদের পক্ষে সূফীগণের খানকায় ইসলাম গ্রহণ ছিল খুবই স্বাভাবিক। খানকা, দরগাহ, দরবার, সংরক্ষণের জন্যে জন প্রশাসকগণ নিষ্কণ্টক জমি বরাদ্দ দান করতেন। এ জাতীয় ভূমি বন্দোবস্ত অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম প্রচারের বাস্তব ভিত্তিরূপে কাজ করেছে। ইংরেজ আমলেও এদেশের মধ্যযুগীয় ইসলাম প্রচার ব্যবস্থার ধরন ও ইসলাম চর্চার প্রকৃতি একই রকম বিদ্যমান ছিল।

অপরদিকে মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ লগ্ন হতেই মুসলিম লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদগণ আরবী ও ফার্সীর পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্যে মুসলিমদের উৎসাহিত করেন।[২০]

১৯১৩-১৭ খ্রি. দেশের পঞ্চ বর্ষিক শিক্ষা পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, একজন সাধারণ মুসলিম তাঁর সন্তানকে মাদরাসায় মুসলিম আইন, সাহিত্য, যুক্তি বিতর্ক, দর্শন, হাদীস ও তাফসীর পড়াতে বেশী আগ্রহী ছিলেন, কারণ তাঁর চিন্তাধারা ছিল বাংলার একজন অমুসলিমের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও ভিন্নরূপ।[২১]

১৯২০ খ্রি. শ্রাবন ১৩২৭ বাংলা 'আল-এসলাম' মাসিক পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

---

২০. ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, *৩য় খণ্ড*, পৃ. ৭৩১
২১. *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৫

> "... ... শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ অনুকরণে জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ, কোট-প্যান্ট, শার্ট-টাই ব্যবহার করা, ইংরেজি ফ্যাশনে কলার নেকটাই ধারণ করা, হুক্কা-তামাক ছাড়িয়া সিগারেটের ধুমোদগার করা, আহারের সময় ফরাসস্থলে চেয়ার টেবিল, হাতের পরিবর্তে কাঁটাচামুচ, ছুড়ি ব্যবহার ধরিয়াছে। অপর দিকে হিন্দু সমাজের অনুকরণে আচকন পায়জামার পরিবর্তে ধুতি চাদর, টুপির স্থলে নগ্ন মস্তক, টেরি কাটিয়া, রমনী সুলভ নানা প্রকারের চুলের বাহার করিয়া বিচরণ করা আধুনিক সভ্যতার নির্দশন বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল।"[২২]

এরূপ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ সমাজের ছিল মিশ্রতা, দেশী-বিদেশী, স্বদেশী-ভিনদেশী মিলিয়ে আবহমান কাল হতেই বঙ্গে একটি মিশ্র সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটে। সে ধারাবাহিকতায়ই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহুমুখী কৃষ্টি-কালচারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রভাব পড়ে মানুষের চরিত্রেও। সমাজে বহুরূপী চরিত্রের নিদর্শনাবলীর উদ্ভব ঘটে।

২২. মুস্তফা নূর উল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭খ্রি.), পৃ. ৭২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক অবস্থা

বঙ্গীয় অর্থনৈতিক অবস্থা কোনকালেও উন্নত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়নি। বৃটিশ উপনেশবাদী শাসনে জমিদারী প্রথা, জায়গীরদারী প্রথা, ধান চাষের পরিবর্তে নীল চাষ, অর্থের বিনিময়ে মিঞা, ভূইয়া, চৌধুরী, পাটোয়ারী, খান ইত্যাদি বংশীয় উপাধি বিক্রিসহ প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই বাঙালীকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের বিপরীত মেরুতে রেখে সঠিক ও উন্নতি মূলক কৃষি, ব্যবসা, চাষাবাদ, পশুপালন, মাছ চাষ ইত্যাদি যথাযথ পদক্ষেপ হতে ফিরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমূখী দিকে ধাবিত করা হয়েছিল। আর এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী উপমহাদেশকে দুইশত বছর বিভিন্ন কলা-কৌশলে শাসন-শোষণ করেছিল।

সুদীর্ঘ দুইশত বছরের শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ঠ উপমহাদেশবাসী যখন ইংরেজি ভাষায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাদের সমাজ, রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থা ও শাসন-শোষণের বিভিন্ন বিষয় অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে এবং জেগে উঠেছে, তখনই কেবল বৃটিশ এ উপমহাদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে।

"বাঙালী জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জল দিক বোধ হয় তাদের অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ড। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঙালীরা ছিল অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ।"[২৩]

নিজস্ব বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে উন্নত চাষাবাদের ক্ষেত্রে যে সকল পশ্চাৎপদ সমাজে যথাযথ কৃষি ঋণের প্রয়োজন ছিল তা সঠিক সময়ে না পাওয়া, কৃষি ক্ষেত্রে সেকেলে পন্থা অনুসরণ এবং আধুনিক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত থাকায় বাঙালী তাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরই থেকে যায়।

"প্রতিটি স্তরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল ঋণ প্রাপ্তির উপরে। কিন্তু, ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ ধরনের ব্যবস্থাকে সংকট জনক বলে বিবেচনা করা হতো এবং টাকা ধার করার ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশী।"[২৪]

১৮৫০ এর দশক হতে ১৯১৪ খ্রি. পর্যন্ত সময়কাল বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের সংগে ভারতীয় কৃষি পণ্যের বিনিময়ে বাণিজ্য সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত।

অথচ সেই কৃষিজ সম্পদের উৎপাদনে অবহেলা করা হয়েছিল যথেষ্ট পরিমাণে। কোনরূপ বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ পূর্ববর্তী মনগড়া নিয়ম-নীতিতে চলে আসছিল সকল প্রকার কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি। ফলে, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেড়ে লাভের পরিবর্তে লোকসানই বেশী ছিল। এভাবেই বাংলায় অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা পরিলক্ষিত হতে থাকে।

২৩.ড. মুহা. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড*, পৃ. ১
২৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫

শ্রমিক সমাজ নিদারুন গায়ে খেটে ভীষন কষ্ট করে মাঠে ফসল ফলিয়ে যথা সময়ে সার, বীজ, খড়-কুটো ইত্যাদি সরবরাহ করতে ব্যর্থতার ফলে উৎপাদন স্বাভাবিকভাবেই ব্যহত হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সার্বিক অর্থনৈতিক চাকা।

১৮৮০ এর দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মজুর শ্রেণির অর্থনীতির একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার কৃষিগত শতাব্দী থেকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে পা পাড়ায় এবং ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কৃষি পণ্য বাজারজাত করণে এবং পরিকল্পিত উৎপাদনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতির সাথে বিশ্ব অর্থনীতির সংযোগ সাধিত হয়।[২৫]

বাংলার পূব দিকে অবস্থিত বার্মা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনসহ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত জাপান, চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়াসহ সমগ্র পূর্বদেশসমূহ উত্তরে হিমালয়, ভারত, নেপাল, ভুটান, কাশ্মীরসহ সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত পশ্চিমে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে সমগ্র ইউরোপ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য। ইংরেজ শাসনাধীন অবস্থায় বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা এমন অগ্রগতি সাধিত হয় যে বাংলার ঘরে ঘরে শান্তি-সমৃদ্ধি অগ্রগতি অর্জিত হতে থাকে।

প্রতিটি ঘরে ধান, চাল, আর মাছের প্রাচুর্যে বাংলা পরিণত হয় সোনার দেশে। যাবতীয় অগ্রগতি অর্জনের ফলে মানুষের সুখ-শান্তিতে মন ভরে ওঠে।

ঊনিশ শতকের শেষভাগে গ্রামীণ জনগণকে নিম্ন শ্রেণি হিসেবে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় : চাষী, কারিগর, মজুর ও ভিক্ষুক।[২৬]

সে সময়ে বাংলার জনগণ কাজ-কর্মের প্রতি ছিল বিশেষভাবে আগ্রহী, তাদের মাঝে একটিমাত্র শ্রেণি ভিক্ষাবৃত্তিতে নিমজ্জিত থাকলেও বস্তুতঃ অধিকাংশ জনগণ কর্মের মাধ্যমে খেটে খাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। তারা কঠোর পরিশ্রমের সাথে নিজেদেরকে এমন সুন্দরভাবে মানিয়ে ফেলেছেন যে, কেউ তাদেরকে কোনরূপ প্ররোচিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত এত বেশি সম্প্রসারিত ছিল যে, তারা যে কোন সমস্যা নিজেরা নিজেদের মাঝে সমাধান করতে সক্ষম ছিলেন। বিশেষতঃ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির ফলে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ এত বেশী পরিমাণে ও এমনভাবে কাজ করে যে, তারা সমাজে একে অপরের ভাই ভাই রূপে অতিব শন্তিপূর্ণ সমাজ নিয়ে জীবন-যাপন করতেন। সমাজের এরূপ উন্নতি-অগ্রগতির প্রতি পশ্চিমা ইউরোপীয় সমাজ এবং বিভিন্ন দেশের সমগ্র পর্যটকগণ ঈর্ষায় কাতর ছিলেন এমন অগ্রগতি ও উন্নতি সর্বত্র এর প্রভাব পড়েছিল, বিশ্বমানবতা হয়ে উঠেছিল বাংলার প্রতি অতিব উৎসাহিত।

---

২৫. ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৭২
২৬. *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪

বাংলার চাষীর চাষাবাদ ও জীবিকা নির্বাহের জন্য ঋণের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। ১৮৮০ খ্রি. এবং ১৯০১ খ্রি. এ ফেমিন কমিশন, ঋণ কমিশন ঋণ সমস্যার উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করলে আরো একটি কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশন সমবায় সমিতি গঠনের সম্ভাব্যতা নিরূপণের প্রয়াস পায়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯০৪ খ্রি. এ সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ হয়।[২৭]

সার্বিক বিবেচনায় মূলতঃ তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি অগ্রগতিতে বেশ সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। মানুষের মাঝে আস্থা-বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সৃষ্টি হয়। তাদের মাঝে প্রাচীন মধ্যযুগীয় হানাহানির পরিবর্তে অতীব আন্তরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পারস্পরিক সম্মানের আধুনিক জীবন-যাপনের মানসিকতা তৈরী হয়। সমাজ হয়ে উঠে সুখের নীড়।

২৭. *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পারিবারিক অবস্থা

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি লগ্ন হতে বাংলার অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.)-এর পরিবারের আর্থিক অবস্থাও বেশ উন্নত হয়। তাঁর পিতা আল্লামা মৌলভী আব্দুল কাদের নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) সাহেব নক্সবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরীকার ভারতের রামপুর হতে খিলাফত নিয়ে এসে বাড়ীতে খানকা খুলে নিয়মিত যিক্‌র-আযকার, তালীম-তরবিয়াত, সমাজ সেবা, ঝাড়-ফুক ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সেবায় ব্রতী ছিলেন, ফলে তাঁর প্রতি সমাজের মানুষের মাঝে মানবসেবী ও মানবপ্রেমী হিসেবে এক বিশেষ পরিচিতি ও আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে। মানুষ তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় শিরাবনত করেন। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ তাঁকে মেনে চলতেন, এলাকার মানুষের গৃহপালিত গরু, ছাগল, মহিষের প্রথম দুধ, মুরগীর প্রথম বাচ্চা, গাছে ধরা প্রথম ফল, ক্ষেতে হওয়া প্রথম ফসল তাঁর নামে মান্নত করে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। সকলে তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় এমন বিনয়াবনত ছিলেন যে, যে কোন সমস্যা সমাধানে মানুষ তাঁকেই সমাধানের স্থল বলে মনে করতেন। এবং সমাজের সকলের প্রতি তিনিও অতীব স্নেহশীল ও দয়ার বিশেষ ভাণ্ডার হিসেবে আবির্ভূত হন। যে কেউ তাঁর বাড়িতে আসলে না খেয়ে যেতে পারতেন না।

পৈত্রিক সম্পত্তিতে বলিয়ান আল্লামা মৌলভী আব্দুল কাদের নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) আদতেই সম্পদশালী ছিলেন, তথাপি রামপুর হতে তাঁর পীর কেবলার পক্ষ হতে খিলাফত নিয়ে দেশে ফিরে আসার পর বিভিন্ন ঝাড়-ফুক ও তদবীরের মাধ্যমে এলাকাবাসীর হৃদয় জয় করতে সক্ষম হন।

এছাড়া তিনি এলাকায় প্রতি বছর মাহফিল এর আয়োজন করতেন, মাহফিল উপলক্ষ্যে এলাকাবাসীর উদ্যোগে স্বেচ্ছায় চাল, ডাল, নারিকেল, সুপারি, ইত্যাদি ফি সাবিলিল্লাহ প্রদান করা হতো, যেগুলো বিক্রি করে মাহফিলের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। এলাকাবাসীর দানেই তাঁর সমকালীন মাহফিলসহ বাড়ীর প্রাঙ্গনস্থ মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদি পরিচালিত হতো। অবশ্য আল্লামা মৌলভী আব্দুল কাদের (রহ.) সাহেব দরিদ্রদের মাঝে দান করতেও বেশ ব্রতী ছিলেন। ইনতিকালের সময় তাঁর সন্তানগণ ৭/৮ বিঘা করে জমি ভাগে পান। ঐ জমি হতে আগত ফসলাদিতে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দীর (রহ.) সারা বছরের খোরাকীর কাজ সম্পন্ন হয়ে যেত। তাঁর পরিবারের আর কোন খোরাকী ক্রয় করতে হতো না। কিন্তু, ধীরে ধীরে শিক্ষকতা, ওয়ায-নসিহত, বই-পুস্তক লিখা ইত্যাতি কর্ম ব্যস্ততায় আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) তাঁর পিতৃপ্রদত্ত সকল সম্পদরাজি বিক্রি করে দেন। বিক্রি করা এ সম্পদের কিয়দাংশ দিয়ে তিনি লাইব্রেরি ও মুদি ব্যবসায় চালু করেন। আর অপরাংশ দিয়ে অর্থাৎ সিংহভাগ অংশ দিয়েই তিনি কিতাব ছাপানোর কাজ করন। নিজস্ব

লাইব্রেরী, প্রকাশনা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে জনগণের সেবার নিমিত্তে তাঁর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেন।

মৃত্যুকালে নিজের সন্তান-সন্ততির অবস্থানের জন্য কেবলমাত্র বাড়িতে একটি ভিটা ও ঘর রেখে যান। তিনি কোন নগদ অর্থ ও গচ্ছিত সম্পদ রেখে যাননি। ফলে, তাঁর সন্তানগণ ও স্ত্রী ভীষণ চিন্তায় পড়ে যান। তখন তিনি সবাইকে আস্বস্ত করে বলেন, "তোমরা কোন চিন্তা করবে না, আমি আমার সকল সন্তানের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করে গেলাম, তারা সকলেই সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করবে। কেউ কষ্ট পাবে না। তাঁরই বাণী অতীব সত্যে রূপ নিয়েছে। তিনি সত্যিই তাঁর সন্তানদের জন্যে এমন দু'আ করলেন যে, প্রত্যেকেই তাদের স্ব-স্ব অবস্থানে ভালো আছেন। সকলেই স্বীয় গতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কাউকেই কোন কষ্টে পড়তে হয়নি। আর হ্যাঁ, এক/দুইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে হয়নি, এমন নয়, কিন্তু বাস্তবিকভাবে তাঁরা সকলেই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের কালাতিবাহিত করছেন। বর্তমান সময়েও তাঁর পরিবারের প্রতিটি সদস্য অত্যন্ত সুখ-শান্তি ও সম্মানের জীবন যাপন করছেন। যা অনেক পরিবারের ব্যাপারে আদৌ কল্পনা করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) ও সমকালীন পরিবেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক পরিবেশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সামাজিক পরিবেশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিক্ষার পরিবেশ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) সমকালীন পরিবেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক পরিবেশ

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.) ইংরেজি ১৯৩১ সনে তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা নামে খ্যাত) অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর সদর থানার ৩নং দালাল বাজার ইউনিয়নের মহাদেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বঙ্গ ছিল বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রদেশ। তাঁর জীবন পরিক্রমায় বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এ তিনটি শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে তৎকালীন বাংলার রাজনীতিতেও ভিন্নরূপী এবং ব্যতিক্রমধর্মী পরিবর্তন সাধিত হয়। অবশ্য বাস্তবতার নিরিখে যথার্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা:

(ক) বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল

(খ) পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনামল

(গ) স্বাধীন বাংলাদেশ আমল

নিম্নে তাঁর সমকালীন প্রত্যেকটি শাসনামলের আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

(ক) বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফর ও মীর কাশেমের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর ঐতিহাসিক মহাবিপর্যয়ের পর পর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বৃটিশদের হস্তগত হয়, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হরণ করে। তারা এখানকার বিদ্যমান আইন, শাসন, রীতি-নীতি, অর্থনীতি, সামজিক, সাংস্কৃতিকসহ যাবতীয় ব্যবস্থাকে সংস্কার সাধনের পাশাপাশি এ দেশের রাজনীতিতে ঔপনিবেশিক মনোভাবের লালন করেন। ইংরেজদের ভেদনীতি তথা Devide and rule system - এ অঞ্চলের বৃহত্তর জাতি-গোষ্ঠী মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। যার ফলশ্রুতিতে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত ও দ্বন্দ্বমুখর হয়ে উঠে। এ দ্বান্দ্বিক পরিবেশে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত করতে থাকলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আদেশ পালন করে ভারত সরকার।[১] ব্যাপক বিরোধিতার ফলে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আদেশ রহিত হলে মুসলিম স্বার্থ দারুনভাবে ক্ষুণ্ন

১. দৈনিক মিল্লাত, ২৭ মে, ১৯৯০ খ্রি. ফিচার পাতা থেকে উদ্ধৃত।

হয়। ফলে ১৯০৬ সালে মুসলিম নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।[২] ইংরেজ শাসনকালীণ সময়ে এ অঞ্চলের মুসলিম উলামায়ে কিরামের রাজনীতিতে দু'টি জাতীয়তাবাদী ধারা প্রচলিত ছিল।

১. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম -এর 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' সমর্থিত রাজনৈতিক দর্শন।

২. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দর্শন।

অবশ্য ইতিহাস পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, দেশের অধিকাংশ আলিম-উলামা, মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দে সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ) রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও কোন্ রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি সমর্থন পোষণ করতেন তা অদ্যাবধি অবহিত হওয়া যায়নি।

১৯৪৫ সালে সমগ্র ভারতব্যাপী অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলিমদের একক প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে বিজয় লাভ করে। ১৯৪৬ সালে বৃটিশ ইংরেজ সরকারের মন্ত্রী মিশন ভারতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের শঠতা, হঠকারীতা ও অনমনীয়তার দরুন এ মিশন ব্যর্থ হয়। নানা চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ইংরেজগণ বুঝতে সক্ষম হন যে, দেশ বিভাগকরণ ব্যতীত এ সমস্যার কোন সমাধান নেই। অবশেষে উপমহাদেশের রাজনৈতিক শান্তি-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করণ কল্পে ইংরেজগণ বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ করেন। এ আইনের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট অখণ্ড উপমহাদেশ খণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

(খ) পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বৃটিশ কতৃক খণ্ডিত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য সিন্ধু, আসামের সিলেট অঞ্চল, পূর্ববাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ ও কিছু সংখ্যক দেশীয় রাজ্য নিয়ে গঠিত হয় দেশটি। পাকিস্তান দেশটি ভারতের উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত দুটি ভূখন্ডে বিভক্ত ছিল। নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশ হতে বিভিন্ন উর্দূভাষী বিহারী সম্প্রদায় পূর্ব পকিস্তানে আগমন করেন। তারা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকরি, কল-কারখানা, অফিস-আদালত ইত্যাদিতে কর্মে নিয়োজিত হন। কালক্রমে তারা এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলে নিজেদের একচেটিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় বেশ তৎপর হয়ে পড়েন। পাশাপাশি এ দেশের রাজধানী ঢাকাসহ দেশের

২. ড. এম. আব্দুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ৩২

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্য ও রেলওয়ে, বন্দর-নগরী ও কর্মচঞ্চল শহরসমূহ কেন্দ্রীক প্রধান অঞ্চলসমূহে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে মিশে যান এদেশের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে। খাপ খাইয়ে নেন এইসমাজের মানুষের সাথে।

(গ) স্বাধীন বাংলাদেশী শাসনামল (১৯৭১-১৯৭৪ খ্রি.)

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনসহ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জিবীত বাঙালী জাতি অত্যন্ত সফলতার সাথেই প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলা ভাষাভিত্তিক ঐক্যের ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে স্বীকৃতি নিয়ে স্বীয় অবস্থান নেয়। স্থান করে নেয় বিশ্ব মানচিত্রে একটি নতুন স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম দেশরূপে। কায়েম করে গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা। প্রচেষ্টা চলে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে একটি নিরপেক্ষ সমাজ গঠনের। অবশ্য মাতৃভাষাগত ভিন্নতার কারণে অবাঙালীরা এদেশের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়ে যায়। অবশ্য তাদের ব্যবসা-বার্ণিজ্য, চাকরি-বাকরি বা শিল্পোদ্যোগ, কল-কারখানা পরিচালনায় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখিত তিন তিনটি শাসনামলের সার্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থা আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদীর (রহ.) শিক্ষকতা, ইসলাম প্রচার, ওয়ায-নসিহত, আধ্যাত্মিক জীবনসহ কোন ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈরী প্রভাব ফেলতে পারেনি। কেননা, তিনি ছিলেন একজন নিখুঁত আশেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মানবতাবাদী মানবদরদী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বরং তিনি সার্বিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করেন এবং সম্ভব অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কখন কি করণীয় সে বিষয়ে প্রায়ই জনহীতকর রিসালাহ বা চিঠি প্রকাশে তৎপর থাকতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক পরিবেশ

যে কোন দেশ বা জনপদের সামাজিক পরিবেশ সর্বদা সে দেশ বা জাতির রাজনৈতিক দর্শন, প্রতিপত্তি, প্রভাব ও আধিপত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশের সাথে বৈচিত্রময় ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। অবশ্য এদেশের সামাজিক উন্নয়নে আলেম সমাজের যথেষ্ট অবদান বিদ্যমান।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস গ্রন্থের লেখক ড. এম. এ. রহিম -এর ভূমিকায় বলেন-

> "বাংলার মুসলমান সমাজের উন্নয়নে শায়খ, আলিম-উলামা সম্প্রদায় তাদের ধর্মপ্রচার মূলত শিক্ষাগত ও মানব হিতৈষীমূলক কার্যাবলীর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তারা সমাজের নৈতিকতার উন্নয়ন সাধন করেছেন। জনসাধারণের মাঝে তাদের তাওহীদী ধর্মমত জনপ্রিয় করে তুলেছেন এবং শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তারে সহায়তা দান করেছেন। তারা মুসলমানদের মাঝে সংহতির মনোভাব সৃষ্টি অধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন।"[৩]

মাওলানা আকরাম খাঁ তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বাংলার মুসলিম সমাজের পাশাপাশি ইতিহাস জানতে হলে বঙ্গ দেশের ও তার সমসাময়িক হিন্দু অধিবাসীদের ইতিহাসও জানতে হবে।[৪] সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে মুসলিমদের মাঝে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের একটি অংশ ইংরেজি শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে, ফলে সমাজে বড় ধরনের পরিবর্তন সুচিত হয়।[৫] আর সামাজিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় মুসলিমদের মাঝেই শ্রেণি বিন্যাস গড়ে ওঠে। কুলীন অকুলীন এ দু'শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। কুলীন বলতে সৈয়দ, শেখ, পাঠান, তুর্কী, ও মুসলিম অভিজাত শ্রেণিকে বুঝায়। আর দরিদ্ররা ছিল অকুলীন। কুলীনরা নিজেদেরকে অকুলীনদের তুলনায় শিক্ষিত ও সভ্য মনে করত। তারা বিয়ে-শাদীতে একত্রে বসে ভোজন করত না। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্যের শিক্ষা সভ্যতার প্রসার ঘটায় এবং অর্থনৈতিক কারণে সমাজ পরিবর্তনের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় কুলীন সমস্যার অনেকটা বিলুপ্তি ঘটে।[৬]

দেশের আলেম সমাজ ও মুসলিমদের প্রচেষ্টার ফলে এদেশের মানব সমাজ ইসলামী ভাবধারায় গড়ে ওঠে। মানুষের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনায়

---

৩. ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.), খ.১, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা : আজাদ অফিস, ১৯৬৫খ্রি.) পৃ. ৫৮-৫৯

৫. *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৭৩১

৬. আব্দুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ৬৮, ৮৩-৮৪

ইসলামী ভাবধারা বিদ্যমান। রাজনৈতিকভাবে মানুষের মাঝে ভিন্নমত থাকলেও ইসলামের মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে সকলের মাঝে ঐক্যের সূর বিরাজমান। সকল সমাজেই সাধারণ মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ড সে সমাজের ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এমনকি তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর ছাপ সুস্পষ্ট বাবে ফুটে ওঠে। তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি

বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা কখনো শোচনীয়ভাবে দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল না। আদিকাল হতে বাঙালী জাতি স্বীয় সত্ত্বা পরিচালনার মত অর্থ-বিত্তের মালিক ছিল। তবুও এ জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশ মূলতঃ মুঘল শানামলেই ঘটে। ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিক হলো বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ড। কেননা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ ছিল।[৭]

বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর অর্থনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো কৃষি সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক রেমিটেন্স। দেশের অর্থনীতির অন্য কোন খাতে এত বিস্তার পরিলক্ষিত হয়নি। জঙ্গল ভূমি পরিষ্কার করে আবাদ কাজ পরিচালনার মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং বিদেশে প্রেরিত বিপুল জনশক্তি কর্তৃক প্রেরিত মুদ্রা এ জাতির জাতীয় অর্থনীতির বড় দিক।

কৃষিযোগ্য পতিত বন জঙ্গল সংশ্লিষ্ট ভূমি আবাদের জন্য বহু জমিদার আবাদ তালুক সৃষ্টি করে নামমাত্র খাজানার মধ্য স্বত্ত্বাধিকারীর নিকট তা বন্দোবস্ত দিতেন। মূলত নগদ সেলামী দিয়েই মধ্য সত্ত্বাধিকারীগণ তালুক কিনে নেন এবং বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সে সব পতিত জমি কৃষিযোগ্য করে তোলেন। মধ্যসত্ত্বাধিকারীদের পুঁজি বিনিয়োগও উদ্যোগের ফলে ঊনিশ শতকের কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। প্রধান প্রধান আবাদী এলাকার মধ্যে চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চল, নোয়াখালীর উপকূল অঞ্চল, মেঘনা ব-দ্বীপ এলাকা, সুন্দরবন এলাকা, বরেন্দ্র অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব বাংলার হাওড় এলাকা। এদেশের কৃষি অর্থনীতির ইতিহাসে তুলা, নীল, ইক্ষু ও পাট ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সকল ফসলের সাথে বাংলার কৃষককুল ও অন্যান্য মধ্য বেপারীদের ভাগ্য জড়িত ছিল।

প্রাক উপনিবেশ আমলে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সুতা, রেশম বস্ত্র, মসলিন শাড়ী ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানী হত, চট্টগ্রাম হতে পূর্ণিয়া পর্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন মানের তুলা উৎপন্ন হতো। ঢাকায় উৎপন্ন হতো সর্বোৎকৃষ্ট তুলা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিশ্ব যোগাযোগের উন্নতি অগ্রগতি সাধন এবং বিশ্ব বাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঊনিশ শতকের প্রথম হতে নীল চাষ ক্রমশ বাড়তে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চ দশ হতে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার নীলের চাহিদা কমতে থাকে। নীলচাষ ছিল এদেশের চাষীদের প্রতি একটি অন্যায়-অত্যাচারের মাধ্যম। এ দেশের নীল উৎপাদনে নিরুৎসাহী চাষিগণের সম্মিলিত ও সুসংগঠিত প্রতিরোধের মুখে অবশেষে ইউরোপীয় নীল করেরা নীল চাষের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। অবশ্য শতাব্দীর ষাটের দশকে

৭. *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ. ০১

বাংলার নীল চাষ সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে আসে। পরবর্তীতে নীলের স্থান দখল করে এদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল পাট। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে এ দেশের পাট চাষ আরম্ভ হয়। এ শতাব্দীর সপ্তম দশক হতে ব্যাপক হারে পাটের চাষ ও বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে পাট বাংলার কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে। আয়ের উৎস বিবেচনা করে পাটকে সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়। নামকরণ করা হয় "সোনালী আঁশ"। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পাটের স্বর্ণযুগ শেষ হয়। ১৯৩০ সালে পাট নির্ভর অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে।[৮]

এদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে ধান চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ জনপদগুলো বেশীর ভাগ ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। কৃষি অর্থনীতিতে বর্তমানে অবশ্য আলু, পিয়াজ, ডাল, গম, সোয়াবিন ও ভূট্টা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে দেশের অর্থনীতিতে তৈরী পোষাক শিল্প, মৎস ও পশু এবং বিদেশে প্রেরিত জনশক্তির প্রেরিত মুদ্রা বাংলাদেশের অর্থনীতির আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। প্রতিবছর বিদেশে চাকুরিতে যোগদানকারী বাংলাদেশী বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রেরিত রেমিটেন্স জাতীয় অর্থনীতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎসরূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী (রহ.) এ দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী গভীর আগ্রহের সহিত পর্যবেক্ষণপূর্বক নানাবিধ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কিছু বাস্তব পদক্ষেপ ও পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে অসহায় দরিদ্রের প্রতি সহায়তা, ইয়াতিম-অনাথের প্রতি সাহায্য এবং দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহায়তা সহানুভূতির হস্ত সম্প্রসারণ ইত্যাদি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

৮. *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষার পরিবেশ

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.)এর সমসাময়িককালে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। যথা :

১. পাশ্চাত্য শিক্ষা
২. ধর্মীয় শিক্ষা
৩. সমন্বিত শিক্ষা

নিম্নে প্রত্যেকটি শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপিত হল:

(১) পাশ্চাত্য শিক্ষা

অসাম্প্রদায়িক ইউরোপ-আমেরিকার জ্ঞান বিজ্ঞান সমৃদ্ধ এ শিক্ষা। সর্বোতভাবে এ শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। পাশ্চাত্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নিম্নে উপস্থাপিত হল-

(ক) পাশ্চাত্য শিক্ষা বিজ্ঞান ভিত্তিক ও প্রগতিশীল, যার উদ্দেশ্য সাধারণ জীবনের উন্নয়ন সাধন।

(খ) এ শিক্ষা মুক্ত চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায়।

(গ) এতে ব্যবহারিক ও কারিগরী জ্ঞানদানের ব্যবস্থা থাকে।

(ঘ) এ শিক্ষার নিম্নস্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শীর্ষস্থানে বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান।

(ঙ) এটা একটা নিম্নগামী পরিশ্রবণ নীতি অনুসৃত শিক্ষা অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক সুবিধাভোগী ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তা ক্রমশ নিম্নস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন পানির উপরিভাগে লবন বা চিনি জাতীয় কোন দ্রবণীয় বস্তু ছড়িয়ে দিলে তা ধীরে ধীরে পানির নিম্নভাগ পর্যন্ত মিশে যায়, তেমনি শিক্ষিত সমাজের প্রভাব অশিক্ষিতদের মাঝে বিস্তৃত হয়। এর ফলে এটা সামজের নেতৃস্থানীয়দেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলে সমাজের সর্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

এ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বিশ্বনন্দীত Encyclopeadia of Britanica-তে উল্লেখ করা হয়েছে-

“The central purpose was to import western learning. English was the sole medium of instruction. The educational program was Top heavy, the education of a few in the universities was considered more important than the education of the masses.”

অর্থাৎ- এ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন। এর একমাত্র মাধ্যম ছিল ইংরেজি। এর কর্মসূচী ছিল বেশ ভারী এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করার চেয়ে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোককে শিক্ষিত করে তোলার প্রতিই অতীব গুরুত্ব দেয়া হতো।

পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এ দেশে মোট ০৬টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়:

১. প্রাথমিক শিক্ষা ০৫ বছর
২. মাধ্যমিক শিক্ষা ০৫ বছর
৩. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ২ বছর
৪. স্নাতক স্তর ২ বছর
৫. স্নাতক (সম্মান) স্তর ৩ বছর
৬. স্নতকোত্তর স্তর বা মাস্টার্স ১ বছর

এ নিয়মে এ শিক্ষার মোট সময়কাল ছিল ষোল বছর। অবশ্য স্নাতক (পাস) স্তরের শিক্ষার্থীকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করতে হলে অবশ্য এম.এ প্রথম পর্ব ও শেষ পর্ব এক বছর অন্তর দুটি চুড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই উক্ত ডিগ্রি লাভ করতে হতো।

গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় যে, উপমহাদেশে পর্তুগীজ ধর্মযাজক সম্প্রদায় সর্ব প্রথম আধুনিক শিক্ষা ধারা হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করেন। এ সকল ধর্মযাজক এ উপমহাদেশে এসে ইউরোপীয় ধাঁচে কলেজ-বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা ১৫৫৬ সালে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। তাঁদের পশ্চাতে ইউরোপীয় অন্যান্য বণিকগণ এদেশে আগমণের সুযোগ গ্রহণ করে। সকলের মাঝে অবশেষে বৃটিশ বণিক সম্প্রদায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী এ উপমহাদেশে বিশেষ প্রভাব লাভ করে। এ কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট এ উপমহাদেশে খৃস্ট ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬৪৮ সালে কোম্পানী সনদ আইন পুনঃ প্রবর্তনকালীন তাতে মিশনারী বিষয়ক একটি ধারা সন্নিবেশিত করা হয়। এ ধারার মাধ্যমে উপমহাদেশে কোম্পানীর কেন্দ্রসমূহে ধর্মযাজক নিয়োগ প্রদানের এবং শিক্ষা প্রচারের জন্য স্কুল স্থাপন করতে বলা হয়। তার পরই পর্যায়ক্রমে এ উপমহাদেশে মিশনারীদের শিক্ষামূলক কার্যকলাপ খুবই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে "খ্রিস্টীয় প্রচার সমিতি" স্থাপিত হয়। মিশনারী স্কুলগুলোতে ইংরেজি চালু থাকলেও উপমহাদেশের স্থানীয় ভাষায় নানা বিষয় তাদেরকে শেখানো হতো, এ সকল মিশনারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কার, অজ্ঞতা, দৈন্যতা ও হীনমন্যতা হতে জাতিকে শিক্ষিত, স্বনির্ভর ও কর্মদ্যোগী করে তোলা, নারী শিক্ষায় তারা ব্যাপক অবদান রাখেন। এবং তারা নারীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের এক বছর পর ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুসারে উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গৃহীত হয়। এ নীতি গ্রহণের ফলে মিশনারীদের তৎপরতায় ভাটা পড়ে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের একাধিপত্যে বাধা সৃষ্টি হয়। শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, সরঞ্জাম ইত্যাদি তারাই এদেশে আমদানি করেন। শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পিরিয়ড, পাঠ্যপুস্তক, সাপ্তাহিক ছুটি বরিবারে ধার্যকরণ ইত্যাদি তাদের নেতৃত্বেই প্রণীত হয়। একাধিক শিক্ষক কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যালয় তাঁরাই প্রবর্তন করেন।

অবশ্য ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনঃবিবেচনাকালে আংশিকভাবে মেনে নেয়া হয় যে, ভারতীয় জনতার শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু, শিক্ষার নীতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা না দেয়ায় এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দেয় চরম তিক্ততা, মতদ্বৈততা এবং বিভ্রান্তি। ফলে নিম্নলিখিত মতের উদ্ভব হয়:

১. একদল মনে করে এদেশে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন।
২. দ্বিতীয় দল অভিমত দেন যে, বৃটিশ সরকারের দায়িত্ব হলো ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করে তোলা।
৩. তৃতীয় দল মনে করেন যে, ভারতবাসীকে কোম্পানীর কাজের উপযোগী করে তোলার মত সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

জনগণের মাঝে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট দ্বিধা-বিভক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আন্দোলন। কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিগণ কোন একক মতের প্রতি সমর্থন দিয়ে সে কেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে তিনটি মতকেই সমর্থন ও অসমর্থন করতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা বিস্তার আইন দীর্ঘায়িত হয়। ১৮২৩ সালের ১৭ জুলাই গঠিত হয় "বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন"। উক্ত কমিটি আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষার প্রতি অগ্রগতির প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন এবং দশ বছরের মাঝে নিম্নবর্ণিত কর্মসমূহ সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন:

১. কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কাশীতে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় পুনর্গঠনকরণ।
২. আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় পুঁথি পুস্তকের পুনঃমুদ্রণ এবং উক্ত দু'ভাষায় ইংরেজি পুস্তকসমূহ অনুবাদ করণ।
৩. ১৮২৪ সালে কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় এবং আগ্রাও দিল্লীতে দুটি প্রাচ্যবিদ্যা কলেজ প্রতিষ্ঠা করণ।

এ পন্থায় উক্ত কমিটি প্রাচ্যবিদ্যা বিস্তারে সচেষ্ট হন। এদেশের প্রগতিশীল ব্যক্তিবৃন্দ উক্ত কমিটির এরূপ প্রচেষ্টায় বাধ সাধলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে এ সকল ব্যক্তিবর্গ মনে করলেন যে, ইংরেজি শিক্ষার দ্বারাই এ দেশের মানুষের সত্যিকার উপকার হতে পারে। তাই তিনি ১৮২৬ সালে একটি শিক্ষা সংস্থা গঠন করেন এবং এক লক্ষ টাকা

সংগ্রহ করে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য একটি ইংরেজি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজ্যের গভর্ণর জেনারেলকে স্মারকলিপি প্রদান করে বিজ্ঞান, রসায়ন ও শারিরীক শিক্ষা ইত্যাদি আধুনিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ শিখানোর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। পাশাপাশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস ও তাদের ডেসপাসে উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানদের প্রাচীন বিদ্যার অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন এবং প্রায় ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেন।

১৮৩৩ সালে বৃটিশ এম.পি লর্ড মেকলে প্রণীত নিম্নগামী শিক্ষা সরকারী আনুকূল্য লাভ হতে বঞ্চিত থাকে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়। ফলে পাক-ভারত-বঙ্গ উপমহাদেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

১৮৫৪ সালের ১৯ শে জুলাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদের পটভূমিকায় কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কিত একটি 'শিক্ষা সনদ' রচনা করেন। ইংরেজ কর্মকর্তা 'চার্লস উড' নামক জনৈক কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি সনদটি রচনা করার ফলে ইহাকে 'উডের ডেসপাস' বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন দিক ও বিভাগ অবতারণা সংক্রান্ত এ ডেসপাস একটি দলীল স্বরূপ। এ দলীলই উপমহাদেশের শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক পদক্ষেপ স্বরূপ বা প্রাথমিক দিশারী বলে অভিহিত হয়।[৯]

'উড ডেসপাসে' প্রণীত বিষয়াবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় নিম্নে উপস্থাপিত হল-

(ক) শিক্ষার মাধ্যম বা বাহন হিসাবে মাতৃভাষাকে নির্ধারণ।

(খ) নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

(গ) এ জাতির মাঝে তাদের দেশীয় শিক্ষা চর্চা, বিশেষ করে এ দেশীয় ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি এবং আইন কানূনে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) একজন শিক্ষক অধিকর্তার পরিচালনাধীন বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের শিক্ষা সংগঠন বিভাগ আলাদাভাবে খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দায়িত্ব কর্তব্য উল্লেখ পূর্বক কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া।[১০]

---

৯. মোমিন উল্যা, *উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বরূপ* (ঢাকা : তামজীদ প্রকাশনী, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৭২
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

এদেশে উক্ত কোম্পানীর শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য অত্র ডেসপাসে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়:

উপমহাদেশের সকল শ্রেণির উপযোগী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তাদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধন ও বৈষয়িক উন্নতিতে সার্বিক সহায়তাকরণ ইংল্যান্ডের অবশ্য কর্তব্য। এটা তাদের দায়িত্বও বটে। কেননা, ঔপনিবেশিক শিক্ষার বেড়াজাল ছিন্ন করে ভারতবাসীকে নিস্কৃতি প্রদান করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে তারা বৈষয়িক উন্নতি অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হবে। ফলে তারা এ দেশে প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল উৎপন্ন করতে পারবে। সুতরাং ইংল্যান্ডও প্রভুত লাভবান হবে। এছাড়া ভারতীয়গণ শিক্ষিত হলে কোম্পানী স্বল্প বেতনে কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের সুযোগ পাবে।[১১]

উড কমিটির সুপারিশের আলোকে ১৮৫৭ সালে বাংলার কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হলো উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষের এ অংশে উক্ত ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিত আর কোন প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা গ্রহণকারী কয়েকটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল নিম্নে উল্লেখ করা হলো-[১২]

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - ১৯২১ খ্রি.
২. দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় - ১৯২২ খ্রি.
৩. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় - ১৯৭৪ খ্রি.
৪. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় - ১৮৮৭ খ্রি.
৫. উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় - ১৯১৮ খ্রি.
৬. আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় - ১৯২৭ খ্রি.
৭. বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় - ১৯১৫ খ্রি.

(২) ধর্মীয় শিক্ষা

উপমহাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা দীর্ঘ ঐতিহ্যে লালিত, আবহমানকাল হতে এ উপমহাদেশের বরেণ্য আলেম সমাজ ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপকার হিসেবে এ অঞ্চলের ধর্মীয় শিক্ষাকে বিস্তারের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। দুটি ধারায় এদেশের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালূ ছিল।

(ক) ওল্ডস্কীম মাদ্‌রাসা বা আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা এবং

---

১১. মোমিন উল্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
১২. Common Wealth Universities Year Book (Association of Commonwelth Universities, 1993), Part No. 21, pp. 1019, 1038, 1077, 1172, 1459

(খ) কওমী মাদরাসা বা স্বতন্ত্র আরবী মাদরাসা।

ইংরেজদের সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে অবশেষে এ বঙ্গের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রীক ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠানের নাম ওল্ডস্কীম মাদরাসা। পক্ষান্তরে ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা কেন্দ্রীক প্রণীত পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কওমী মাদরাসা বা স্বতন্ত্র আরবী মাদরাসা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। নিম্নে উক্ত ধর্মীয় পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

(ক) ওল্ডস্কীম মাদরাসা

উপমহাদেশের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলীয়া মাদরাসার শিক্ষা পদ্ধতি, সিলেবাস ও অবকাঠামো অনুসারে এদেশে অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ইন্সটিটিউট গড়ে ওঠে।[১৩]এ সকল প্রতিষ্ঠানে কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, আরবী সাহিত্য, উসূলুল ফিক্হ, ইলমুল কালাম, ইলমুল বালাগাত, ইলমে মানতিক, নাহু-ছরফ, ফাসাহাত, ইলমুল আদইয়ান, ইলমুল হিকমাহ, তা'রীখে ইসলামী, অংক ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়া হতো।[১৪] পরবর্তী কালক্রমে সময়ের চাহিদা ও দাবীর আলোকে এবং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ইলমে ফারাইয, ইলমে আকাইদ, তর্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, হাদিস ও ফিক্হের ইতিহাস, আরবী সাহিত্য, তার ইতিহাস, আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল ইত্যাদি পাঠ দানের ব্যবস্থা করা হয়।[১৫] কামিল স্তরে প্রথমে তিন বছর মেয়াদি পরবর্তীকালে দুবছর মেয়াদী কোর্স চালু করা হয়।

আধুনিককালে মাদরাসা শিক্ষায় কারিগরী বিদ্যা যোগসহ সূতারকর্ম, সূচেরকর্ম, সাবান তৈরী ইত্যাদি বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ ঐচ্ছিক বিষয়রূপে শিক্ষাদান করা হয়। এছাড়া কামিল শ্রেণিতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ গবেষণার ব্যবস্থাও বিদ্যমান। এতে বৃত্তিসহ বিবিধ সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান, এ শাখায় আরবী, উর্দু, ফার্সী ও বাংলায় বহু মূল্যবান গবেষণাকর্ম সাধিত হচ্ছে। প্রারম্ভলগ্নে যদিও মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী ও ফার্সী। পরবর্তীকালে এর মাধ্যম আরবী, উর্দু ও বাংলায় সম্পন্ন হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাকাল হতেই মাদরাসা শিক্ষার কাঠামো সমকালীন সমাজজীবন, আধুনিক বিদ্যা ও বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন ছিল। সমসাময়িক ধর্মীয় জ্ঞান তখন পাঠ্য ছিল। আধুনিককালে অবশ্য তা নানা রকম পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে আলীয়া মাদ্রাসার সিলেবাস যুগোপযোগী করা হয়েছে।[১৬]

প্রথমদিকে বছর শেষে একবার পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে কোন পাঠ সম্পন্ন করলে প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় পদ্ধতিতে তার পরীক্ষা গ্রহণ

১৩. মুহা. আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ০৮
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

করতেন এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ও যথাযথ অবগতির পর পরবর্তী শ্রেণিতে অধ্যয়নের সুপারিশ করা হতো। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর ছিল পরবর্তী শ্রেণিতে প্রমোশন লাভের বিষয়টি। ফলে, প্রতিভা বিকাশে ছিল বেশ ঝুঁকি। সরকারি নির্দেশনানুসারে ১৮২১ সাল হতে মাদরাসায় বার্ষিক পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ আরম্ভ হয়। ইংরেজি-আরবি বিষয় পরীক্ষাগ্রহণে হেড মৌলভীকে এবং ইংরেজি-ফার্সি পরীক্ষা গ্রহণে হেড-মাস্টারকে প্রধান করে কমিটি করা হতো। উভয় কমিটি স্বীয় বিভাগসমূহের পরীক্ষা যথা নিয়মে গ্রহণ করতেন। পরীক্ষা সমাপনান্তে উত্তরপত্র শিক্ষা বিভাগের পরিচালকের নিকট পাঠানো হতো।

অবশ্য সর্বপ্রথম ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়। অধ্যক্ষ সাহেব স্বীয় ক্ষমতাবলে বোর্ডের রেজিস্টার হেড-মৌলভী, সহকারী রেজিষ্ট্রার এবং সহকারী রেজিষ্ট্রার অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন ফর মোহামেডান এডুকেশন সভাপতি নিয়োগ দিতেন। বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর হতে মাদরাসায় নিম্নলিখিত পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা চালু করা হয়-

১. সিনিয়র চতুর্থ বর্ষে ৯০০ নম্বরের একটি মমতাজুল মুহাদ্দেছীন (এম.এম) পরীক্ষা।
২. কামিল কোর্সের সমাপ্তিতে ১০০০ নম্বরের একটি মমতাজুল ফুকাহা (এম.এফ) পরীক্ষা।
৩. সিনিয়র দ্বিতীয় বর্ষে ৮০০ নম্বরের একটি আলিম পরীক্ষা গৃহীত হতো।

পরবর্তী সময়ে ১৯৪৬ ও ১৯৪৯ সালে এ প্রথা সংস্কার পূর্বক বর্তমানে নিম্নরূপ পদ্ধতিতে আলিয়া বা ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাসমূহের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।[১৭] বর্তমান সময়ে মাদরাসা শিক্ষা নিম্নবর্তী ৫টি ধাপে প্রবর্তিত হয়ে আসছে।

১. ইবতেদায়ী স্তর বা প্রাথমিক স্তর ৫ বছর
২. দাখিল বা মাধ্যমিক স্তর ৫ বছর
৩. আলিম বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ২ বছর
৪. ফাযিল বা স্নাতক স্তর ৩ বছর
৫. কামিল বা স্নাতকোত্তর স্তর ২ বছর

ইবতেদায়ী ও দাখিল স্তরে সাধারণ, বিজ্ঞান, ইলমে কিরাত, তাজবীদ, হিফযুল কুরআন বিভাগ, আলিমকে সাধারণ ও বিজ্ঞান, ফাযিলকে সাধারণ এবং কামিলকে তাফসীর, হাদিছ, ফিক্হ ও আরবী সাহিত্য বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

নিউস্কীম মাদরাসা

তৎকালীন পূর্ব বঙ্গের প্রখ্যাত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব শামসুল উলামা মাওলানা আবু নসর ওয়াহীদ শিবলী নুমানী (রহ.) এর চিন্তা ধারার আলোকে পূর্ব বাংলায় এক ধরনের ইসলাম

১৭. *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

ধর্মীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণীত হয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর এ পরিকল্পনাকেই নিউস্কীম মাদরাসা শিক্ষা বলে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষায় বিশেষ গ্রন্থের চেয়ে বিষয়ের প্রাধান্য বেশী দেওয়া হয়। ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। বৃত্তিমূলক, সৃজনশীল, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, ফিক্হ ইত্যাদি শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। তৎকালীন সরকার এ পদ্ধতির অনুমোদন দিয়ে ১৯১৫ সালের ১লা এপ্রিল হতে তা বাস্তাবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম, হুগলী ও রাজশাহীতে সরকারি অনুদানের ভিত্তিতে ৫টি মাদরাসা এবং অসংখ্য জুনিয়র মাদরাসা নির্ধারিত করেন। এগুলোর নামে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। এ বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, শিক্ষা উপকরণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহ গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা হয়। এ কার্যক্রম গ্রহণকারী মাদরাসাসমূহের সহায়তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্রাচীন সিলেবাসভুক্ত মাদরাসাসমূহ ক্রমে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। এরূপ নানা উপায়ে নিউস্কীম মাদরাসা সমূহ সরকারি আনুকূল্য নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

নিউস্কীম মাদরাসার পাঠ্যসূচী অনুসরণে শিক্ষার্থীগণ একদিকে আরবী ও ইসলামী জ্ঞানার্জনে ওল্ডস্কীম মাদরাসার শিক্ষার্থীদের সমকক্ষ হতে থাকেন। পক্ষান্তরে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের ন্যায় বিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পান। ক্রমে তাঁরা ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানে যুগপৎভাবে সাফল্য অর্জন করতে থাকেন। এমনকি কর্মজীবনেও তারা বেশ দক্ষতার সাথে বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেন। ছাত্র-শিক্ষকের ঐকান্তিকতা, উৎসাহ, উদ্যম ও নিষ্ঠার ফলেই কেবল তাদের সাফল্য অর্জিত হতে থাকে। উক্ত সিলেবাসের অধীনে স্বনামধন্য কয়েকজন হলেন, ড. সৈয়দ মোয়াযযম হোসেন,[১৮] প্রফেসর আব্দুল হাই[১৯], ড. সাইয়্যিদ লুৎফুল হক[২০] ড. এম. সিরাজুল হক[২১], ড. মফিজ উল্যা কবির[২২], ড. এম.এ. বারী[২৩], ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ[২৪], ড. আবু মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ[২৫], ড. মাওলনা এ.এফ.এম. আব্দুল হক ফরিদী[২৬], ড. ইয়াকুব শরীফ[২৭], প্রফেসর সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী[২৮], ড. হাবিবুর রহমান চৌধুরী[২৯], ড. মোস্তাফিজুর রহমান[৩০], ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন[৩১], ড. আ.র.ম. আলী হায়দার[৩২] প্রমূখ

১৮. প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯. প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২০. সাবেক অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২১. সাবেক অধ্যাপক ও ডীন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২২. সাবেক প্রো-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৩. সাবেক উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২৪. সাবেক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৫. সাবেক অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৬. প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
২৭. সাবেক অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
২৮. সাবেক অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২৯. সাবেক অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩০. সাবেক অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও উপাচার্য, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, গবেষক, লিখক, শিক্ষাবিদ, আরবীবিদগণ এ শিক্ষা ব্যবস্থার সোনালী ফসলরূপে খ্যতিলাভ করেন।

সময়ের পরিবর্তনে ক্রমান্বয়ে নিউস্কীম পাঠ্যসূচীর বিষয়সমূহ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে এ শিক্ষার মাধ্যমে বুৎপত্তি অর্জন অতীব দুরুহ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক নির্বিশেষে সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ এ শিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাই এ শিক্ষার পাঠ্যসূচীকে সহজসাধ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নিউস্কীম মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগণ যাতে আধুনিক ডিগ্রীধারীগণের ন্যায় পেশা গ্রহণে সক্ষম হন এবং উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পান তাই আধুনিক বিষয়সমূহ যথাযথ রেখে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইসলামী বিষয়সমূহ পাঠ্যসূচী হতে কমানো হয়। বার বার পাঠ্যসূচী হতে বিভিন্ন ইসলামী বিষয় কর্তনের ফলে এর পাঠ্যসূচী ক্রমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবর্তিত আধুনিক পাঠ্যসূচীর সমপর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। ক্রমে উক্ত স্কীমের মাদরাসাসমূহ ইসলামিক উচ্চ বিদ্যালয়ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

পূর্ববঙ্গের নিউস্কীমভুক্ত মাদরাসা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হন। অবশ্য এ বিশ্ববিদ্যালয় যখন আবাসিক ছিল তখন হতেই এর পরিধি অত্যন্ত সীমিত ছিল। এজন্যে ঢাকা শহরে অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের পরীক্ষা গ্রহণ সিলেবাস প্রণয়ন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি 'মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বঙ্গের নিউস্কীক মাদরাসার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, সিলেবাস প্রণয়ন ইত্যাদি উক্ত শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত হয়।[৩৩] সরকারি শিক্ষা বিভাগ ১৯১৫-১৬ সেশনের শিক্ষাবর্ষে নিউস্কীম মাদরাসার পর পর দুটি সিলেবাস চালু করে।[৩৪] উক্ত শ্রেণিদ্বয় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট নামে খ্যাত। উভয় শ্রেণিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত সিলেবাস প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ)-এ রূপান্তরিত হয়।[৩৫] ক্রমেই চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ও হুগলী মাদরাসাগুলো একই পরিণতি বহন করে।

(খ) কওমী মাদরাসা

উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ প্রণীত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী অবলম্বনে এ দেশের ধর্মীয় শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ধারা চালু রয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা

---

৩১. সাবেক অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩২. সুপার নিউমারারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৩. নিউ স্কীমভুক্ত মাদরাসা, আতাউর রহমান কমিটি প্রণীত, ১৯৫৭ খ্রি.
৩৪. মাদরাসা শিক্ষা বাংলাদেশ, আব্দুল হক ফরিদী (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৬৬
৩৫. Dr. A.K.M. Aiub Ali, *Commisson on National Education (S.M.Sharif Commission report), 1958*

বর্তমানে অবশ্য একটি বিফাকুল মাদারিস শিক্ষাবোর্ড নামে একটি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত। শিক্ষার এ ধারাটিকে কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়।

উপমহাদেশের দারুল উলুম মাদরাসা কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্যে ৮টি মূলনীতি অনুসরণ করে। এগুলোকে 'উসূলে হাস্তেগানা' বলা হয়।[৩৬] নিম্নে এর সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হল-

১. মাদরাসার ব্যয় নির্বাহে চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপক উদ্যোগ ও অন্যদেরকে সে বিষয়ে উৎসাহ প্রদান।
২. শিক্ষার্থীদের খাদ্য-পানাহারের প্রতি দৃষ্টিদান যথাসম্ভব তার মান বৃদ্ধিতে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকা।
৩. বছর শেষে নির্ধারিত নিসাব বা পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করা আবশ্যক।
৪. মাদরাসার ব্যবস্থাপক ও শুরা (পরামর্শ পরিষদ) সদস্যগণ সর্বদা মাদরাসার শৃঙ্খলা বিধানে, সৌন্দর্য্য রক্ষায় সজাগ, সচেতন এবং সচেষ্ট হবেন। তাঁরা পরমত সহিষ্ণু হবেন। তারা পরস্পর মতামত প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে মাদরাসার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হবে।
৫. সব রকমের সরকারি অনুদান অথবা সাহায্য সার্বিকভাবে পরিহার করা হবে।
৬. শিক্ষকমণ্ডলী সমচিন্তা ও সমদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন, তাঁরা পার্থিব স্বার্থান্বেষী আলিমদের ন্যায় স্বার্থপর ও পরমুখাপেক্ষী হবেন না, তাহলে মাদরাসার ভাগ্যে কোন কল্যাণ জুটবে না।
৭. মাদরাসার আয়, আমদানি, নির্মাণ ও ইমারত প্রভৃতি কাজে এক প্রকার নিঃস্বতা বজায় রেখে চলতে হবে এবং ধনীদের চেয়ে দরিদ্রদের অনুদানকে প্রাধান্য প্রদান করা বাঞ্ছনীয় হবে।
৮. সৎ উদ্দেশ্যে প্রণীত নিষ্ঠাবান ব্যক্তির দান ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে সস্তায় নাম কিনতে ইচ্ছুক ও অসৎ উদ্দেশ্যে দান করা অনুদান বর্জনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রম (তালীমে নিসাব)

নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে দারুল উলুম দেওবন্দের পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়[৩৭]-

১. ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার,
২. আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি উৎসাহ প্রদান,
৩. নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের) সুন্নতের অনুসরণ,
৪. হানাফী ফিকহের ব্যপকতা দান,

---

৩৬. সাইয়্যেদ মাহবুব রিযভী, *তারীখ-ই-দারুল উলুম দেওবন্দ* (দেওবন্দ : ইদারাতু দারুল উলুম দেওবন্দ, ১৩৯৭/১৯৭৭) খণ্ড-২, পৃ. ১৫৩-১৫৪
৩৭. প্রাগুক্ত, খন্ড-১, পৃ. ৪২৯-৪৩২

৫. মাতুরিদী মতাদর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা,
৬. সকল বিদআত মুলোৎপাটন এবং
৭. বিদেশী শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্র সৃষ্টি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ৩টি মাদরাসা লক্ষ্ণৌর ফিক্হ ও কালাম, দিল্লী রহিমিয়া মাদরাসার হাদীছ ও তাফসির এবং খায়রাবাদ মাদরাসার মানতিক ও হিকমার সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণীত হয়েছে।[৩৮] শতাব্দীকালব্যাপী এ সিলেবাস অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে যুগের চাহিদার আলোকে এর মূল অবকাঠামো ঠিক রেখে কিছু অন্তর্ভুক্তি ও কাটছাট করা হয়েছে। উপমহাদেশের সকল কওমী মাদরাসা তাদের এ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে থাকে।

এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণি অপেক্ষা বিষয় গুরুত্ব পায়। পাঠ্য পুস্তকের শুরু হতে শেষতক এতে পাঠদান করা হয়। সমগ্র শিক্ষাকাল প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও তাকমীল এ চারটি স্তরে বিন্যস্ত। এ প্রতিষ্ঠানে মোট ৭টি বিভাগ বিদ্যমান।

১. আরবি
২. ফার্সি
৩. ফাত্ওয়া
৪. তিব্ব (আইয়োর্বেদিক চিকিৎসা)
৫. তাবলীগে দ্বীন
৬. শ্রুতিলিপি বিদ্যা
৭. আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান

বাংলাদেশের কাওমী মাদরাসার শ্রেণিবিন্যাস ও অনুরূপ।

উপমহাদেশের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তার, এবং ধর্মীয় নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে এ সকল মাদরাসার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আবহমানকাল হতে এ ধারার শিক্ষার্থীগণ মাদরাসায় শিক্ষকতা, ওয়ায-নসিহত, ইমামতি, মোয়ায্যেনী, মাদরাসা পরিচালনা, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক প্রসংশনীয় কর্ম সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।

(গ) সমন্বিত শিক্ষা

বৃটিশ শাসনের প্রতি বিরূপ মনোভাব থাকায় এ দেশের মুসলিমগণ দীর্ঘ দিন ইংরেজ প্রণীত পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে বিরত থাকেন। এমনকি এ দেশের এক শ্রেণির আলেম সমাজ যে ফতোয়া প্রদান করেন "ইংরেজি শিক্ষা করা হারাম" তা দেশের আপামর জনতা মেনে নেয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালে দেশের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিমদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসতে থাকে। ক্রমেই তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এর কয়েক বছর পূর্বে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের অগ্রসেনা নবাব আব্দুল

৩৮. এম.এ.বাকী, *উপমহাদেশে কওমী মাদরাসা* (কলকাতা : হেলমন্দ প্রকাশনী, ১৯৬৯), পৃ. ৮১

লতিফ কলকাতা আলীয়া মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেন।[৩৯] তাঁরই উদ্যোগে উক্ত মাদরাসার "ইংরেজি ফার্সী বিভাগ" খোলা হয়। সেখানে তিনি ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি সরকারের নিকট শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজিতে উচ্চ শিক্ষা চালুর দাবী করেন। ফলে ১৮৫৪ সালে হিন্দুদের কলেজ "কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ" নামে খ্যাতি লাভ করে। এখানে সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়।[৪০] হুগলী সরকারি মাদরাসায় আরবি-ফার্সী ও ইংরেজি-ফার্সী বিভাগের শিক্ষার মান উন্নয়নেরও সুপারিশ করেন। মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি নবাব আব্দুল লতিফ বড়লাট লর্ড মেও এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮১৭ সালের ৭ আগষ্ট ভারত সরকার মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিষয়ক একটি আইন পাশ করেন। তাতে নিম্নের প্রস্তাব গৃহীত হয়:

১. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চলে ইংরেজির জন্য উপযুক্ত মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
২. প্রত্যেক সরকারি স্কুল-কলেজে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাচীন ও প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. মুসলমানদেরকে প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দেয়া হবে।
৪. মুসলমানদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টায় সরকারি সহায়তা দেয়া হবে।

উল্লেখিত সহায়তার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলোকে নির্দেশ প্রদান করা হল।[৪১]

নবাব আব্দুল লতিফ বিভিন্নমূখী তৎপরতা অব্যাহত রাখেন মুসলমানদের বৈষয়িক ও ধর্মীয় উভয় ধরনের প্রয়োজন মেটানো অনুরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীতে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৮৬৩ সালে 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় কেবলমাত্র মুসলিম সমাজকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করণ এবং বৃটিশ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষভাব রহিত করণে মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা ও সামাজিকতায় মুসলিম সমাজকে হিন্দুদের সমকক্ষ করে তোলা। উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি নিয়মিত বক্তৃতা, বিবৃতি, সভা, সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে মুসলমানদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত জীবন গড়ে তুলতে তাদেরকে উৎসাহ দান এবং সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।[৪২] তিনি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান মুসলিম শিক্ষার উন্নতি সাধনে। কিন্তু কোন সিলেবাস প্রণয়ন করেননি। পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী উইলিয়াম উলফেনসন হান্টার একজন সিভিলিয়ান। তিনি মন্তব্য করেন যে, "আমাদেরকে এমন একটি উদীয়মান মুসলিম জেনারেশান গড়ে তোলা উচিত, যাঁরা নিজস্ব সংকীর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ও মধ্যযুগীয় ভাবধারার গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে পাশ্চাত্য

৩৯. এম.এ. রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৫-১৪৬; ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
৪১. প্রাগুক্ত
৪২. রহীমদ্দীন, *আব্দুল লতিফের মাই পাবলিক লাইফ* (ঢাকা : মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি, ১৯৪১), পৃ. ৫৭

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নমনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠবে। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের ন্যায় উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষার সাথে তাদেরকে কর্ম জীবনে লাভজনক পেশায় অংশ গ্রহণের উপযুক্ত ইংরেজি শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে।[৪৩] উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলগুলোতে কিছুটা আরবি-ফার্সী প্রবর্তনেরও তিনি সুপারিশ করেন। তিনি আরো সুপারিশ করেন যে, এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলমান ছাত্রদের মাঝে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আরো আগ্রহ বাড়বে। তার এ সুপারিশ ও পরামর্শের আলোকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে উক্ত ভাষাদ্বয় প্রবর্তন করা হয়।[৪৪]

নওয়াব আব্দুল লতিফ সাহেবের চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন আধুনিক চিন্তা-চেতনার কর্ণধার স্যার সৈয়দ আহমদ খান আরো এক ধাপ এগিয়ে নৈতিক ও বৈষয়িক মূল্যবোধের সমন্বয় করে এ দেশীয় মুসলিমদের জন্য একটি সমন্বিত ও পৃথক শিক্ষা কাঠামো প্রণয়ন করেন এবং উক্ত লক্ষ্যে তিনি একটি পৃথক পাঠ্যক্রমও তৈরি করেন। উক্ত কাঠামোর আলোকে তার বাস্তবরূপ দিতে তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশে 'মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঅবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপলাভ করে। বর্তমানে 'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' নামে খ্যতি অর্জন করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অবকাঠামো পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে এবং অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। ভারতীয় মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে কেবলমাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেই।[৪৫]

উল্লেখিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) অবশ্য ওল্ডস্কীম মাদরাসার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কেননা, তাঁর সুযোগ্য পিতা মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তাঁকে ওল্ডস্কীম মাদ্রাসায় ভর্তি করান। তিনি সেখান হতে ক্রমান্বয়ে দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল শ্রেণিতে অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রথম শ্রেণি পেয়েই উত্তীর্ণ হন। শুধু তাই নয় ভারতের রামপুর আলীয়া মাদরাসা এবং পাকিস্তানের হিযবুল আহনাফ মাদরাসা হতেও তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, মানতিক, বালাগাত, হিকমাহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ওল্ডস্কীম মাদরাসার জ্ঞানার্জনের ধারাকে আরো শানিত করেন এবং এ ধারায়ই নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

৪৩. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
৪৫. Devid Laliveled, *Aligarh's First Generation* (London : Oxford University Press, 1935), P. 346

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ

যে কোন দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সে দেশের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর সমসাময়িক সাংস্কৃতিক অবস্থা খুব একটা ব্যতিক্রম নয়। দেশের সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, ইসলামী এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান।[৪৬] দেশের মানুষের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, তাহযীব, তমদ্দুন ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে ঐ সকল সংস্কৃতি দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে এসেছে।

এ উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজ বিবর্তনের ধারায় মুসলিমদের মাঝেই সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস গড়ে ওঠে। ফলে, তাদের সংস্কৃতি হয়েছিল বিভিন্নরূপের। এদেশে সৈয়দ, শেখ, পাঠান, তুর্কী এ সকল পশ্চিমা তথা মধ্য এশিয়া হতে আগতরা এ সমাজের কুলিন ছিল। এদের সংস্কৃতি ছিল একটি ব্যতিক্রম ও উন্নত ধরনের। আর এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল অকুলীন। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ দেশের সমাজ ব্যবস্থা হতে কুলীন অকুলীন সমস্যা রহিত হয়ে সকলের মাঝে অর্থনৈতিক বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছিল। এদেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ প্রাচীনকাল হতেই বহু রীতি ও বহু ধর্মের ভিত্তিতেই প্রচলিত হয়ে আসছে। গৌড়, আর্য, মোগল, বৃটিশসহ বিভিন্ন জাতির শাসন ও শোষণ এ জাতিকে বিভিন্ন মতভেদ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিতে বিভক্ত করে ফেলে। ঐতিহাসিক মুস্তফা নূর উল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন সাংস্কৃতিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে,

> "শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ অনুসরণে জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ, কোট প্যান্ট, শার্ট ব্যবহার করা, ইংরেজী ফ্যাশনে কলার, নেকটাই পরিধান করা, হুক্কা, তামাক ছাড়িয়া সিগারেটের ধুমোদগার করা, আহারের সময় চেয়ার-টেবিল ব্যবহার, হাতের পরিবর্তে কাটা চামুচ, ছুরি ব্যবহার, হিন্দুর অনুকরণে আচকান, পায়জামার পরিবর্তে ধুতি, চাদর, টুপির স্থলে নগ্নমস্তক ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।"[৪৭]

প্রকৃতপক্ষে সমাজের স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি ও পরিবারের মাঝে কেবলমাত্র উল্লেখিত চিত্র পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মুসলিম জনসাধারণ কখনই তাদের সনাতন কৃষ্টি, সাংস্কৃতি বা সভ্যতা হতে বিচ্যুত হননি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচার অনুযায়ী আত্মপরিচালনার জন্যে। এ কারণেই এ সমাজে মানুষের সাংস্কৃতিক অবস্থা ইসলামী ভাবধারায় গড়ে ওঠে, জাতির আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চাল-চলন, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদিতে ইসলামী ভাবধারা বিরাজমান।

---

৪৬. মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, খ.৩, পৃ. ১

৪৭. মুস্তফা নূর উল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৭২

রাজনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের মাঝে দ্বিমত থাকলেও ইসলামের মৌলিক বিষয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের মাঝে ঐক্যের সুর অনুসরণীয়। আর এ বিষয়টিতে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সর্বদা ঐ সমাজের ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসের ওপরই গড়ে ওঠে। তাই সে সমাজের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তার ছাপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এতে কারো সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আর ধর্মীয় ক্ষেত্রে এ জাতি সর্বদাই পরমত সহিষ্ণুতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে। এ দেশের সর্বত্র একই রকম না হলেও বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্বসহ তাদের আলাদা আলাদা ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কর্মও বিদ্যমান বিশেষত দেশের পাহাড়ী অঞ্চলে। এবং পার্বত্য অঞ্চল বিশেষত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এ জাতীয় বহু নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও তাদের ক্রীয়াশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান। কিন্তু, এতে কোন ধরনের কোন গোলযোগ বা বাধার কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পরিলক্ষিত নয়।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের জনগণ কখনো পিছিয়ে ছিল না, এরা সর্বদা মুসলিম রীতি-নীতি অনুসারে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজেদেরই ঐতিহ্যে লালিত দীর্ঘ দিনের সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। বিশেষত আলিম সমাজ পাঞ্জাবী, পায়জামা, টুপি ইত্যাদি নিয়মিত বা দায়েমী সুন্নাত হিসেবে ব্যবহার করতেন। পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজে ধুতি, সাদা জামা, পাঞ্জাবী এবং নারীরা লাল, সাদা সিদুর ব্যবহার করত। এছাড়া পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসারীরা প্যান্ট, কোট, টাই, নেকটাই ইত্যাদি ব্যবহার করত। এ মিশ্র সংস্কৃতির মাধ্যমেই এ জাতির পথচলা ও জীবন পরিচালিত হয়ে এসেছে।

নেতৃত্বের মাঝেও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন চেতনা লালনের মাধ্যমে জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে এসেছে। ধর্মীয়ভাবেও সকল সম্প্রদায় তাদের স্ব-স্ব ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে কখনো বাধা বিপত্তির মুখে পড়তে হয়নি।

শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)ও মনন-মানষে এদেশের জাতীয় সাংস্কৃতির বাইরের ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁর জীবনটি শিশুকাল হতেই ইসলামী ভাবধারা, ঐতিহ্য ও পরিবেশে গড়ে ওঠার ফলে দেশীয় সংস্কৃতি এবং ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতি তিনি সর্বোচ্চ অনুসরণে সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষত বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতাকালীন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়ায নসীহতসহ জাতীয় বিভিন্ন সংকটকালে প্রকাশিত রিসালাহ বা পত্রের মাধ্যমেও তিনি এদেশের আপামর জনতাকে ইসলামী ভাবধারায় গঠিত এদেশের জাতীয় সাংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। এমনকি সে আলোকে একটি উন্নত, মননশীল জাতি হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও তৎপরতা অব্যাহত রাখার জোর পরামর্শ ও সুপারিশ করতেন।

তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উক্ত ভাবধারা প্রতিভাত হত। তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততিসহ সকলকে ঐ একই ইসলামী সাংস্কৃতির আলোকে গড়ে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) : জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিবারিক জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও বংশ পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শৈশব, কৈশোর ও বাল্যকাল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা জীবন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ গমন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) : জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিবারিক জীবন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় তাঁর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ও সন্তান সন্ততিদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ও গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

প্রাপ্ত তথ্য সূত্রানুযায়ী আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) তৎকালীন নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর থানায় অবশ্য বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলাধীন ৩নং দালাল বাজার ইউনিয়নের সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম মোহাদেবপুরস্থ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পাটোয়ারী বাড়ির পাটোয়ারী বংশে ইংরেজি ১৯৩১ খ্রি. ১৩৩৮ বাংলা সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম রবিবার সুবহি সাদিকের এক শুভলগ্নে স্বীয় পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ সূফী মৌলভী আল্লামা আব্দুল কাদের (রহ.)। তাঁর দাদা ছিলেন অত্র মহাদেবপুর গ্রামের অত্যন্ত সুপরিচিত প্রতিপত্তিসম্পন্ন ও বিত্তশাশী ব্যক্তিত্ব জনাব করিম বক্স পাটোয়ারী। তিনি উক্ত এলাকার একজন অন্যতম খ্যতিমান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর দুটি পরিবার ছিল। প্রথম পরিবারে একমাত্র পুত্র সন্তান জনাব ফজলুর রহমান পাটোয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

আর দ্বিতীয় পরিবারে ৫ সন্তানের জন্ম হয়। ৩ জন পুত্র ও ২জন কন্যাসন্তান। তিন পুত্র সন্তান হলেন- (১) মো: আব্দুল ক্বাদের, (২) মোঃ আব্দুল জব্বার ও (৩) মোঃ আব্দুল জলীল। আর কন্যা দুজনের নাম অদ্যাবধি জানা যায়নি। তবে তাদের বড় জনকে মরহুম শামছুল হক মাষ্টারের মা বলে; তাঁর স্বামীর বাড়ি লক্ষ্মীপুর সদর থানার ২নং দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়নের গঙ্গাপুর গ্রামের ওয়াছিম উদ্দিন পাটোয়ারি বাড়ি। আর ছোট জন হলেন মহাদেবপুর গ্রামের মস্তান মসজিদ সংলগ্ন নেয়ামত উল্যাহ বেপারী বাড়ির ছলিম উদ্দীনের মা। তার অপর পুত্রের নাম হাফেজ লুৎফর রহমান।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) এর বংশ তালিকা উল্লেখ করা হলো:

---

১. মো. এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী, তিনি করিম বক্স পাটোয়ারীর নাতি। তিনি এলাকার বর্তমান গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ও বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। সাক্ষাৎকার গ্রহণ- ১৭/০৮/২০১৬ খ্রি.

আল্লামা নক্সবন্দীর (রহ.) দাদা ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান।[২]

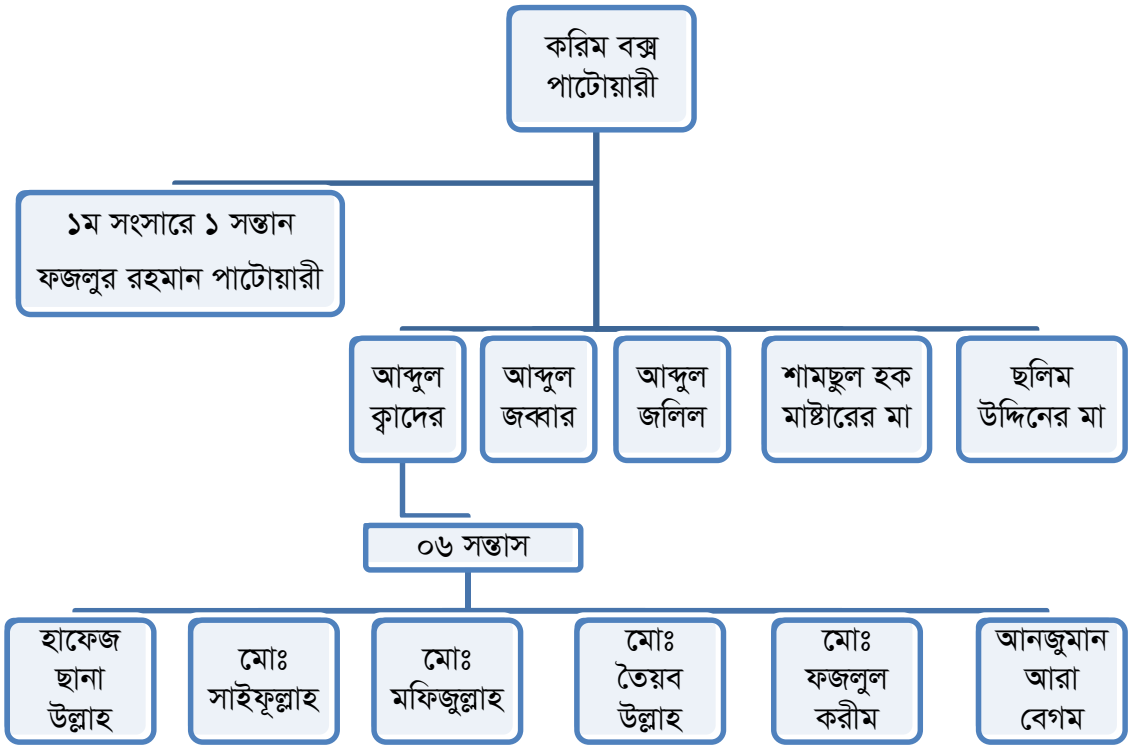

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর দাদা জনাব করিম বক্স পাটোয়ারির ২টি পরিবার ছিল। তার ১ম পরিবারে একমাত্র পুত্র সন্তান জনাব ফজলুর রহমান পাটোয়ারীর জন্ম হয়। তার দ্বিতীয় সংসারে ০৩ পুত্র ২ কন্যা জন্ম নেয়। তাদের মাঝে সবচেয় জ্যেষ্ঠ হলেন মৌলভী আব্দুল ক্বাদের (রহ.)।

২. বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. তোয়াহা মিঞা, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ১৭/০৮/২০১৬ খ্রি.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশব, কৈশোর ও বাল্যকাল

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর শৈশবকাল স্বীয় মাতুলালয়েই কাটে। তিনি পরহেজগার, বুজুর্গ, অলীয়ে কামিল, হাদীয়ে যামান ও মিল্লাত, শাহছুফি পিতা আল্লামা আব্দুল ক্বাদের মৌলভী নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) ও মাতা ফেরদৌসী বেগমের পরম ও অতুলননীয় আদর সোহাগে বেড়ে উঠেন।[৩] শৈশবকাল হতেই আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.)-এর আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের মাঝে ব্যতিক্রমধর্মী ভাব পরিলক্ষিত হয়। চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, মনন-মানসিকতায় পাড়া গ্রামের অন্যান্য শিশুদের তুলনায় নক্সবন্দী ছিলেন অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শিশুকাল হতেই তিনি অহেতুক, অযাচিত, অনাকাঙ্খিত ও অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ বিমুখ ছিলেন। খেলাধুলা, আড্ডা, অতিরিক্ত বেড়ানো ইত্যাদি কাজে তিনি কখনো অযথা সময় নষ্ট করতেন না। প্রতিটি মুহূর্তকে গণীমত মনে করে শৈশব হতেই গভীর রাত পর্যন্ত পড়ালেখা ও বুজুর্গ পিতার ওয়ায নসিহত ও বাণী শুনে সময় ব্যয় করতেন। গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত পিতার সান্নিধ্য পারিবারিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের মনস্তাত্বিক প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর ক্রমান্বয়ে প্রতিভাত ও পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠতে থাকে। পাড়া-প্রতিবেশীসহ সকল মানুষের প্রতি অত্যন্ত দরদী, সদালাপী ও মিশুক প্রকৃতির হিসেবেই তিনি বড় হন। এ সকল পারিবারিক শিক্ষা অবলম্বনেই তাঁর শৈশব কৈশোর ও বাল্যকাল ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকে।

শৈশবকাল হতে অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের অধিকারী আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) সত্যের ব্যাপারে আপোষহীন ও কঠোর ছিলেন। অবসর সময়ে নিরবে নির্জনে চিন্তা গবেষণা করেই বেশী সময় কাটিয়ে দিতেন। শিশুকাল পার হয়ে কৈশোরিক বয়সের দিকে অগ্রসর হতে হতে তাঁর স্বভাব ও চরিত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী ফুটে ওঠে। দৈনন্দিনের প্রতিটি কাজে-কর্মে রুচিবোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হতে থাকে। গ্রামের লোকজন তাঁর অনাড়ম্বর ও নির্মল চরিত্রে বিমুদ্ধ হতে থাকে। অতি অল্প বয়স হতেই কখনো অসত্য বলা বা মাতা-পিতার নিকট কোন অন্যায় ও অশোভন আবদার রাখতেন না। সমবয়সী, শ্রেণিবন্ধুদের মাঝে নিজে যেমন অশ্লীল-অশালীন বা অযথা গল্প করতে পছন্দ করতেন না, তেমনি অন্যদের মুখেও তা শুনতে পছন্দ করতেন না। বুজুর্গ পিতার বয়ান শ্রবণে ইসলামের আলোর দীক্ষায় দিক্ষীত হয়ে সর্বদা আশ্চার্যান্বিত হতেন।

জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি গভীর ধ্যানমগ্ন থাকতেন। শ্রেণি কার্যক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে বেশীরভাব একা থাকা পছন্দ করতেন। অবশ্য ছাত্রজীবন থেকেই ওয়ায নসিহত অনুশীলন করতেন। বিশেষত বেশী বেশী চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান করতেন নবীজীর দীদার

৩. মো. আব্দুল ক্বাদের জিলানী, মরহুমের বড় ছেলে, সাক্ষাৎকার গ্রহণ- ২৯ মে, ২০১৬ খ্রি.

লাভ করার জন্য। অবশেষে ছাত্র জীবনেই ধ্যানের মাঝে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। নবীজীকে তিনি স্বপ্নে পেয়ে যান। ঐ সূত্র ধরেই তিনি অষ্টম শ্রেণিতে থাকাকালীনই তাঁর পীর মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী রিয়াসাত রামপুরী (রহ.) তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন।

তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর ধীশক্তির অধিকারী আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.) স্বীয় সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। বাল্য বয়সেই তাঁর জ্ঞান প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকগণের প্রদত্ত পাঠ গভীর মনোযোগের সাথে ধারণ করে তা আত্মস্থ করেন, কিশোরকালেই তিনি মাদরাসা বোর্ডের অষ্টম শ্রেণিতে মেধা বৃত্তি লাভ করেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকবৃন্দের পাঠদানকালে তাঁর গভীর জ্ঞানদ্বীপ্ত প্রশ্নাবলী তাঁর মহান শিক্ষকবৃন্দকে অতীব মুগ্ধ করতো। এমনকি তাঁরই জ্ঞানলব্ধ বিজ্ঞতাপূর্ণ প্রশ্নে শিক্ষকবৃন্দ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দোয়া করতেন। জীবন ধারার মাঝে অতি অল্প বয়সেই নিজের সুপ্ত প্রতিভা ও মেধার বিকাশ সাধনে সক্ষম হন। ক্রমে ক্রমে বাল্য ও কিশোর বয়সে স্বীয় পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষকবৃন্দ, শ্রেণিবন্ধু-বান্ধবসহ সর্বশ্রেণির মানুষের নিকট একজন জ্ঞান-পিপাসু, চরিত্রবান, মেধাবী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সংস্পর্শে আগত শিক্ষার্থীরাও জ্ঞানলব্ধ জীবন গঠনে সক্ষম হতে থাকে।[৪]

৪. সাক্ষাৎকার : জনাব এনায়েতুল্লাহ পাটোয়ারী, মরহুমের ভাতিজা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৭ আগষ্ট, ২০১৬খ্রি.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা জীবন

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.) স্বীয় বুজুর্গ ওলী আল্লাহ পিতার হাতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্থানীয় মহাদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর মোটামুটি প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার পর ফেনী জেলার সোনাগাজী থানার সোনাগাজী ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসায় তার পিতার একজন বন্ধু যিনি শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁরই পরামর্শে তিনি স্বীয় পিতার নির্দেশে তথায় ভর্তি হন[৫] এবং মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া শুরু করেন। প্রখর মেধার অধিকারী নক্সবন্দী ষষ্ঠ শ্রেণি হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় অত্যন্ত মেধার পরিচয় দেন। তিনি অষ্টম শ্রেণিতে মেধাবৃত্তি লাভ করেন। কালক্রমে অধ্যয়নের গণ্ডিতে অগ্রসর হয়ে তিনি ফেনী জেলার সোনাগজী থানাস্থ সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা হতে প্রথম বিভাগে ১৯৫১ সালে আলিম পরীক্ষায় পাশ করেন। আলিম পরীক্ষায় তিনি মেধার স্বাক্ষর রাখেন। এখানেও তিনি মেধাবৃত্তি লাভে সক্ষম হন। তৎকালীন মাদরাসা বোর্ড হতে তিনি মেধাবৃত্তিসহ আলিম পাশ করেন। আলিম পাশ করার পর তিনি সেখানে জ্ঞানার্জন বিষয়ে আত্মতৃপ্ত হতে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তীতে তার পিতার পরামর্শে তৎকালীন পূর্ববাংলার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী খ্যতিমান, মাদরাসা ছারছীনা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন।[৬] গভীর মনযোগ ও জ্ঞানার্জনে ব্রতী থেকে তিনি উক্ত মাদরাসা হতে ১৯৫৩ সালে ফাজিল পাশ করেন। ফাজিল পরীক্ষায়ও তিনি ১ম বিভাগ লাভে সক্ষম হন এবং মেধাবৃত্তি লাভ করে পাশ করেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মোধাশক্তির কারণে মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী তাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। ঐ একই মাদ্রাসা হতে ১৯৫৬ সালে তিনি ১ম শ্রেণিতে কামিল (হাদীস) বিভাগ হতে উত্তীর্ণ হন। কামিল শ্রেণিতে হাদীস অধ্যয়নের সময় আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) বড় বড় হাদীস গ্রন্থাবলীর হাশিয়া (পাদটীকা) সহ সমগ্র গ্রন্থ আত্মস্থ করতে সক্ষম হন। জ্ঞান সাধনায় ছারছীনা মাদরাসায় অপরাপর শিক্ষার্থীদের তুলনায় আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি শ্রেণি কক্ষের অপরাপর শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে পাঠ আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। ফলে, শ্রেণিকক্ষের দূর্বল শিক্ষার্থীগণ তাঁর আলোচনা হতে বিশেষ ফায়দা লাভে সক্ষম হতেন। এমনকি তাঁর আলোচনায় অনেকে সন্তুষ্ট হতেন। এভাবে ছাত্রজীবন হতেই তিনি পাঠ আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে একজন সক্ষম ও যোগ্য পাঠ হৃদয়ঙ্গমকারীরূপে গড়ে তোলেন। ফলে যে কোন প্রতিষ্ঠানে যখনই তাঁকে পাঠদানের জন্য পাঠানো হতো তখনই তিনি সেখানে যোগ্যরূপে বিবেচিত হতেন।[৭]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

---

৫. বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. তোয়াহা মিঞা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। সাক্ষাৎকার গ্রহণ ১৭ আগষ্ট, ২০১৬ খ্রি.

৬. শাহাজাদা মোহাম্মদ ফারুক, মরহুমের ২য় পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি.

৭. *স্মারক আসলাফ-ই-জামেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ গমন

জ্ঞানসাধক ও জ্ঞানার্জনে ব্রতী আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-স্বদেশী জ্ঞানার্জন করেই খান্ত হননি। তিনি উচ্চতর শিক্ষার্জনে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কামিল প্রথম শ্রেণিতে পাশ করার পর তাঁর বুজুর্গ ওলী পিতার পরামর্শে স্বীয় জ্ঞানতৃষ্ণা মিটানোর নিমিত্তে নিখিল ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ রামপুরা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি কুরআন-হাদীসের জ্ঞানার্জন ও বুৎপত্তি লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু নক্সবন্দী এখানেও পরিপূর্ণ তৃপ্ত জ্ঞানার্জন করতে না পেরে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আরো জ্ঞানার্জন করেন। বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক সার্বিক উন্নতি সম্পন্ন জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে বিশেষত কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উসুলুল ফিক্হ, বালাগাত, মানতিক, হিকমাহ, ফালসাফা ইত্যাদি ইসলামী বিষয়াবলীতে তথা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় কঠোর অধ্যবসায়ের সাথে অধ্যয়ন পূর্বক পাকিস্তানের লাহোর শহরস্থ দারুল উলুম হিযবুল আহনাফ মাদরাসা হতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন।[৮] প্রতিনিয়ত তিনি মাদরাসার শ্রেণিকক্ষের পাঠ ব্যতিতও গভীররাত পর্যন্ত কিতাব অধ্যয়ন করতেন। আবার শেষ রাতে তিনি তাহাজ্জুদ আদায়ের নিমিত্তে নিশিরাত জেগে উঠতেন। সালাত সম্পন্ন করে পুনরায় অধ্যয়নে বসে যেতেন, তা চলতো ফজর সালাত পর্যন্ত।

বিদেশে ডিগ্রিলাভ কালে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে আসেন। অনেকের সাথে তাঁর বন্ধুত্বের সুযোগ হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দারুল উলুম হিযবুল আহনাফ মাদরাসায় পাঠকালীন তিনি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের ফুরফুরা দরবার শরীফের শাহজাদা সাইফুল্লাহ ছিদ্দিকীর সাথে বন্ধুত্ব করেন এবং আন্তর্জাতিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামায়ে কিরামের সহিত তাঁর গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। এরই সুবাদে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন সম্মেলন, সভা, মাহফিল ইত্যাদিতে যোগদানের সুযোগ পান। বিশেষত লন্ডন হিজাজ কনফারেন্স, ভারত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক সুন্নী সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ ও সারগর্ভ আলোচনা রাখতে সক্ষম হন।

৮. *আসলাফ-ই-জামেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে দিন-তারিখসহ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ করেও কোন নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। তবে, পারিপার্শ্বিক ও তাঁর বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে যোগাযোগ করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে।

পিতা-মাতার অত্যন্ত স্নেহের সন্তান আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) ১৯৫৩ সালে উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসা হতে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁর মায়ের পরামর্শে ১৯৫৪ সালে লক্ষ্মীপুর জেলার অন্যতম রায়পুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ রায়পুর গ্রামের মাষ্টার বশির উল্লাহ সাহেবের কন্যা জনাবা লুৎফুন নেছা বেগম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের ঔরসে ৪ কন্যা ও ২ পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।[৯] উক্ত পরিবারের ৪ কন্যা ও ২ পুত্র সন্তান হলেন:

(ক) কন্যা সন্তান ৪ জন :

১. ফেরদৌসী বেগম (মাকনুন)

২. শামীমা বেগম

৩. যাকিয়া খানম (যাকিয়া)

৪. নাজমা আক্তার

(খ) পুত্র সন্তান ২ জন :

১. আব্দুল কাদের জিলানী

২. লুৎফুল করীম

তার চার কন্যা ও দুই পুত্রের বংশের সন্তান-সন্ততির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল:

(১) প্রথম কন্যা ফেরদৌসী বেগম (মাকনুন) তাঁর স্বামীর নাম মরহুম মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি সর্বশেষ ফরিদগঞ্জ আলীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। এবং কয়েকবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর ঔরসে দুই কন্যা ও ছয় পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। দুই কন্যা হলেন- ১. মোবাশ্বেরাতুল বতুল, স্বামী- মো. আনোয়ার হোসনে। তিনি ইতালী প্রবাসী। এ ঘরে ৩ কন্যা

৯. আব্দুল কাদের জিলানী, সাক্ষাৎকার : ৩০ মে, ২০১৬ খ্রি., মরহুমের প্রথম পরিবারের বড় ছেলে।

রয়েছেন।- (ক) মারিয়া আফরিন (আনিকা), (খ) মাহবুবা আক্তার (আতিকা), (গ) মনি মুন্তাহা (রাহিকা)। দ্বিতীয় মেয়ের নাম : মুরশিদা আক্তার (আফিফা) তার স্বামীর নাম মোঃ জিল্লুর রহমান। এ ঘরে ২জন পুত্র সন্তান রয়েছেন। যথা (ক) আব্দুল রহমান (নাফি), (খ) মাহতাব মুস্তফা (ওয়াফী)।

আর ৬ জন পুত্র সন্তান তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ হলেন- (১) হামেদ আইয়ূব (নিহাল) স্ত্রীর নাম : ফাতেমা আক্তার। এ ঘরে ১ কন্যা ও ২ পুত্র রয়েছেন। কন্যার নাম মেহেরুন্নেছা (নিহা) এবং ২ পুত্রের নাম (ক) জুবায়ের হোসেন ও (খ) জুনায়েদ হোসেন। ২. রাশেদ আইয়ূব হেলাল, তাঁর স্ত্রীর নাম আসমা আক্তার। এ ঘরে ১পুত্র মুজতবা আলী রজব এবং ১ কন্যা ছাবেরা রহমান রয়েছেন। ৩. মোরশেদ আইয়ূব বেলাল। তিনি অদ্যাবধী বিবাহ করেননি। ৪. মাহমুদ আইয়ূব কাউছার স্ত্রীর নাম আয়েশা ছিদ্দিকা। ৫. ফজলুল করীম সগীর। তার স্ত্রীর নাম সোহানা আক্তার এ ঘরে ১ পুত্র রয়েছেন- সাদ বিন সগীর। ৬. রিয়াজুল করীম (কবির) তার স্ত্রীর নাম মীম রহমান। এ ঘরে ১ কন্যা রুকাইয়া করিম (রাবিতা)

(২) দ্বিতীয় কন্যা মোসাম্মাৎ শামীমা বেগম। তাঁর স্বামীর নাম মো. শামছুদ্দীন ভূইয়া। তিনি দীর্ঘ দিন সৌদী আরবে প্রবাসী ছিলেন। ঢাকার মোহাম্মদপুরে বর্তমানে নিজ বাড়িতে বসবাস করছেন। তাদের ঔরসে ১ কন্যা ও ২ পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ১ কন্যার নাম ফরিদা আক্তার লুবনা, স্বামীর নাম- নিছার আহম্মেদ এ ঘরে দুজন পুত্র সন্তান রয়েছেন। (ক) ফারহানুল হক (খ) মাহিন আহমেদ (অর্পন) তার দুই পুত্র ও তাদের পরিবারবর্গ হলো- ১. আলা উদ্দিন রিপন। তিনি জামালপুর জেলার কৃষি অফিসার। তার স্ত্রীর নাম জিসান আক্তার। তাদের ১জন পুত্র সন্তান রয়েছে, যার নাম- আরিয়ান। আর দ্বিতীয় পুত্র হলেন সালাহ উদ্দীন। তিনি ঢাকার বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। তার স্ত্রীর নাম রুমানা আক্তার।

(৩) তৃতীয় কন্যা যাকিয়া খানম (যাকিয়া)। তার স্বামীর নাম মাওলানা মোহাম্মাদ খাইরুল্লাহ। তিনি বিশিষ্ট আলেম। বর্তমানে জামালপুর আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর ঔরসে ৩ পুত্র ও ১ কন্যার জন্ম হয়েছে। পুত্রগণ হলেন- মাওলানা সাইফুল করীম (নাঈম) তিনি কামিল পাশ ও এম.এ (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) বর্তমানে চট্টগ্রাম গোহিয়া ফাযিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক। তার স্ত্রীর নাম ফারহানা আক্তার। তার ঘরে ১ পুত্র রয়েছেন- নাবিল হাসান। ২. মো. শামছুল করিম (নাসিম) বর্তমানে চট্টগ্রাম জামেয়া আহম্মদীয়া সুন্নীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রামে ফাযিল শ্রেণিতে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট (আই.ই.আর) বি.এ (সম্মান) শ্রেণিতে ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত। ৩. মোহাম্মদ মনজরুল করিম (নাজিম) বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া চট্টগ্রামের আলিম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। এ ঘরের ১ কন্যার নাম জুবাইয়া খান। তিনি ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় হতে শান্তি ও সংঘর্ষ বিষয়ে (সম্মান) সহ এমএ পাশ করেন। তার স্বামীর নাম মো. মনিরুজ্জামান সবুজ। তাদের ঔরসে ১ কন্যা ও ১ পুত্র সন্তান রয়েছেন। কন্যার নাম নাইমা তাবাস্সুম নাবিহা এবং পুত্রের নাম জারিদ হাসান (নাফিদ)।[১০]

(৪) চতুর্থ কন্যা নাজমা আক্তার। স্বামীর নাম মো. নজরুল ইসলাম। তাদের ঔরসে তিন কন্যা (ক) আয়েশা ইসলাম নিশাদ- এইচ.এস.সি পাশ (খ) সামিয়া ইসলাম (নিগার) এবং (গ) জান্নাতুল মাওয়া (নিহার)। প্রত্যেকেই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে অধ্যয়নরত।

উক্ত পরিবারের পুত্রদ্বয়ের স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিদের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপিত হল-

(৫) মাওলানা আব্দুল ক্বাদের জিলানী। তিনি কামিল (হাদীস) পাশ করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে প্রথম শ্রেণিতে কামিল পাশ করেন। অতঃপর ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর থানার দাত মণ্ডল গ্রামের পীর মাওলানা আবু সাঈদ আল-ক্বাদরীর সুযোগ্য কন্যা মাওলানা রাহনুমা বেগমকে বিবাহ করেন। তাঁদের ঔরসে ২ জন পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে (ক) মেজবাহুল করীম তকী, (খ) মিফতাহুল করীম নকী। উভয়ে হাফেযে কুরআন ও চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নরত।

(৬) লুৎফুল করীম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ম্যানেজম্যান্ট-এ এম.এ পাশ করেন। তিনি লক্ষ্মীপুর সদর থানার ১১ নং হাজির পাড়া ইউনিয়নের চরপাতা গ্রামের মরহুম আনোয়ারুল হক সাহেবের কন্যা ডা. আয়েশা ছিদ্দিকা-কে বিবাহ করেন। তাঁদের ঔরসে ২জন কন্যা সন্তান রয়েছেন। (ক) রুফায়দা করিম সুবহা এবং (খ) নাবিহা নাজনীন নাবিহা। উভয়ে মায়ের সাথে ঢাকায় অবস্থান করে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

দ্বিতীয় পরিবারের পরিচিতি

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) সাহেবের পরিবার ছিল অনেক বিরাটকায় এবং বৃহদাকারের। একজন স্ত্রীর পক্ষে এত বিশাল পরিবার পরিচালনা সম্ভব হচ্ছিল না, তাছাড়া তাঁর প্রথম স্ত্রী বেশ অসুস্থও ছিলেন। ফলে নক্সবন্দী সাহেবের মায়ের নির্দেশে তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীপুর পৌরসাভার সমসেরাবাদ গ্রামের মো. আব্দুল কুদ্দুছ মিঞার মেজ মেয়ে ফেরদৌস আরা সুরাইয়া বেগমের সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই পরিবারে তাঁদের ঔরসে ৯ সন্তানের জন্ম হয়। ৫ জন পুত্র সন্তান এবং ৪

১০. রাহনুমা জিলানী, আল্লামা নক্সবন্দীর ১ম পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী, সাক্ষাতৎকার ২৯ মে, ২০১৬ খ্রি.

জন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। নিম্নে দ্বিতীয় পরিবারের সন্তান-সন্ততি ও তাদের বর্ণনা উপস্থাপিত হল:

(১) প্রথম পুত্রের নাম শাহজাদা জহিরুল করিম (ফারুক) তিনি ঢাকার মোহাম্মদ পুরের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব মরহুম শেখ গণি সাহেবের কন্যা মাকছুদা বেগমকে বিবাহ করেন। তাঁদের ১ পুত্র রেদোয়ানুল করীম এইচ.এস.সি পাশ।

(২) দ্বিতীয় পুত্রের নাম শাহজাদা ফেরদাউস করিম (দরবেশ)। তিনি লক্ষ্মীপুর সদর থানার ১৭ নং ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামের মাওলানা জামাল উদ্দিনের সুযোগ্য কন্যা জামিলাতুন নেছার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঔরসে ২ সন্তান বিদ্যমান (ক) কন্যা সন্তান আফনান বিনতে ফেরদাউস এবং (খ) পুত্র সন্তান মুফলিহুল করিম মিশকাত।

(৩) তৃতীয় পুত্রের নাম আতাউল করিম মুজাহিদ। তিনি মরহুম নক্সবন্দী (রহ.) এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা হতে কামিল পাশ করে বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতার পর বর্তমানে চাদপুর জেলার মতলব থানার ফরাজীকান্দি ওয়াইসিয়া দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৫ সালে তিনি কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা কোটবাড়ি জামে মসজিদের সাবেক ইমাম মরহুম মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন এর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ কন্যা সালমা আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঔরসে ৩ সন্তান রয়েছে। (ক) কন্যা সন্তান তোহফাতুল করিম (বুশরা) বাকী দুজন পুত্র সন্তান (খ) আহমেদুল করিম (হুযায়ফা) এবং (গ) ওয়াইসুল করিম (ওয়াইসি)। তারা প্রত্যেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

(৪) চতুর্থ সন্তান রেজাউল করিম (ইশফাক)। তিনি দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন শেষে ২০০৭ সালে দেশে ফিরে লক্ষ্মীপুর সদর থানার ২নং দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়নের পশ্চিম নন্দনপুর গ্রামের জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান মিঞার জ্যেষ্ঠ কন্যা ফারজানা আক্তার এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঔরসে ফয়জুল করিম (ইনান) নামে একজন পুত্র সন্তান রয়েছে।

(৫) শামছুল করিম বোরহান। তিনি লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ হতে এইচ.এস.সি পাশ করে প্রবাসে চলে যান। বর্তমানে কাতারে রয়েছেন। ২০১২ সালে তিনি স্বীয় গ্রাম পশ্চিম নন্দনপুরের ডাক্তার আমিনুল ইসলামের কন্যা আয়েশা আক্তার-কে বিবাহ করেন। তাদের ঔরসে এক পুত্র রয়েছে। তার নাম সাজিদুল করীম আশিক।

দ্বিতীয় পরিবারের কন্যাসন্তানগণও তাদের সন্তান-সন্ততির পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

এ পরিবারে ০৪ কন্যা-

০১. রেজিনা বেগম। তিনি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার চরহোগলা গ্রামের জনাব রুস্তম আলী পাটোয়ারীর পুত্র জনাব মো. হানিফ পাটোয়ারীর সাথে ৭ই মার্চ, ১৯৯৬ খ্রি. সনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের ঔরসে ৪ জন সন্তানের জন্ম হয়। ৩ জন কন্যা সন্তান (ক) হাফছা জাহান তিনি বিবাহিত। স্বামীর নাম এম. টিপু সুলতান। তাদের ১ পুত্র সন্তান রয়েছে নাম আনিক আহমদ। (খ) নুছরাত জাহান (তাহা) এবং ১জন পুত্র সন্তান- আসাদুল্লাহিল গালিব (রুম্মান)। তিনি হেফজুল কুরআন অধ্যয়নরত।

০২. মারজাহান বেগম। তিনি লক্ষ্মীপুর সদর থানার ১৫ নং লাহার কান্দি ইউনিয়নের পশ্চিম সৈয়দপুর গ্রামের মাওলানা এ.টি.এম রফিকুল্লাহর জ্যেষ্ঠ সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইলের সাথে ২০০৩ সনের জুলাই মাসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঔরসে তিন পুত্র সন্তান। (ক) রফিকুর রহমান মো. ছালেহ, হাফেযী অধ্যয়নরত। (খ) আবিদুর রহমান মোহাম্মদ ছাদেক, হাফেজী অধ্যয়নরত। (গ) নাঈমুর রহমান মোহাম্মদ ইব্রাহীম।

০৩. কামরুন্নাহার (কামরুন)। তিনি ৩নং দালাল বাজার ইউনিয়নের মহাদেবপুর গ্রামের পাটোয়ারী বাড়ির মরহুম ওয়াজি উল্লাহ মাস্টারের ৩য় পুত্র খালেদ হোসেন বাচ্চুর সাথে বিবাহিত হন। তাঁদের ঔরসে ২ পুত্র সন্তান। (এক) আবদে আহাদ (আনাব) এবং (দুই) আহনাফ (আরাফ)।

০৪. উম্মে হাবীবা। তিনি রায়পুর থানার বামনী ইউনিয়নের বামনী গ্রামের মরহুম নূর আহমদ মিঞার জ্যেষ্ঠ সন্তান জনাব মো. নূরে আলম (খোকন)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁরা সপরিবারে কাতার প্রবাসী। তাদের ১ জন সন্তান রয়েছে- ইসরাত জাহান (খুশবু)।

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) এর ১ম স্ত্রী দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ। দ্বিতীয় স্ত্রীর পক্ষে একা সংসার ব্যবস্থাপনা করা ছিল বেশ দুরুহ। তাঁর জন্য পারিবারিক ভাবেও জনশক্তির প্রয়োজন ছিল, অপরদিকে কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসার দীর্ঘদিন হতে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী জনাব আতাহার আলী মুন্সী সাহেবের ৬ জন কন্যা হতে তিনি নক্সবন্দী হুজুরকে অত্যন্ত ভক্তি করে ১জন কন্যা দান করলেন। দানকৃত কন্যাকে নিয়ে আসতে অবশ্যই বিবাহের প্রয়োজন হয়। অবশেষে তিনি ১৯৭৭ সালে পুনরায় কুমিল্লার সদর থানার চকবাজারস্থ সুজানগর গ্রামের আতাহার আলী মুন্সী সাহেবের কন্যা জুলেখা বিবিকে তৃতীয় স্ত্রী রূপে বিবাহ করেন।

তৃতীয় পরিবারে তাঁর ঔরসে ২ সন্তানের জন্ম হয় ১ জন কন্যা এবং একজন পুত্র সন্তান। কন্যা সন্তান জাহানারা আক্তার বিবাহিত। স্বামী চাদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার অধিবাসী

আবু ছালেহ মোঃ আবু সুফিয়ান। তারা ২ পুত্র সন্তানের জনক-জননী। (ক) মেহরাব হোসেন এবং (খ) জুনায়েদ হোসেন আর পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ গোলাম নূর সম্প্রতি বিবাহ করেন। তার স্ত্রীর নাম শাহজাদী হানী তানজিমুল মিশকাত।[১১] জনাব গোলাম নূর বর্তমানে কুমিল্লা সোনাকান্দা আলিয়া মাদরাসার ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত।

১১. সাক্ষাৎকার : শাহজাদা মোহাম্মদ জহিরুল করিম ফারুক, ৩০ শে জুন, ২০১৬ খ্রি.

নিম্নে স্মরণীর মাধ্যমে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী (রহ.) এর বৈবাহিক অবস্থা এবং পারিবারিক ধারা বর্তমান পর্যন্ত তুলে ধরা হল।

স্মারণী- ১ (ক)

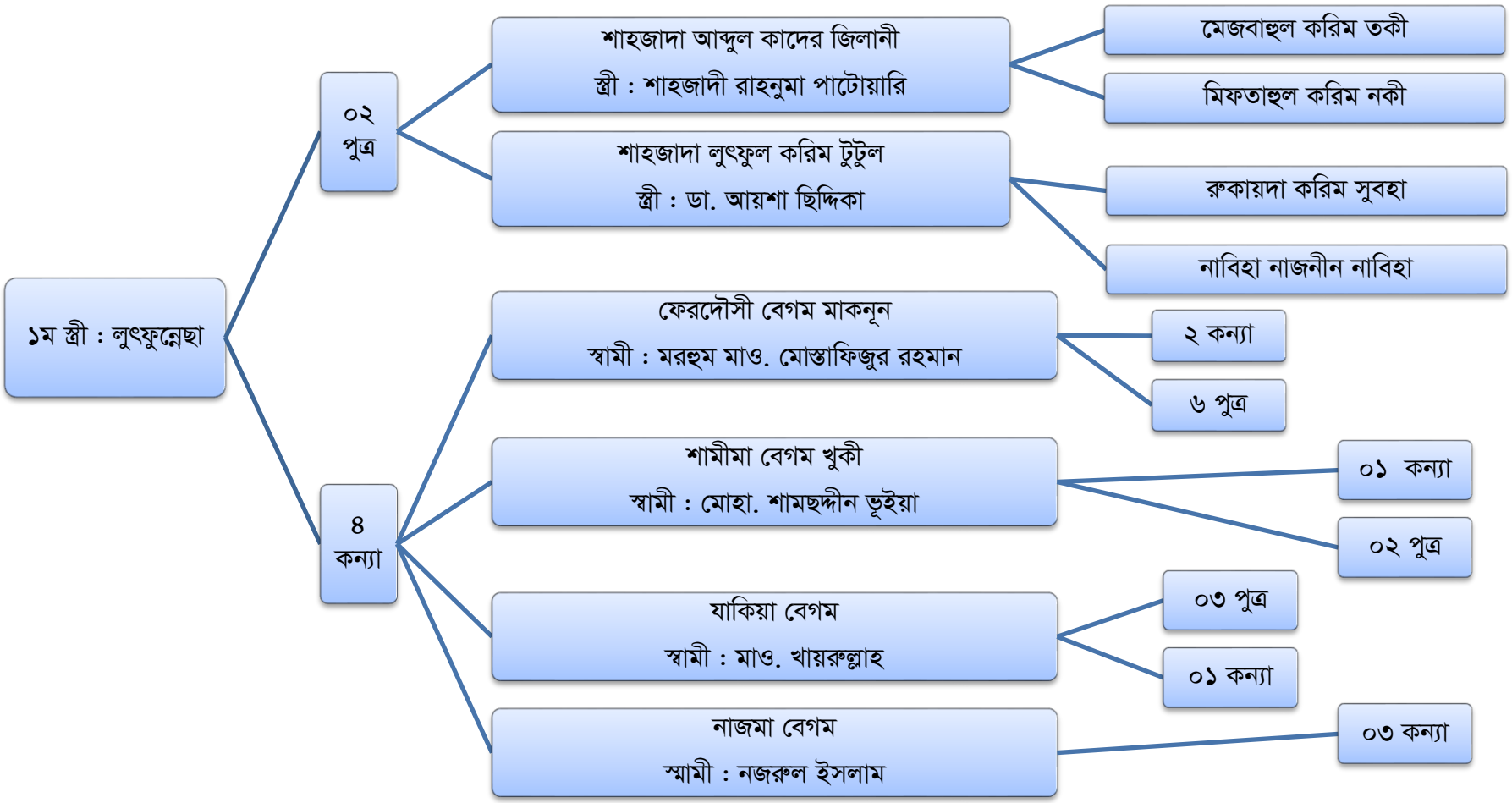

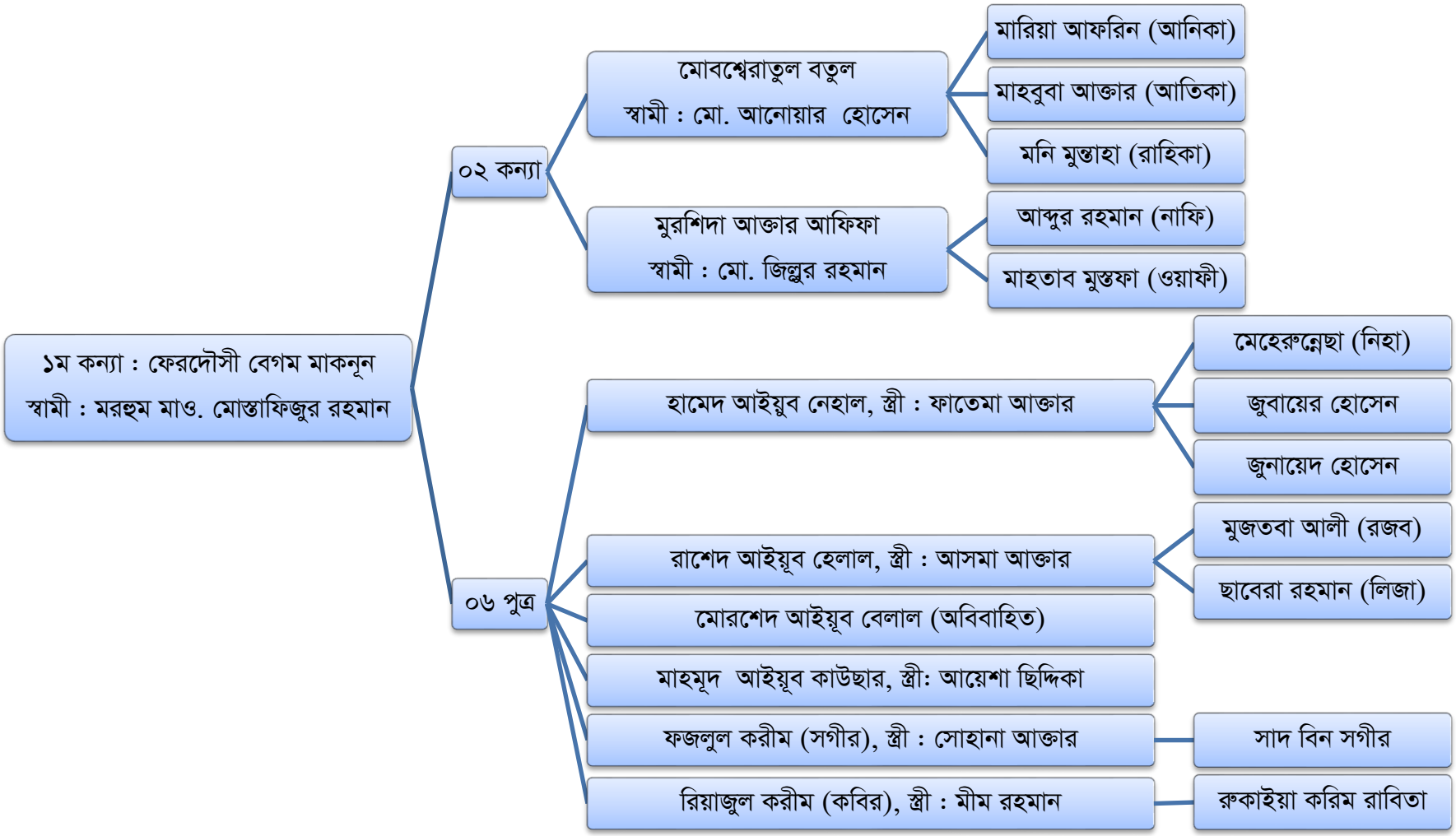
১ম কন্যা : ফেরদৌসী বেগম মাকনূন
স্বামী : মরহুম মাও. মোস্তাফিজুর রহমান
০২ কন্যা
মোবশ্বেরাতুল বতুল
স্বামী : মো. আনোয়ার হোসেন
মারিয়া আফরিন (আনিকা)
মাহবুবা আক্তার (আতিকা)
মনি মুন্তাহা (রাহিকা)
মুরশিদা আক্তার আফিফা
স্বামী : মো. জিল্লুর রহমান
আব্দুর রহমান (নাফি)
মাহতাব মুস্তফা (ওয়াফী)
০৬ পুত্র
হামেদ আইয়ুব নেহাল, স্ত্রী : ফাতেমা আক্তার
মেহেরুন্নেছা (নিহা)
জুবায়ের হোসেন
জুনায়েদ হোসেন
রাশেদ আইয়ূব হেলাল, স্ত্রী : আসমা আক্তার
মুজতবা আলী (রজব)
ছাবেরা রহমান (লিজা)
মোরশেদ আইয়ূব বেলাল (অবিবাহিত)
মাহমূদ আইয়ূব কাউছার, স্ত্রী: আয়েশা ছিদ্দিকা
ফজলুল করীম (সগীর), স্ত্রী : সোহানা আক্তার
সাদ বিন সগীর
রিয়াজুল করীম (কবির), স্ত্রী : মীম রহমান
রুকাইয়া করিম রাবিতা

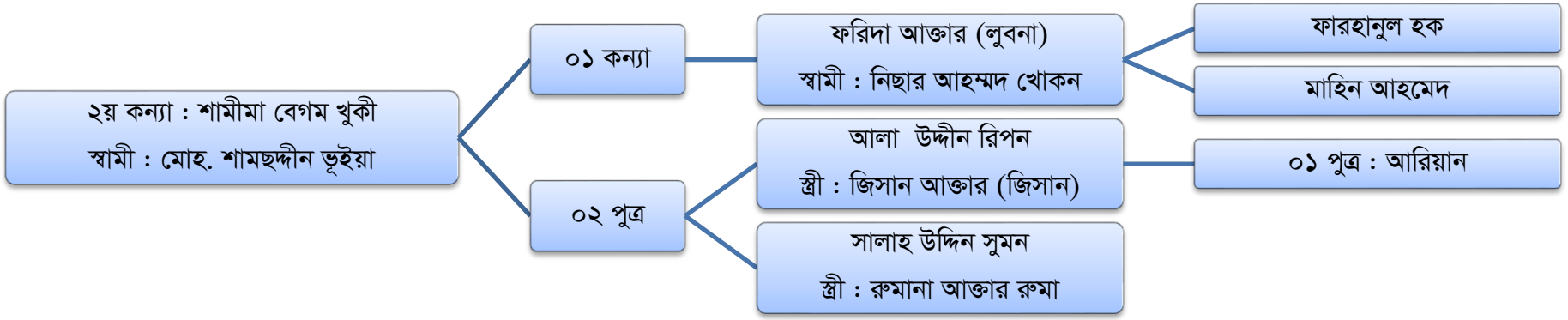
২য় কন্যা : শামীমা বেগম খুকী
স্বামী : মোহ. শামছদ্দীন ভূইয়া
০১ কন্যা
ফরিদা আক্তার (লুবনা)
স্বামী : নিছার আহম্মদ খোকন
ফারহানুল হক
মাহিন আহমেদ
০২ পুত্র
আলা উদ্দীন রিপন
স্ত্রী : জিসান আক্তার (জিসান)
০১ পুত্র : আরিয়ান
সালাহ উদ্দিন সুমন
স্ত্রী : রুমানা আক্তার রুমা

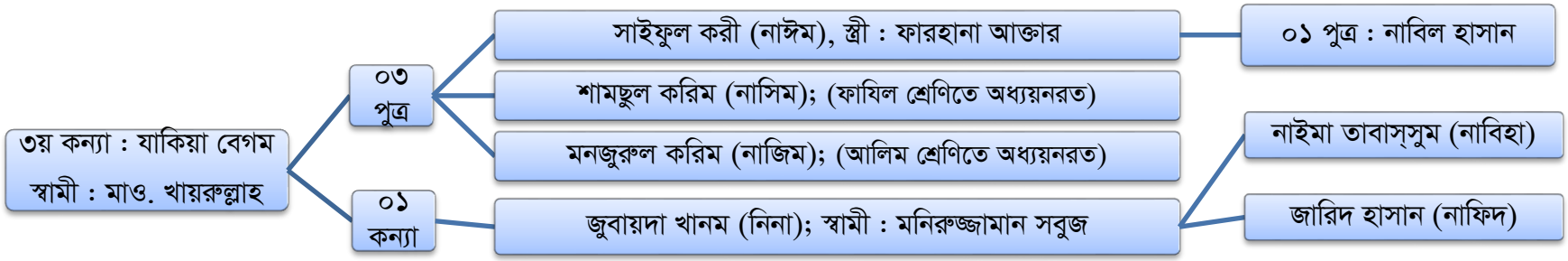
৩য় কন্যা : যাকিয়া বেগম
স্বামী : মাও. খায়রুল্লাহ
০৩ পুত্র
সাইফুল করী (নাঈম), স্ত্রী : ফারহানা আক্তার
০১ পুত্র : নাবিল হাসান
শামছুল করিম (নাসিম); (ফাযিল শ্রেণিতে অধ্যয়নরত)
মনজুরুল করিম (নাজিম); (আলিম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত)
০১ কন্যা
জুবায়দা খানম (নিনা); স্বামী : মনিরুজ্জামান সবুজ
নাইমা তাবাস্‌সুম (নাবিহা)
জারিদ হাসান (নাফিদ)

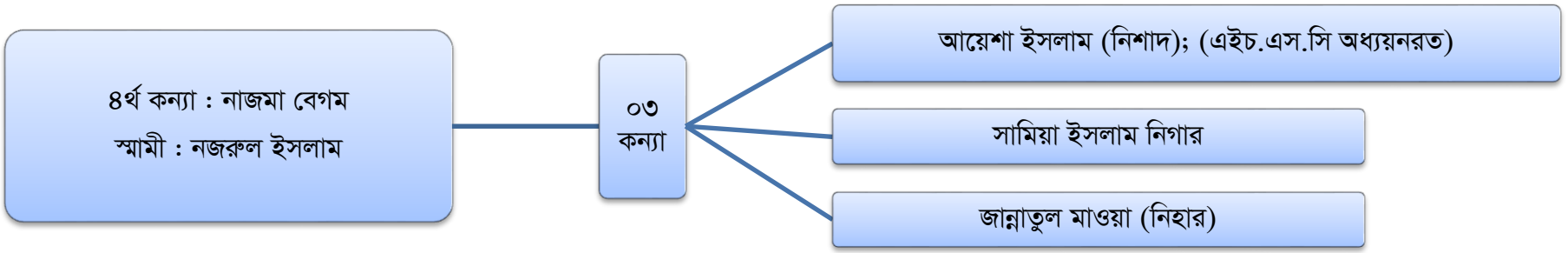
৪র্থ কন্যা : নাজমা বেগম
স্বামী : নজরুল ইসলাম
০৩
কন্যা
আয়েশা ইসলাম (নিশাদ); (এইচ.এস.সি অধ্যয়নরত)
সামিয়া ইসলাম নিগার
জান্নাতুল মাওয়া (নিহার)

২য় পরিবারের আওলাদের স্মারণী- ০২
(ক) ২য় স্ত্রীর ০৫ জন পুত্র সন্তান ও তাদের আওলাদ

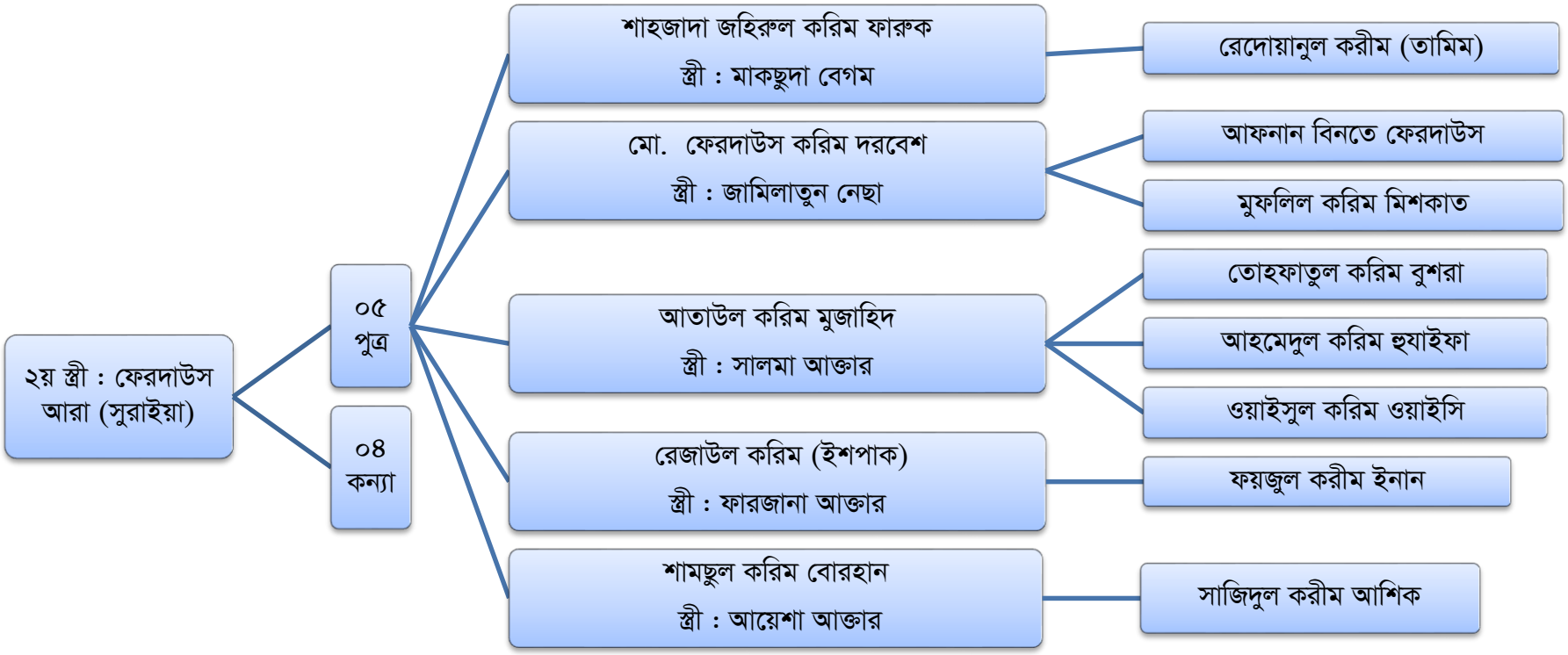

(খ) ২য় স্ত্রীর ০৪ জন কন্যা সন্তান ও তাদের আওলাদ

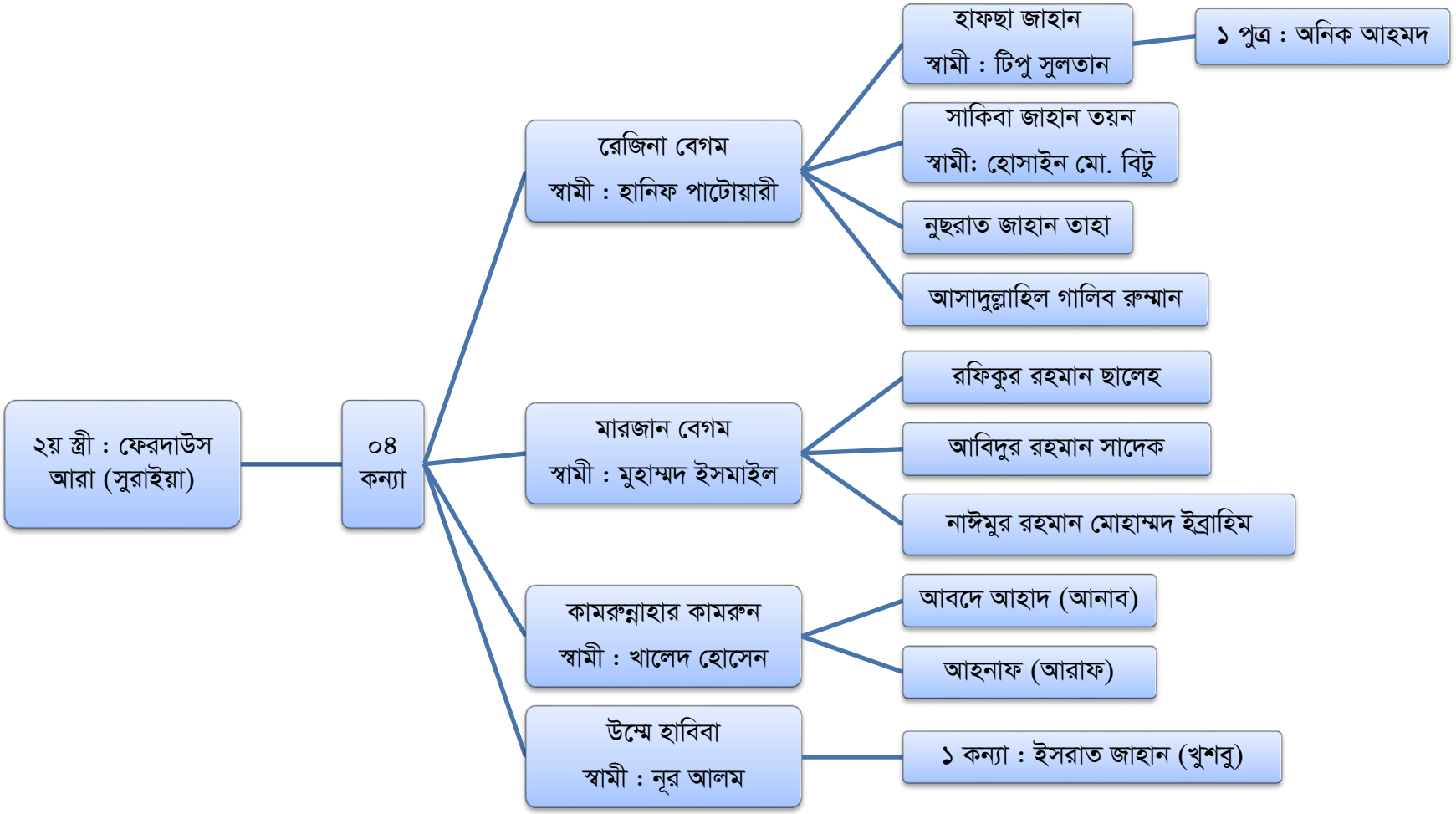

৩য় স্ত্রীর পরিবারের আওলাদের স্মারণি- ০৩

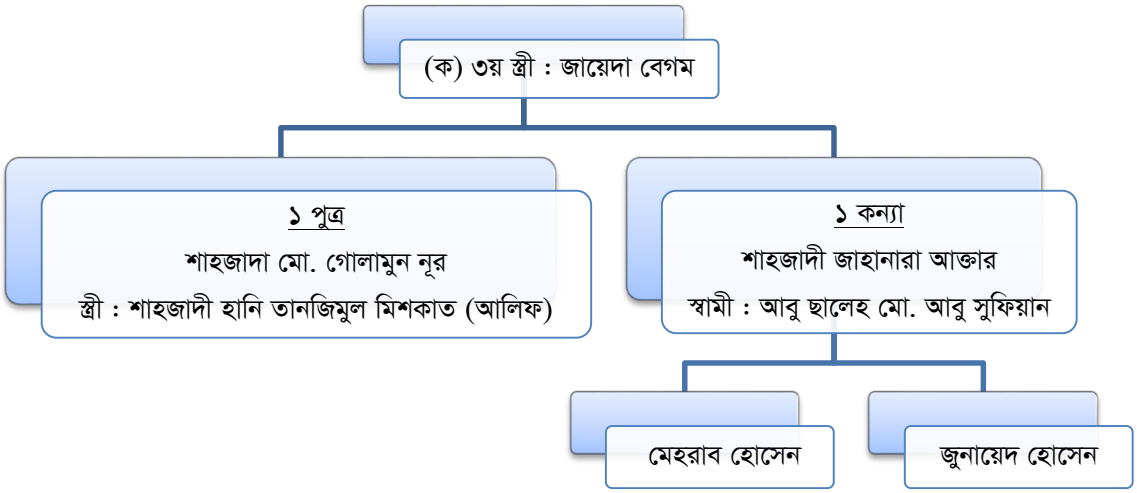

১২

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করলেও কখনো কোন পরিবারকে খাটো করে দেখেননি। প্রতিটি পরিবারের সন্তানদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। প্রতিটি সন্তানই যখন মূল ঠিক রেখে যেমুখী পাঠ সম্পন্ন করতে চেয়েছেন তিনি তাকে তার প্রতিভানুযায়ী সেদিকে অধ্যয়নে উৎসাহিত করেছেন এবং সে জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার রাস্তায় এগিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি সন্তান হয়ত উচ্চ শিক্ষিত হয়নি, কিন্তু আত্মজ্ঞান, আত্মোপলব্ধিমূলক জ্ঞান সকলেই অর্জন করেছেন। সন্তান-সন্ততি প্রত্যেকেই তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন এবং স্ব-স্ব অবস্থানে অটল-অবিচল থেকে সত্যের পথে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন।

আল্লামা নক্সবন্দী সন্তানদের জন্য কোন সম্পদ রেখে যাননি বটে, কিন্তু, প্রত্যেককে তার গতিতে চলার অবস্থায় রেখে গিয়েছেন এবং তিনি উক্তি করেছেন যে, "আমি অতিরিক্ত সম্পদ রেখে গিয়ে সন্তানদের মাঝে হানাহানি সৃষ্টি হতে দেব না, বরং তাদের যোগ্যতা সৃষ্টি করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করে দিয়ে গেলাম, যাতে তারা সকলেই সম্মানের জীবন-যাপন করতে পারে।"[১৩] বাস্তবেও তাই তারা কেউ পরমুখাপেক্ষী নয়। প্রত্যেকেই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অত্যন্ত সুখী জীবন-যাপন করছেন।

---

১২. ফেরদাউস করিম (দরবেশ), মরহুমের ২য় পরিবারের ২য় পুত্র। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৯ মে, ২০১৬ খ্রি.; শাহজাদী রাহনুমা পাটোয়ারী মরহুমের ১ম পরিবারের প্রথম পুত্রের স্ত্রী, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৩০শে মে, ২০১৬ খ্রি.

১৩. শাহজাদী মারজাহান বেগম, মরহুমের ২য় পরিবারের দ্বিতীয় কন্যা; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২১ জুলাই, ২০১৬ খ্রি.

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর তাসাউফ চর্চা ও আধ্যাত্মিক জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক শিক্ষার হাতেখড়ি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রিয়াসাতে রামপুরের বাইয়াত, ইজাযাত ও খিলাফাত গ্রহণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ছারছীনা অধ্যয়নকালীন বাইয়াত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ফুরফুরা শরীফের বাইয়াত ও দীক্ষা গ্রহণ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইসলাম প্রচারে তাসাউফের চর্চা ও প্রয়োগ

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর তাসাউফ চর্চা ও আধ্যাত্মিক জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিক শিক্ষার হাতেখড়ি

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) ছিলেন জন্মগতভাবেই একজন ওলী। তাঁর পিতা আল্লামা মৌলভী আব্দুল ক্বাদের নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ছিলেন তৎকালীন একজন ওলীয়ে কামিল, হাদীয়ে যামান এবং শাহ সূফী। ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ রামপুরের বিশিষ্ট ওলী ও পীরে কামিল মাওলানা এনায়েত উল্লাহ খান নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) এর বাংলাদেশস্থ অন্যতম খলিফা। আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী ছোটবেলা হতেই পিতার প্রদর্শিত পথে আদর্শিক সবক গ্রহণ করে জ্ঞানার্জনের পথে এগুতে থাকেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারিক ভাবেই শুরু হয়। সে ধারাবাহিকতায় আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদীয়া তরীকার প্রাথমিক দীক্ষা পিতা হতেই পান। প্রতিবছর আল্লামা আব্দুল কাদের মৌলভী নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী (রহ.) এর বাড়িতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক মাহফিলে রিয়াসতে রামপুরের পীর কেবলা মাওলানা এনায়েত উল্যা খান সাহেব আগমন করতেন। তিনি উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসাবে ওয়ায পেশ করতেন এবং মৌলভী আব্দুল কাদের নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী (রহ.) তাঁর পীরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ নিজ বাড়ির সম্মুখে জমি কালেকশন করে 'মোহাদেবপুর এনায়েতিয়া দাখিল মাদরাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। জনাব আল্লামা এনায়েত উল্যা খান নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী (রহ.) তাঁর ইনতিকালের সময়ে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র আল্লামা মাওলানা মোহাম্মদ উল্যা খান নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী (রহ.) কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত দায়িত্ব প্রদান করেন। সে সুবাদে আল্লামা মোহাম্মদ উল্যা নক্সবন্দী মোজাদ্দেধী (রহ.) এর হাতে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.) বাইয়াত গ্রহণ করেন বাল্যবয়সে এবং বাইয়াত গ্রহণের স্বল্প কিছুদিন পরই তিনি খিলাফাত প্রাপ্ত হন। তখন তিনি মাদরাসার অষ্টম তথা হাপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। সোনাগাজী ফাযিল মাদরাসার তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তৎকালীন ৮ম শ্রেণিতে মাদরাসা বোর্ডে তিনি বৃত্তি লাভ করে অত্র মাদরাসার সুখ্যাতি ছড়িয়ে দেন। ফলে সোনাগাজী মাদরাসা অত্র এলাকায় আরো অধিক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করে। ৮ম শ্রেণি হতেই আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী (রহ.) তাঁর পীর কেবলার খিলাফত লাভে ধন্য হয়ে তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করতে থাকেন। এবং ছাত্র জীবন হতেই তরীকতের একজন ধারক-বাহক হিসেবে এবং সুবক্তা ও সৎ চরিত্রবান, মেধাবী, ভাল ছাত্র হিসেবে বিশেষ খ্যতি অর্জন করেন। তিনি নিয়মিত জ্ঞানার্জনের

পাশাপাশি নিয়মিত আধ্যাত্মিক সাধনায়ও ব্যস্ত থাকতেন।[১] বিশেষ করে তাঁর ওলী বুজুর্গ পিতা এবং স্বীয় পীর কেবলার বিশেষ নযরে তিনি অবস্থান করতেন। সে ধারাবাহিকতায়ই তিনি নবীজীর সাথে মোলাকাতের সুযোগ পান। নিয়মিত অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি আধ্যাত্মিকতার চর্চায়ও ব্রতী ছিলেন। নিজেকে অত্যন্ত ছোট ভেবে সঠিক ও যথাযথ কর্মের স্পৃহায় তিনি ছিলেন সদা জাগরুক ও তৎপর। মহান আল্লাহর ওলীগণের সংস্পর্শে নিজেকে সর্বদা সপে দিতে তিনি কখনো দ্বিধাবোধ করতেন না। শরীয়তের বিধি-বিধানের পূর্ণ অনুসারী রূপে আত্ম-গঠনের পাশাপাশি তিনি নিজেকে অতি সাধারণ ব্যক্তিরূপে পরিচালনা করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বেশিরভাগ সময় একা ও একাকীত্ব পছন্দ করতেন। কেননা, জ্ঞান সাধনা ও নবী ওলীগণের ধ্যান সাধনাকারী মহান ওলী আল্লাহ্গণ যেভাবে নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতেন, তিনিও সেভাবে অত্যন্ত সহজ-সরল ও অতীব সাধারণভাবে জীবনাতিবাহিত করতেন। তবে, সত্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আপোষহীন হিসেবে তিনি অজস্র বাহাস ও তর্কে লিপ্ত হন। এবং সর্বদা ঐ সকল তর্কে তিনিই বিজয়ী হতেন। তিনি তাঁর পীরের তরিকতানুসারে জীবন-যাপন, জ্ঞান-ধ্যন ও সকলকিছু পরিচালনার চেষ্টা করতেন। তাঁর এরূপ কর্মের মাধ্যমেই তিনি তাঁর প্রাথমিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন।[২]

---

১. সাক্ষাৎকার : মুহাম্মদ মুদাচ্ছির হোসেন, আল্লামা নক্সবন্দীর চাচাত ভাই ও সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢা.বি. এর অফিস সহকারী। সরাসরি কথোপকথন : ১৯/০৪/২০১৬ খ্রি.।

২. সাক্ষাতকার : মাওলানা আবুল কাশেম, ইমাম, পশ্চিম নন্দনপুর পাঞ্জেগানা মসজিদ, মরহুমের প্রতিবেশী সরাসরি কথোপকথন : ৩১/৫/২০১৬ খ্রি.।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রিয়াসতে রামপুরের বাইয়াত ইজাযাত ও খিলাফাত গ্রহণ

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর পিতা আল্লামা মৌলভী আব্দুল কাদের জিলানী নক্সবন্দী (রহ.) স্বয়ং ভারতের উত্তর প্রদেশের রামপুরস্থ মাওলানা এনায়েতুল্লাহ খান নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ খলিফা ছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিশিষ্ট আলিম আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) উক্ত এনায়েতুল্লাহ খান নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) এর সুযোগ্য পুত্র আল্লামা মাওলানা মোহাম্মদ উল্যা খান নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) এর একজন ইজাযতপ্রাপ্ত খলিফা ছিলেন। মাদরাসার ৮ম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায়ই তিনি জনাব মোহাম্মদ উল্যা খান সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আল্লামা মোহাম্মদ উল্যা খান সাহেব নক্সবন্দী তাঁকে খিলাফাত ও ইজাযাত প্রদান করেন। সে সুবাদে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) তরীকত সাধনায় নিজেকে মগ্ন করেন এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকেন। ইলমে দ্বীনের চর্চার পাশাপাশি তিনি মুজাদ্দেদীয়া তরীকার একজন উচ্চস্তরের শাইখে পরিণত হন। কিন্তু কখনো তিনি প্রকাশ করা বা ধরা দিতেন না। এমন কি কোন ব্যক্তিকে কখনো বাইয়াতও করেননি, কিন্তু মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর নিজ বাড়ির দরজায় মাহফিল পরিচালনাসহ দেশব্যাপী ইসলামী মাহফিল ও নবীজীর শান-মান সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বদা তর্ক, বাহাস, মুনাযারা করে বেড়াতেন। এতে কখনো কোন ব্যক্তি বা বস্তুর তোয়াক্কা করতেন না। এমনকি কখনো আপোষ করতেন না। তিনি মূলত একজন আপোষহীন অকুতভয় তার্কিক ও মুনাযির ছিলেন।[৩]

তিনি সারাজীবন স্বীয় পীর কেবলা ও তাঁদের সিলসিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার নযর রেখেছিলেন, তাঁর পীর পরিবারের পীরজাদা ও শাহজাদাগণকে অত্যন্ত সম্মান, শ্রদ্ধা ও প্রীতি-স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর প্রতি ভালবাসায় প্রতি বছর পীর কেবলা জনাব মাওলানা মোহাম্মদ উল্যা খান সাহেব তাঁর বাড়ির দরজায় মোহাদেবপুর এনায়েতিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হতেন। কোন কোন বছর ২দিন বা ৩ দিন ব্যাপী ওয়ায মাহফিল চলতো। পীর কেবলা উক্ত মাহফিলে স্বয়ং উপস্থিত থেকে মাহফিল সমাপনান্তে দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করতেন এবং এলাকায় হিদায়াতের আলো ছড়িয়ে দিতেন। বিভিন্ন দূর-দূরান্তের এলাকা হতে এখানে জনগণ হাযির হতেন এবং কোন সময় অমুসলিমগণ হাযির হয়ে এ মাহফিলে ইসলাম গ্রহণ করতেন। এ মাহফিলের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন এলাকাবাসী। প্রত্যেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ মাহফিলের জন্য অনুদান প্রদান করতেন। এমনকি অনেকে বছরব্যাপী এ মাহফিলের ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে চাল ও

---

৩. সাক্ষাৎকার : বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ তোয়াহা, মরহুমের চাচাতো ভাই। সরাসরি কথোপকথন, ১৭/০৮/২০১৬ খ্রি.।

টাকা জমা রেখে দিতেন। মাহফিলের ব্যয় নির্বাহের জন্য আল্লামা নক্সবন্দীকে কখনো ন্যূনতম চিন্তা করতে হতো না। তিনি বরং নিজের চাকুরির আয় হতে সাধারণ মানুষের ন্যায় এর ব্যয় নির্বাহে শরিক থাকতেন মাত্র।[৪]

রিয়াসাতে রামপুরের খিলাফত গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর মাঝে এমন এক ধরনের আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তিনি ইসলাম, কুরআন, হাদীস ও নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষে যেখানেই যে অবস্থায় কোন ওয়ায নসিহত বা ভূমিকা রাখতেন কোত্থেকে যেন গায়েবী সাহায্যের মাধ্যমে শত সহস্র জনতা তাঁর সাথে একাত্ব হয়ে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতো। এ অকুতভয় খলিফা তাঁর পীরের নির্দেশনা ও আদর্শানুসারে দেশ-মাতৃকার বাইরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নবীজীর পক্ষে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। তাঁর আদর্শ ও ভাবধারায় গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীগণও তাঁকে অনুসরণ অনুকরণ করে দ্বীনের পথে হক্বের পথে, কুরআন ও সুন্নাহর পথে বিশ্ব মানবতাকে পরিচালনার সিপাহসালার রূপে গড়ে ওঠেন।

৪. মোহাম্মদ তোয়াহা, প্রাগুক্ত, তারিখ : ১৭/০৮/২০১৬খ্রি.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছারছীনা অধ্যয়নকালীন বায়আত গ্রহণ

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) এর শিক্ষা জীবনের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সোনাগাজী মাদরাসা হতে আলিম পাশ করার পর **১৯৫১** খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশের সুবিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাহ আলিয়া মাদরাসায় ফাযিলে ভর্তি হন। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অত্যন্ত মেধাবী ফজলুল করিম শিক্ষকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। কিছুদিন পর তিনি তৎকালীন দরবারের পীরে কামিল আল্লামা নিছার উদ্দীন ছারছিনাবী (রহ.) এর হাতে বাইয়াতে তাবাররুকী গ্রহণ করেন। গভীর রাত পর্যন্ত কিতাব অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি শ্রেণিকক্ষেও শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে তাকরার করে দূর্বল শিক্ষার্থীদের পাঠ হৃদয়ঙ্গমে সর্বদা সহযোগিতা করতেন। ছারছীনার তৎকালীন অত্যন্ত মেধাবী মুখগুলোর মধ্যে আল্লামা নক্সবন্দী ছিলেন অন্যতম। গভীর রাত পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ অধ্যয়ন করে করে তিনি নিজের গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হন।

তিনি ইলমে দ্বীন অর্জনের পাশাপাশি ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকগণ বিশেষত ইলমে বাতিন বা আধ্যাত্মিক ইলমের অধিকারী পীর-আউলিয়া ও উলামা-মাশাইখগণকে অতীব ভক্তি ও শ্রদ্ধার নযরে দেখতেন। বিশেষত তিনি তাঁদের প্রতি আদবের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন এবং বিনয়াবনত চিত্তে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ উপস্থাপন করতেন। তারই ধারাবহিকতায় ছারছীনা মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি সেখানে পীর কেবলার হাতে বাইয়াতে তাবারুক গ্রহণান্তে তারে সিলসিলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করতেন। তাদের অনুপস্থিতিতে কারো মুখে তাদের প্রতি ন্যূনতম কোন বিদ্যেষপূর্ণ বক্তব্য কারে নিকট শুনলে সাথে সাথে তিনি তা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করে তা হতে ফিরিয়ে তাদের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিমূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেন। এমনকি বিরোধী পক্ষকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি উপস্থাপন করে আল্লাহর ওলিগণের শান ও মান তিনি সর্বদা উর্ধে তুলে ধরতেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর ওস্তাদগণ ও বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। সকলেই তাকে জ্ঞান পিপাসু গভীর অধ্যয়নকারী ও সুবক্তা হিসেবে জানতো।[৫]

ছারছীনা দরবারে বিভিন্ন সময় মাহফিল, যিকির-আযকারসহ দ্বীনি অনুষ্ঠানাদিতে তিনি প্রায়ই হাযির থাকতেন এবং সে সকল জলসা ও মাহফিলসমূহ হতে তিনি ইলমে মারিফাতের যথেষ্ট জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ করেন। পীর-আউলিয়াগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্বীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে গড়ে তোলার সুযোগ পান। শুধু তাই নয় মহান আল্লাহর ওলীগণের প্রতি কোমল ও নম্র মনোভাব তথা শিষ্টাচার সম্পন্ন আচার-আচরণের দরুন তিনি ক্রমে সমাজের প্রায় সর্বশ্রেণির মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন

---

৫. সাক্ষাৎকার- মাওলানা আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত, সরাসরি কথা- ০২/০৬/২০১৬খ্রি.।

করেন। আল্লাহ তায়ালার মহান ওলীগণের সাহচর্য ও সুদৃষ্টির কারণে এবং তাদের রুহানী ফয়েয লাভের ফলে তাঁর মাঝে একটি বিশেষ দিব্যদৃষ্টির যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সর্বশ্রেণির মানুষ তাকে শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে দেখতেন। বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, ইসলামী জীবনদর্শনের পূর্ণ অনুসারী ও অনুগত হিসেবে সহস্র-লক্ষ মানুষ তাঁর ভক্ত ছিলেন। তিনি কখনো কোন ব্যক্তিকে মুরিদ করেননি। তবে নিরবে সর্বদা মুসলিম, বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণির মানুষের উপকার তথা মানবহীতকরণে তিনি সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর এ জাতীয় গণমুখী আচরণের জনেই তিনি সর্বদা ও সর্বত্র সমাদৃত ছিলেন। ছারছীনা অধ্যয়নকালীন তাঁর ছাত্র জীবনেও তিনি বিভিন্ন ছোটখাট মাহফিলে ওয়ায নসিহত করতেন। বিশেষত তাঁর পিতার সময়কাল হতে আরম্ভ হওয়া প্রতি বছরে অব্যাহত থাকা এনায়েতিয়া মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থেকে প্রতি বছরই দ্বীনি বয়ান উপস্থাপন করতেন। তাঁর অপ্রতিদ্বন্দী নবী-প্রেমসুলভ মর্মস্পর্শী বাণী শ্রবণে দেশের আনাচে কানাচে হতে লোক এসে এখানে হাযির হতেন এবং সকলে তাঁর হৃদয়স্পর্শী নসিহত শ্রবণে মনোমুগ্ধ পরিবেশে বিদায় নিতেন।

তার হৃদয়গ্রাহী মনোলোভা ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা বিশেষত নবী কারীম হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অত্যন্ত গভীর মুহাব্বাতপূর্ণ ও শ্রদ্ধাশীল চেতনামূলক কুরআন-হাদীসের আলোচনায় মানুষ বিমুগ্ধ হয়ে যেতেন এবং বার বার তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেন। কবি তাই বলেছেন:

عشق محبوب خدا جس دل مین حاصل نهی

لاکهو مومن هو مگر ایمان مین کامل نهی

অর্থাৎ- মহান আল্লাহর একান্ত প্রিয় বন্ধু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অন্তরের গভীর ভালবাসা যে অন্তরে অর্জিত হয়নি, সে রকম লাখো লাখো ব্যক্তি ঈমানদার দাবী করতে পারেন কিন্তু তারা পরিপূর্ণ ঈমানদার নয়।[৬]

সুতরাং আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.) তাঁর বংশীয় শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে পীর কিবলার প্রদত্ত আমল অনুসরণ করে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি গভীর প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টিতে সক্ষম হন। তাঁর আলোচনা, ওয়ায, নসিহত সহ মোনাযিরাসমূহ তারই প্রমাণ বহন করে। ফলে, তিনি মানুষের হৃদয়ে অতি সহজে জায়গা করে নিতে সক্ষম হন।[৭]

---

৬. আল্লামা ইকবাল, *বাঙ্গে দারা*, পংতি নং- ১৫

৭. মাও. আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত, তারিখ : ০২/০৬/২০১৬ খ্রি.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফুরফুরা শরীফের বায়আত ও দীক্ষা গ্রহণ

বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ পশ্চিম বঙ্গের ফুরফুরা দরবার শরীফের মোজাদ্দিদে যামান আল্লামা আবু বকর ছিদ্দিকী ফুরফুরাবী (রহ.) এর ইন্তিকালের পর তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত পীরে কামিল আল্লামা আব্দুল হাই ছিদ্দিকী (রহ.) ছারছীনার বার্ষিক মাহফিলে দাওয়াত প্রাপ্ত হয়ে প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশে আগমন করতেন। তাছাড়া তিনি বাংলার আনাচে-কানাচেও দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় সফর করতেন। এ সকল সফরে বিভিন্ন স্থানে ওয়ায-নসিহত, জলসা, আলোচনা মাহফিল ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করতেন এবং মানুষের হিদায়াতের কাজে লিপ্ত থাকতেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হলে পরবর্তী বছরই ছারছীনার বার্ষিক মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে ফুরফুরা দরবারের প্রধান খলিফা আল্লামা মাওলানা আব্দুল হাই ছিদ্দিকী (রহ.) আগমন করেন। তিনি ছারছীনার মাহফিলে বয়ান শেষে উপস্থিত জনতাকে বাইয়াতাবদ্ধ করেন। আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী তৎকালীন সময়ের উক্ত মাহফিলের একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জনাব আব্দুল হাই ছিদ্দিকী (রহ.) এর হাতে বাইয়াতে তাবাররুকী গ্রহণ করেন। উক্ত বাইয়াত লাভের পর তিনি ফুরফুরা দরবার শরীফের সাথে আরো অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে যান।

ফুরফুরা দরবার শরীফ হতে প্রকাশিত বিভিন্ন বই-পুস্তক তরীকতের বিভিন্ন ওলীগণের জীবনীসহ সুফীগণের প্রদত্ত সবকাদি, নিয়ম কানূন ইত্যাদি বিভিন্ন তরীকত জ্ঞানে তিনি আরো অধিক জ্ঞানার্জন করেন। তরীকতের পথে তাঁর জ্ঞানসীমা আরো অধিক সমৃদ্ধিলাভ করতে থাকেন এবং তিনি উক্ত জ্ঞানে আরো অগ্রসর হতে সক্ষম হন।[৮] এছাড়া আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) বাংলাদেশে কামিল (হাদীস) ডিগ্রি অর্জন শেষে ভারতের উত্তর প্রদেশে রামপুরা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। উক্ত অধ্যয়ন শেষে তিনি ইসলামী জ্ঞানে আরো উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণের নিমিত্তে পাকিস্তানের লাহোরস্থ দারুল উলুম হিযবুল আহনাফ মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। উক্ত মাদরাসায় অধ্যয়নকালে ফুরফুরা দরবারের তৎকালীন পীর কিবলার সাহিবজাদা মাওলানা সাইফুল ইসলাম ছিদ্দিকীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। পূর্ব হতে তিনি ফুরফুরার বাইয়াত গ্রহণ করায় সাইফুল ইসলাম ছিদ্দিকীর (রহ.) সাথে তিনি সেখানে আরো অধিক ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং তাঁর সাথে গভীর বন্ধুত্বের মাধ্যমে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, দ্বীনি-মাসআলা মাসায়েল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে জ্ঞান জগতের নতুন নতুন ফটক উম্মোচন করতে সক্ষম

৮. সাক্ষাৎকার : শাহজাদা জহিরুল করিম, মরহুমের দ্বিতীয় পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সরাসরি কথোপকথন : ২৩/১২/২০১৬ খ্রি.

হতেন। প্রতিপক্ষের বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম হতেন। ফলে বিরোধীপক্ষ তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির নিকট হার মানতে বাধ্য হতো।

তিনি শত সহস্র মাহফিল ও মুনাযিরা অনুষ্ঠানে হাযির হয়ে রাফেজী, খারেজী, কাদিয়ানি ও শীয়াহসহ যাবতীয় বাতিল মতবাদপন্থী আলিমদের যুক্তির বিরুদ্ধে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ক্ষুরধার যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর যুক্তির নিকট বাতিল সম্প্রদায় সর্বদা হেরে গিয়েছিল এবং তাঁর সাথে কোন প্রকার যুক্তিতে পেরে ওঠতে সক্ষম না হওয়ায় অনেকেই মাথানত করে তাওবা করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বিভিন্ন মাহফিল, মজলিশ, সম্মেলন ইত্যাদিতে তাঁর অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দৃঢ়তাপূর্ণ আলোচনায় বাতিলশক্তি অনেক সময়ই থরথর করে কেঁপে ওঠতো। কোন কোন সময় আবার দেখা যেত তিনি মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে আসছেন, এ তথ্য অবহিত হওয়ার পর বিরোধী পক্ষের আলেমগণসহ কখনো কখনো পুরো পক্ষের কেউ উক্ত মুনাযারায় হাযির না হয়ে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি মারফত খবর পাঠিয়ে দিত যে, তাদের পক্ষের কোন ব্যক্তি মোনাযারা মাহফিলে হাযির হতে সক্ষম হবে না। ফলে এক তরফাভাবে আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) ও তাঁর দল উক্ত মোনাযারায় বিজয়ী হয়েছেন মর্মে ঘোষণা করা হতো এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে মানুষ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতো।

তিনি ফুরফুরা শরীফের বাইয়াত গ্রহণ করে কোনভাবেই পশ্চাৎপদ হননি। তিনি স্বীয় পীর-ওস্তাদগণের সাথে উত্তমভাবে হাল ধরে এবং পীরগণের দামান ধরে ছিলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি ও মাহফিল সমূহে তাঁদের সাহচর্য ও সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে নিজের আত্মিক, নৈতিক ও সার্বিক উন্নতি সাধন করেছেন। দেশের আনাচে-কানাচে বিশেষত চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহ, যশোর, সাতক্ষিরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বগুড়া, রাজশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফুরফুরা দরবার শরীফের পীরগণ ও তাঁদের ভক্তবৃন্দের সাথে সমন্বয় করে ও পারস্পরিক পরামর্শ সাপেক্ষে তিনি দ্বীনি আলোচনা সমূহ উপস্থাপন এবং জনহিদায়াতের কাজে লিপ্ত থাকতেন।[৯]

বস্তুত, বিভিন্ন দরবারের ওলী আল্লাহগণের সার্বিক সহায়তা ও সহযোগিতা গ্রহণ করে তিনি নিজেকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পাশাপাশি তাদের পক্ষ শক্তি হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ের ওলীগণের রুহানী ফায়েয ও তাওয়াজ্জুহ গ্রহণের মাধ্যমে দ্বীন দুনিয়ার প্রভূত উন্নতি সাধনে সক্ষম হন।

৯. জহিরুল করিম ফারুক, প্রাগুক্ত, ২৩/১২/২০১৬ খ্রি.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলাম প্রচারে তাসাউফের চর্চা ও প্রয়োগ

তাসাউফ

পুরো দ্বীন ইসলামের উদ্দেশ্য হল পূর্ণ মুক্তি এবং আল্লাহ তা'আলার কৈট্য লাভে ধন্য হওয়া। প্রধানত এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সূফীবাদ বা তাসাউফের জন্ম। সূফী শব্দের মূল ধাতু কী এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

সূফী শব্দটি 'ছুফুন' শব্দ হতে আগত। ছুফ অর্থাৎ পশমের খদ্দর পরিধানকারী। যাঁরা সর্বদা দিলকে গায়রুল্লাহর খেয়াল হতে পবিত্র রাখেন, দিলের মধ্যে আল্লাহর খিয়াল ছাড়া অন্য খেয়াল আসতে দেন না, যাঁরা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে বাহ্যিক আড়ম্বর ও দুনিয়ার মহব্বত পরিত্যাগ করে শরীআতের পায়রবীর জন্য এবং ধর্ম ও লোক সমাজের উপকার ও খেদমতের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদেরকে সূফি বলে।[১০]

তাসাউফ (تصوف) আরবি, শব্দটি বাবে *তাফাউল* (تفعل) এর মাসদার। এখান হতেই 'ছফ্ফুন' বা কাতার এর উৎপত্তি। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহর বিধানাবলী পালনে প্রথম সারির অন্তর্গত।

শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবন তাইমিয়া (রহ.) স্বীয় ফতোয়ার এগারতম খন্ডে তাসাউফ সম্পর্কে লিখেন- "তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত সূফী শব্দের ব্যবহার ছিল না। তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্তী যুগে তাঁর ব্যবহার শুরু হয় এবং বহু ইমাম ও শায়খদের বক্তব্যেও এই শব্দ পাওয়া যায়। যেমন- ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), আবু সুলাইমান দারামী (রহ.), সুফিয়ান ছাওরী (রহ.), হাসান আল-বসরী (রহ.) প্রমুখের নিকট হতে সূফী শব্দ বর্ণিত হয়েছে।"[১১]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত *'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম'* নামক গ্রন্থে সূফীবাদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে-

মুসলিম দর্শনে 'তাসাউফ' সূফীবাদ নামে খ্যাত। সূফী শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তাবিদদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, সূফী শব্দটি 'আহলুস সুফফা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, সূফী শব্দটি সূফ বা পশম হতে উৎপন্ন। কেননা, পশমী বস্ত্র সরলতা ও আড়ম্বরহীনতার প্রতীক। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.) বিলাস-বাসনের পরিবর্তে সাদাসিধা

---

১০. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.), *তা'লিমুদ্দিন* (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬) খ.২, পৃ. ৯২

১১. *তা'লিমুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

পোষাক পরিধান করতেন। তাই এ পশমী পোশাক পরিধানকারীগণ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে 'সূফী' নামে পরিচিত।[১২]

আবার কেউ বলেছেন সূফী শব্দটি 'সাফা' থেকে এসেছে। আর 'সাফা' শব্দের অর্থ হলো পরিষ্কার বা পবিত্রতা অর্থাৎ যাঁরা মনের কুপ্রবৃত্তিকে দমন ও পরাভূত করে আত্মা পরিষ্কার ও পবিত্র করে সর্বক্ষণ মহান আল্লাহর প্রেমে বিমুগ্ধ তাঁরাই হলে সূফী।[১৩]

আল্লামা শামী (রহ.) বলেছেন, ইলমে তাসাউফ হল আধ্যত্মিক জ্ঞান, যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সৎগুণসমূহের প্রকার এবং তা অর্জনের গণনা এবং অসৎ স্বভাবসমূহের শ্রেণীবিভাগ এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবগত হওয়া যায়।

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) ইলমে তাসাউফের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন,

التصوف علم تعرف به احوال تزكية النفوس ونصفية الاخلاق وتعمير الظاهر والباطل لنيل السعادة الابدية

অর্থ : তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা যা কারো সার্বিক সৌভাগ্য লাভের জন্যে তার আত্মিক পরিচ্ছন্নতা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ গাঠনিক সৌন্দর্যতা নির্মিত করে।[১৪]

সুতরাং ইলমে তাসাউফ অর্থ আত্মা সম্বন্দীয় জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 'মুছাল্লামুস সুবুত' কিতাবে উল্লেখ আছে-

الوحدانيات هو التصوف الباحث عن الاحوال القلبية الى الهى

অর্থ : একত্ববাদ এমন এক তাসাউফ যা অন্তরের অবস্থাকে স্রষ্টার দিকে ধাবিত করে।[১৫]

প্রসিদ্ধ তাফসীরকার আউলিয়াকুল শিরোমণি হযরত মাওলনা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করেছেন-

واما العلم الذى يسمون اهلها بالصوفية الكرام

অর্থ : যে সমস্ত লোক ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে তাসাউফ লাভ করেছেন তারা সম্মানিত সূফী নামে পরিচিত হয়ে থাকেন।[১৬]

---

১২. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯) পৃ. ৬৮৬

১৩. ড. আ. ন. ম রইছ উদ্দিন, *সূফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়* (ঢাকা : তাজিন প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৩

১৪. *সূফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

আল কুরআন এর অন্যতম সূরা আত-তওবা এর ليتفقهوا فى الدين (যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে)[১৭] আয়াতের ব্যখ্যায় 'তাফসীরে রুহুল বায়ান' এর বলা হয়েছে-

النوع الثانى علم السر هو ما نتعلق بالقلب وساعيه فيقترض على المؤمن علم احوال القلب من التوكل والانابة والخشية والرضاء فانه واقع جميع الاحوال واجتناب الحرص والغضب والكبر والحسد والعجب والرياء وغير ذالك

অর্থ : দ্বিতীয় প্রকার (ইলমে তাসাউফ) হলো ঐ লুকায়িত জ্ঞান যা অন্তরের অন্তস্থল উহার দ্বারা সম্পন্ন প্রচেষ্টা বা সাধনার নাম, যা মুমিনের অন্তরের অবস্থাসমূহ যেমন নির্ভরশীলতা, গাম্ভির্যতা, ভীতি ও সন্তুষ্টি ইত্যাদি এবং নিশ্চয়ই বাস্তবে সমস্ত অবস্থা ও লোভ, রাগ, অহংকার, হিংসা, আশ্চার্যান্বিততা, প্রদর্শনেচ্ছা, ইত্যাদি হতে বিরত করে।[১৮]

সুতরাং সাতাউফ বা আত্মশুদ্ধি বলতে আমরা তাই বুঝব যে বিদ্যা বা সাধনার মাধ্যমে মানুষ তাঁর কুপ্রবৃত্তিগুলো দমন করে চারিত্রিক উত্তমগুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে নিজেকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে তাই তাসাউফ।

এ চারিত্রিক শুদ্ধতা, চেষ্টা সাধনা সবই শুধু আল্লাহকে চেনার উদ্দেশ্যে আবর্তিত। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) লিখিত 'মারেফতের ভেদতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন, "আল্লাহকে চিনতে হলে এবং তাঁর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বা মারেফাত অর্জন করতে হলে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একনিষ্ঠ সাধনা করতে হয়।[১৯] এ বিশেষ প্রক্রিয়ার একনিষ্ঠ সাধনার নামাই হল 'ইলমে তাসাউফ'।

তাসাউফের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

'তাসাউফ' হলো মহান আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জ্ঞানের স্পর্শমর্ণি, যা শায়েখের সুহবতে থেকে আল-কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর আলোকে আধ্যত্মিক সাধনার মাধ্রমৈ অর্জন করা সম্ভব, নিজে নিজে কিতাব পাঠে সম্ভব নয়।[২০] সূফীবাদ সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "ঐশী পরিব্যপ্তির গভীর অনুভূতি, যে অনুভূতি কুরআনের শিক্ষাসমূহ ও হযরত

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৭. আল-কুরআন, ০৯ : ১২২

১৮. ইসমাইল হাক্কী আল-বুরুসী, *তাফসীর-ই-রুহুল বায়ান* (বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবি, ১৩২২ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭০

১৯. মৌঃ মোঃ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী, *মারেফাতের ভেদতত্ত্ব* (ঢাকা : সিদ্দিকীয়া প্রেস, ১৯৮৯), পৃ. ৩০

২০. ড. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বায়'আত* (মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৬

মুহাম্মদ (স.) এর নির্দেশাবলী থেকে উৎপন্ন ও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, এই প্রত্যয়ের সাঙ্গে সম্মিলিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে যে অনুধ্যানমূলক বা ভাববাদী দর্শনের জন্ম দিয়েছে তা-ই সূফীবাদ নাম ধারণ করেছে।[২১] তাসাউফ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন-

আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের (তাযকিয়ায়ে নফস ও তাহযীবে আখলাক) প্রশস্ত ও শক্তিশালী নীতি, যা পরবর্তীকালে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা ও বিষয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা চিহ্নিতকরণ, চারিত্রিক ব্যধির প্রতিষেধক, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, গোপন সম্পর্ক অর্জন করার উপায় সমূহ পথের ব্যাখ্যা ও বিন্যস্ত করা যার প্রকৃত ভিত্তি এবং তাযকিয়াহ, ইহসানের নমুনাও ধর্মীয় ব্যবহার প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল।[২২]

আল্লামা শামী (রা.) বলেন ইলমে তাসাউফ হলো, 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান' এ জ্ঞানের সাহয্যে মানুষের সৎগুণসমূহের প্রকারভেদ এবং তা অর্জনের পন্থা ও অসৎ স্বভাবেসমূহের শ্রেণিবিভাগ এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবগত হওয়ার নাম।[২৩] শায়খুল ইসলাম যাকারয়িা আল-আনসারী (রহ.) ইলম তাসাউফের সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "যে ইলমের দ্বারা অনন্ত সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া এবং মানুষের যাহির ও বাতিন গঠন করা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়, তাকে ইলমে তাসাউফ বলে।[২৪]

'সূফী' ও তাসাউফ শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লেষণ

আধ্যাত্মিক মুসলিম দর্শনের তাসাউফ (تصوف) সূফীবাদ নামে খ্যাত। 'সূফী' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষকদের মাঝে মতভেদ লক্ষ করা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, 'সূফী' শব্দটি 'আহলুস সুফফা' থেকে উৎপত্তি। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, "'সূফী' শব্দটি 'সূফ' (পশম, উল) শব্দ হতে উৎপন্ন।"[২৫] কারো কারো মতে, 'সূফ' (কাতার, পংক্তি, সারি অর্থজ্ঞাপক), শব্দটি 'তাসাউফ' এর উৎস। কেননা সূফীগণ

---

২১. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম*, অনু. ড. রশীদুল আলম (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৬

২২. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদভী, *তাযকিয়া ওয়া ইহ্সান*, অনু. মুহাম্মাদ আবুল বাশার আখন্দ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৬

২৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ আযহারুল ইসলাম, *হযরত শাহ মাখদুম রূপোশ (রহ.), -এর বিস্ময়কর জীবন ও কর্ম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ. ১৯

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. গাওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জীলানী সাহেব (রহ.), অনু. মাওলানা আবদুল জলিল (রহ.), *সিররুল আসরার* (ঢাকা : হক লাইব্রেরী, ১৯৮৬), পৃ. ৫২; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৩৯৩; সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২), পৃ. ৬৮৬

বিশেষত আমলের দিক দিয়ে প্রথম কাতারের লোক। মোল্লা জামী 'সাফা' (পরিচ্ছন্নতা, অকৃত্রিমতা) শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি বলেছেন। কারণ সূফীগণ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী।[২৬]

পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক পণ্ডিত 'সূফী' শব্দটিকে গ্রীক শব্দ সোফিস্ট (Sophist) বা জ্ঞানী থেকে উৎপন্ন বলেছেন।[২৭] তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, 'সূফী' শব্দটি পূর্বে উল্লেখিত 'সূফ' (পশম, উল) শব্দ হতে নিস্পন্ন। কেননা, পশমী বস্ত্র সরলতা ও আড়ম্বরহীনতার প্রতীক। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বিলাস, ব্যাসনের পরিবর্তে সাদাসিধা পোশাক পরিধান করতেন। তাই এ পশমী পোশাক পরিধানকারীগণ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে 'সূফী' নামে পরিচিত।[২৮] অনেক হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশমী বস্ত্র পরিধান করেছেন।[২৯] হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশমী পোশাক পরা অবস্থায় ইনতিকাল করেন।[৩০] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুসা (আ.) এর সাথে কথোপকথন করছিলেন তখন মুসা (আ.) আপদমস্তক পশমী বস্ত্র পরিহিত ছিলেন।[৩১]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে হযরত মুসা (আ.) এর সাথে কথোপকথন প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ.

অর্থ: মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময় ও স্থানে এসে হাজির হল, তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন। তখন মূসা বললেন: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি দেখা দিন, যেন আপনাকে আমি দেখতে পারি।' আল্লাহ বললেন: (দুনিয়াতে) কখনই আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না। আপনি বরং পাহাড়টিকে দেখুন। এরপর পাহাড়টি

---

২৬. সংকলক, *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ৮১; আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *ইসলামী তাসাউফের স্বরূপ* (ঢাকা : সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ২০০২), পৃ. ৯

২৭. খালীক আহমদ নিজামী, *তারীখে মাশায়েখ চিস্ত*, (দিল্লী : দারুল উলুম প্রকাশনী, ১৯৬৩), পৃ. ১৮

২৮. *সিররুল আসরার*, প্রাগুক্ত

২৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী* (দেওবন্দ : কুতুবখানা রহীমিয়্যাহ, ১৩৯৩ হি.), *কিতাবুল লিবাস*, *১ম খণ্ড*

৩০. ইমাম তিরমিযী, *জামি'উ* তিরমিযী (দিল্লী : কুতুবখানায়ে রাশীদিয়া, আবওয়াবুল লিবাস, তা.বি.)

৩১. *সুনান ইবন মাজা* (দেওবন্দ : আশরাফী বুক ডিপো, তা.বি.) বাবুল লিবাস, খ.১

যদি তাঁর নিজস্থানে স্থির থাকে, তাহলেই আপনি আমাকে দেখতে পাবেন।' এরপর যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে তাঁর জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এরপর যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, বললেন: হে আমার মহাপবিত্র প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট তওবা করছি এবং অবশ্যই আমি প্রথম মুমিন।' (আপনার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি)। আল্লাহ বললেন: হে মূসা! আপনাকে আমি রাসূলের পদ ও মর্যাদা দিয়ে এবং আমার কথা বলার মাধ্যমে মানুষের উপর আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। অতএব আপনাকে যা দিয়েছি তা গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন।'[৩২]

'ইলম তাসাউফ (تصوف) সংক্রান্ত উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ড. সিদ্দিকী সাহেব বলেন, প্রথমেই কোটি কোটিবার প্রশংসা ও পবিত্রতাসহ আল্লাহর যিক্‌র করছি, কারণ এ আয়াতে মহান আল্লাহ বান্দাকে 'ইলম মারিফাত শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর নির্ধারিত স্থানে মূসা (আ.) উপস্থিত হল এবং আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বললেন। অর্থাৎ আল্লাহর বান্দার সাথে কথা বলেন এবং হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর মহাপবিত্র কণ্ঠ শুনে ধন্য হয়েছিলেন। তারপর মূসা (আ.) আরয করলেন 'আল্লাহ আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখবো"।[৩৩] এখানে বুঝতে হবে কাগজে যেভাবে লেখা হয় আর মুখের ভাষা অনেক পার্থক্য হয় অর্থাৎ তখন মূসা (আ.) আল্লাহর কণ্ঠ শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে, আল্লাহর 'ইশকের প্রভাবে তাঁর ক্বলব কম্পিত হয়ে, চোখের পানি ঝরিয়ে আরয করেছিলেন, "আল্লাহ আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখবো"। তখন আল্লাহ বললেন, "তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পারবে না, কিন্তু তুমি এই পর্বতের দিকে তাকাও, যাদি এটি স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পারবে। এখানে তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পারবে না এর অর্থ- তুমি আমাকে দেখে ঠিক থাকতে পারবে না, হতে পারে তুমি জ্বলে যেতে পার, কারণ আল্লাহর মহাশক্তির নিকট বান্দাতো খুবই ক্ষুদ্র অতি সামন্য। তারপর আল্লাহ বললেন, "তুমি এই পর্বতের দিকে তাকাও, যদি সেটি স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। তারপর আল্লাহ যখন পর্বতের উপর জ্যোতিষ্মান হইলেন, তখন পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললো, এখানে تجلى শব্দের অর্থ : আত্মপ্রকাশ, দ্বীপ্তি, আবির্ভাব ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। তাই এর অর্থ আল্লাহ পর্বতের উপর আত্মপ্রকাশ করলেন হতে পারে, আবির্ভাব হলেন হতে পারে, জ্যোতিষ্মান হলেন হতে পারে। তাঁর পর আল্লাহর মহাশক্তিতে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এখন এখানে বুঝার বিষয় হল, কিছু কিছু সাধনাহীন ডিগ্রীওয়ালা 'আলিম (আলিমে সু) সমাজে আছে যাঁরা বলেন আল্লাহকে চর্ম চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তারা

---

৩২. আল-কুরআন, ০৭ : ১৪৩-১৪৪

৩৩. ড. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বিশ্ব তা'লিমে যিকর* (মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১০৯

এটি বুঝে না যে, দেখা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহকে দেখতে হলে যে প্রচন্ড শক্তির প্রয়োজন তা মানুষের নেই, পাহাড়ই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল, মানুষতো নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে আল্লাহ দয়া করলে দেখা দিতে পারেন যেহেতু হযরত মুসা (আ.) কে দেখা দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহকে দেখা যায় না এটি যারা বলেন খুব সহজেই বুঝা যায় তাদের ঈমান দূর্বল, আমল ভাল না, জ্ঞান সীমিত, মুরাক্বাবা করেন না, গবেষণা করেন না, পরিপূর্ণ সুন্নত মানেন না। আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে, "আর মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, অতঃপর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন আরয করল, নিশ্চয়আপনার সত্ত্বা পবিত্র, আমি আপনার হুযুরে ক্ষমা চাইতেছি এবং আমি আগে হতেই বিশ্বাসী"। মূসা (আ.) অজ্ঞান হয়েছিলেন। তারপর জ্ঞান ফিরার সাথে সাথেই মহান আল্লাহর যিক্‌র করে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। উক্ত আয়াতের একটি অংশ চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার মুশাহাদার ২য় সবকে বিশেষ নিয়মে তা'লিম দেয়া হয়।[৩৪]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সূফী সাধক মাওলানা সিদ্দিকী সাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহ মূসাকে (আ.) বললেন, তুমি কখনই আমাকে দেখবে না কিন্তু যদি একান্তই না ছাড় তবে পাহাড়ের দিকে নজর করে দেখ অর্থাৎ আমাকে দেখ।[৩৫]

বড়পীর সাহেব (রহ.) কর্তৃক তাসাউফ শব্দটি বিশ্লেষণ

বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) (মৃ.৫৬১হি./ ১১৬৬খ্রি.), 'তাসাউফ' শব্দটি বিশ্লেষন করে বলেন, তাসাউফ ولاية، صفا، توبة এবং فنا فى الله এই চারটি শব্দের প্রথম বর্ণ ت ص و ف নিয়ে تصوف শব্দটির উৎপত্তি।[৩৬] এই শব্দ চারটির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

১. توبة (তাওবাহ) : তাওবাহ বা পাপ করে অনুশোচনা করতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা দুই প্রকার- যাহিরী ও বাতিনী। এ শব্দ হতে ت বর্ণ নেওয়া হয়েছে।

২. صفا (সাফা) : সাফা অর্থ পবিত্রতা। সাফা শব্দ থেকে ص বর্ণ নেওয়া হয়েছে। পবিত্রতাও দুই প্রকার- যাহিরী ও বাতিনী।

৩. ولاية (বেলায়াত) : শব্দের প্রথম বর্ণ و নেওয়া হয়েছে। বেলায়াতের পবিত্রতায় সর্বদা সুসজ্জিত থাকা।

৪. فنا فى الله শব্দের প্রথম বর্ণ থেকে ف শব্দের শেষ বর্ণ নেওয়া হয়েছে। 'ফানা ফিল্লাহ' শব্দের অর্থ স্বীয় সত্ত্বাকে আল্লাহতে বিলীন করে দেওয়া বুঝায়।

---

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৩৫. *মারেফতের ভেদতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩৬. *বায়'আত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

উপরের গবেষণায় আমরা তাসাউফ শব্দটির উৎপত্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূফী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত সাধকগণ যে সকল গুণে গুণান্বিত থাকেন সে সম্পর্কেও আমরা অবহিত হতে পেরেছি।

তাসাউফ সত্য হওয়ার দলিল

তাসাউফ শব্দটি আল-কুরআনে বা হাদীস শরীফে বা সাহাবীদের জমানাতেও এ শব্দের বা এ পরিভাষার প্রচলন হয় নাই। অবশ্য তাবেয়ীদের যুগে এবং তাবে তাবেয়ীনদের যুগে এ শব্দ এবং এ পরিভাষায় প্রচলন আরম্ভ হয়। কিন্তু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের (রা.) যুগে এ পরিভাষায় প্রচলন না থাকলেও এর কর্মধারা ঠিকই প্রচলিত ছিল। বরং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দায়িত্বই হলো তাযকিয়া নাফস তথা সামগ্রীকভাবে মানবজাতির আত্মাকে পবিত্র করার দায়িত্ব। তা হল মানব চরিত্র হতে কুপ্রবৃত্তি দূর করে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান করা। বলাবাহুল্য, একজন মানুষ উত্তম চরিত্রের হওয়াই হল তাঁর জীবনের চরম সফলতা।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

অর্থ : 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যেই প্রেরিত হয়েছি।"[৩৭]

বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন

اكمل المؤمنين إيمانا احسنهم خلقا

অর্থ : 'মুমিনদের মাঝে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার তাঁরাই যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।'[৩৮]

অনুরূপ 'ইলমে ফিকহ্ এর বিস্তারিত সব শাখা-প্রশাখা আল-কুরআনে নেই ঠিক কিন্তু এ শাস্ত্রের মূল উৎস আল-কুআনুল কারীম। আল-কুরআনে তাসাউফ শাস্ত্র বলতে এ শব্দের পরিবর্তে 'আল-ইহসান', 'তায্কিয়া' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা ফরমান-

---

৩৭. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমদ*, কিতাবু বাকীয়ে মুসনাদে মুকসিরীন, হাসীস নং-৮৫৯৫

৩৮. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশআস আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, (মিশর : মাওকাউ ওযারাতুল আওকাফ আল-মিসরিয়্যা, ১৩২৪হি.), হাদীস নং-৪০৬২

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ

অর্থ : তিনি ঐ সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি তাদেরকে তাঁর বাণী পড়ে শোনাতে পারেন, তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করতে পারেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শেখাতে পারেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় লিপ্তছিল।"[৩৯]

এ আয়াতে يزكيهم শব্দ দ্বারা যে তাযকিয়া নাফস উদ্দেশ্য তা নিয়ে সকল ইমাম, মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ ঐক্যমত পোষণ করেন।

মহান আল্লাহ আরও বলেন-

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

অর্থ : আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল নিযুক্ত করে পাঠিয়েছি। তিনি তোমাদেরকে আমার কিতাব পড়ে শুনাবে, (তোমাদের মধ্যে যত প্রকার খারাপী আছে, যেমন অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যা, নির্বুদ্ধিতা, আত্মকলহ, হিংসা-বিদ্বেষ, নফস ও শয়তানের দাসত্ব, সুসংস্কার ইত্যাদি হতে) তোমাদেরকে পবিত্র করবেন, তোমাদেরকে আমার কিতাবের গুরুত্ব এবং সৎবুদ্ধি ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিবেন। আর তোমরা যা না জান তা শিক্ষা দিবেন।[৪০]

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করে বলেন-

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

অর্থ : ওহে! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলীগণের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই, যাঁরা ঈমান আনে এবং আল্লাহকে ভয় করে। তাঁদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ। আল্লাহ তাঁর এ বাণি পরিবর্তন করেন না আর তাহলো মহা সফলতা।"[৪১]

---

৩৯. আল-কুরআন, ৬২ : ০২

৪০. আল-কুরআন, ০২ : ১৫১

৪১. আল-কুরআন, ১০ : ৬২

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিলায়েত হাছিল হয় দুটি জিনিষের দ্বারা: প্রথমত ঈমান এবং দ্বিতীয়ত তাকওয়া। অতএব, যত বেশী বা কম ঈমান এবং তাকওয়া হবে, ততই বড় বা ছোট বেলায়েত হবে।[৪২]

মানুষের স্বভাব চরিত্র বাহ্যিক বিষয় নয়। অন্তরের শুদ্ধতাই স্বভাব শুদ্ধতার নামান্তর। মানব মাত্রেই দিলের মধ্যে ভাল মন্দ এ দুপ্রকার স্বাভাবের বীজ থাকে। ভাল গুণাবলী অর্জন করাকে আরবিতে 'তাহলিয়া' বলা হয়। মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করাকে বলা হয় 'তাখলিয়া'। দিলের এখলাছ অর্জন করা যেএকান্ত জরুরী, হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত এবং চিত্তাকর্ষক ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে-

ألا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هى القلب

অর্থ : "জেনে রেখ! শরীরের শধ্যে একটুকরা গোশত আছে, যদি তা পরিশুদ্ধ হয়, তবে গোটা শরীরই পরিশদ্ধ হয়। যদি তা খারাপ হয়, তবে সমস্ত শরীরই খারাপ হয়। মনে রেখ তা হল কালব বা দিল।"[৪৩]

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

অর্থ : "অতঃপর আমি তা সুলাইমানকে বুঝিয়ে দিলাম"।[৪৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমাদের পূর্ববতী- উম্মতগণর মধ্যে যেরূপ ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে উমর ফারুক সেরূপ।[৪৫]

হাদীস শরীফে রাসূল (স.) ইরশাদ করেন,

ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك

অর্থ : 'তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। আর তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আর এটাই হল ইহসান।'[৪৬]

---

৪২. *তালিমুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-৩০

৪৩. *সহীহ বুখারী*, ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং-৫০

৪৪ .আল-কুরআন, ২১:৭৯

৪৫. উদ্ধৃত- *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃ ৬৬৮-৮৯

৪৬. *সহীহ বুখারী*, হাদীসে জিব্রাইল, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৪৮

আল কুরআনে বলা হয়েছে,

يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ○ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ○

অর্থ : 'এমন একটি হিসাবের দিন সামনে আসছে যেদিন কারও ধনবল ও জনবল কোন কাজে আসবে না। অবশ্য সেদিন কাজে আসবে একমাত্র রোগ মুক্ত দিল ও পবিত্র আত্মা।'[৪৭] এখান হতে ইসলাহে নাফস এর প্রয়োজীয়তা প্রমাণিত হয়।

মহান আল্লাহর বাণী- 'জীবন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁরাই যারা আত্মশুদ্ধি করেছেন, আল্লাহর নামের যিকির করেছেন অতঃপর নামায আদায় করেছেন।' তাসাউফের সারবস্তু ৮টি মৌলিক বিষয়। এই ৮টি বিষয় সবই আল্লাহ আল-কুরআন সূরা আল-মুযযাম্মিলের শুরুতে উল্লেখ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ○قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ○نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ○أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ○إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ○إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ○إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ○وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ○رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ○وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ○ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا○

অর্থ: হে বস্ত্রাবৃত! রাতে জাগ, কিছু অংশ ছাড়া, অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা বেশি। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে; আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী। অবশ্য দলনে রাতের উত্থান প্রবলতর এবং বাকস্ফুরণে সঠিক। দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের না স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে। লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদেরকে পরিহার কলে চল। ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং বিলাস সমগ্রীর অধিকারী সত্য অস্বীকার কারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদের অবকাশ দাও।[৪৮]

কত চমৎকার ভাবেই ন সালিক তথা মুরিদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এ সুরায় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে! এরপরও কি কেউ এ ধারণা করতে পারে তাসাউফ এর ভিত্তি আল-কুরআন ও হাদীসে নাই!

---

৪৭. আল-কুরআন, ২৬:৮৮-৮৯

৪৮. আল-কুরআন, ৭৩:১-১১

কখন? কবে? কোথা? হতে তাসাউফ তথা সূফী শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে এসব প্রশ্নের সুন্দর উত্তর প্রদান করেছেন হাজীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। তিনি বলেন-

> বাকী রহিয়াছে ছুফি শব্দের তাহক্বীক, এই শব্দ কোথা হইতে, কবে হইতে ব্যবহারে আসিয়াছে? কেননা, খায়রুল কুরুনের মধ্যে তো এ শব্দ ছিলই না। কাণ, ছাহাবী, তাবেয়ী, তাবে' তাবেয়ীন শব্দই আহলে হক্ব হওয়ার যথেষ্ট কিন্তু পরে যখন বেদআতীদের সংখ্যা বাড়িয়া গেল, তাহাঁরাও নিজকে আবেদ, যাহেদ বলিতে লাগিল। তখন যাঁহার আমল হক্ব ছিলেন, তাহাঁরা বেদ'আতীদের ধোকা হইতে লোকদের বাচাইবার জন্য 'ছুফি' লক্বর এখতিয়ার করিলেন। এমনকি দ্বিতীয় শতাব্দীর ভিতর এই শব্দ সর্বজন পরিচিত হইয়া গেল।[৪৯]

তাসাউফ শাস্ত্রের উষালগ্নে যেসব মহান পুরুষ নিজেদের জীবন বাজী রেখে সাধারণ মানুষের আখলাক চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হলো।[৫০]

- হযরত ইমাম জাফর ছাদিক (রহ.) জন্ম ৮৩ হিজরী, মৃত্যু ১৪৮ হিজরী।
- তাবেয়ী হযরত ওয়াইস ক্বরণী (রহ.) ওফাত ৩৭ হিজরী। ইয়েমেনের ক্বরন গোত্রে এ মহান সাধক পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।
- তাবেয়ী হযরত হাসান আল বসরী (রহ.)। জন্ম ২১ হিজরী, মুত্যু ১১৯ হিজরী।
- তাবেয়ী ইমাম আ'যাম আবূ হানিফা (রহ.)। জন্ম ৮০ হিজরী, মুত্যু ১৫০ হিজরী।
- হযরত রাবিয়া বসরী (রা) জন্ম ৯৩ হিজরী মতান্তর ৯৫ হিজরী, মৃত্যু ১৮৫ হিজরী।
- তাবেয়ী হযরত ওরওয়া ইবন যুবাইর (রহ.)। ওফাত ৯৪ হিজরী।
- তাবেয়ী হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীজ (রহ.)। মৃত্যু ১০১ হিজরী। তিনি ন্যায়পরায়ণতার জন্য ইসলামের পঞ্চম খলিফা হিসেবে অধিক পরিচিত।
- তাবেয়ী হযরত মুহাম্মদ ইবন কা'ব ইবন সালিম (রহ.)। মৃত্যু - ১১৮ হিজরী।
- তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)। মৃত্যু ১৮১ হিজরী।
- হযরত ইমাম মালিক(রহ.)। তিনি মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। মৃত্যু ১৭৯ হিজরী।

---

৪৯. *তা'লিমুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৫০. *বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২৫

- হযরত ইমাম শাফেরী (রহ.)। তিনি শাফেরী মাযহারের প্রতিষ্ঠাত ইমাম। মৃত্যু ২০৪ হিজরী।
- ইমাম হযরত আহম্মদ ইবন হাম্বল (রহ.)। তিনি হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। মৃত্যু ২৪১ হিজরী।
- হযরত আবদুল ওয়াহিদ (রহ.)। মৃত্যু ২৮ সফর ১২৬ হিজরী। যিনি হযরত হাসান আল বসরী (রহ.) এর খলিফা।
- হযরত ফুযাইল ইবন আয়ায (রহ.)। ওফাত ১৮৭ হিজরী।
- হযরত মালিক ইবন দীনার (রহ.)।
- হযরত মুহাম্মদ ওয়াসে (রহ.)।
- হযরত শাহ্ ইবরাহীম ইবন আদহাম বলখী (রহ.)। ওফাত ২৮ জমাদিউল আউয়াল ২৬২ হিজরী।
- প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ী হযরত যুননুন মিসরী (রহ.)। জন্ম ১৮০, মৃত্যু ২৪৫ হিজরী।
- হযরত বায়েযীদ বুস্তামী (রহ.)। জন্ম ১৮৮ হিজরী, মৃত্যু ২৬০ হিজরী।
- হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)। জন্ম ২১৫ হি., মৃত্যু ২৯৭ হি. ।
- হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামীদ আল গাযযালী (রহ.)। জন্ম ৪৫০ হিজরী। মৃত্যু ৫০৫ হিজরী।
- বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)। জন্ম ১ রহমযান ৪৭০ হিজরী। মৃত্যু ৮ রবিউল আউয়াল ৫৬১ হিজরী।
- হযরত খাজা মঈনদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.)। জন্ম ৯ জমাদিউস সানি ৫৩৬ হিজরী মৃত্যু ৬ রজব ৬২৭ হিজরী।
- হযরত খাজা কুতুবুদ্দি বখতিয়ার কাকী (রহ.)। জন্ম ৫৬৯ হিজলী, মৃত্যু ৬৩৩ হিজরী।
- হযরত আলী আহম্মদ আলাউদ্দিন ছাবির কালীয়ারী (রহ.)। জন্ম ১৯ রবিউল আউয়াল ৫৯২ হিজরী, মৃত্যু ১৩ রবিউল আউয়াল ৬৯০ হিজরী।

তাসাউফের স্বরূপ ও পরিধি

তাসাউফ শুধু জাহিরী কিতাবী ইলমের ও তা'লিমের নাম নয়। বরং ইলম ও তা'লিমের সাথে সাথে সোহবতি ইলম, তরবিয়ত ও আমলের নাম। সারকথা হল তাসাউফ চারটি আমলের সমষ্টির নাম।

১। পূর্ন শরী'আতকে বাস্তব জীবনে রূপায়ণ করতে হবে। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সারা জীবনে যেভাবে আল-কুরআন পরিপূর্ণ অনুররণ করেছেন তা ঠিক সেভাবে আদায় করা বা অনুসরণের চেষ্টায় থাকা।

২। মানুষের নফসের মধ্যে যেসব ময়লা অর্থাৎ কুস্বভাব, কুপ্রবৃত্তি হতে যুক্ত হয়ে নফসের ইসলাহ করা। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ○

অর্থ : 'নিশ্চয়ই যারা রূহ পরিশুদ্ধ করেছে তারা সফলকাম হয়েছে এবং যারা রূহকে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।[৫১]

৩। এক একটি করে আখলাকে নববী নিজের চরিত্রে এবং ব্যক্তি জীবনে ব্যবহারিক হিসেবে কার্যকর করা।

৪। দৃষ্টি পবিত্র, সূক্ষ্ম গভীর করে পূর্ণ শরী'আতকে তাঁর গভীরতম দেশ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে হবে। দাওয়ামে যিকর হাসিল করতে হবে এবং চিরস্থায়ী আনুগত্যের মধ্যে- জীবনের শেষ পর্যন্ত মশগুল রাখতে হবে।

আল্লাহর বাণী-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

অর্থ : 'যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে শুয়ে অর্থাৎ সব অবস্থায় আল্লাহর যিকরে রত থাকে এবং যারা আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে তারা বলে হে আমাদের রব! আপনি কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেননি। সুতারাং আপনি আমাদেরেকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন।[৫২]

---

৫১. আল-কুরআন, ৯১ : ৯-১০

৫২. আল-কুরআন, ০৩ : ১৯১

এ পর্যায়ে তাসাউফ পন্থীয় বিশেষ পরিক্রমা তথা কি কি বিষয় অনুসরণ করলে সালিক বা মুরিদ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে তা বর্ণনার প্রয়াশ পাব ইনশাল্লাহ। যাতে বিস্তারিত ভাবে তাসাউফের স্বরূপ ও পরিধি ফুটে ওঠবে।

ক) হক্কানী কামিল-মুকাম্মিল পীরের হাতে বায়ত হওয়া : তাসাউফ শাস্ত্রে সুলুকের জন্য এটাই প্রথম কর্তব্য। পবিত্র কুরআন শরীফে আছে- وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ 'তোমরা (আমাকে চিনার জন্য) একটি অছিলা তালাশ কর।[৫৩] অছিলার অর্থ অনেক রকম অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। অছিলা অর্থ উপায়, উপকরণ, নৈকট্যের উপায়, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের একটি বিশেষ পন্থা যা কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (স.) কে দেয়া হবে। অছিলা অর্থ মধ্যস্থ নিমিত্ত[৫৪] সম্বন্ধ করণ ও উপায় নির্ভর[৫৫] সম্বন্ধ করণ[৫৬] নৈকট্য লাভের উপায়।[৫৭]

আল্লাহ অন্যত্র ফরমান, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ তোমরা সকলেই একজন সাদিক লোকের সঙ্গী হয়ে থাক।[৫৮]

খ) নিয়তঃ নিয়ত এর অর্থ এখানে হবে কোন কাজ শুরুর পূর্বে তাঁর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক করা। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ কাজের বিশুদ্ধতা ও ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[৫৯]

গ) ইখলাসঃ মহান আল্লাহ বলেন الا لله الدين الخالص 'যেনে রেখ! অবিমিশ্রিত অনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।[৬০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ○

---

৫৩. আল-কুরআন, ০৫ : ৩৫

৫৪. মুহাম্মদ মুস্তফা শরীফ ও ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম, *লুগাতুল কুরআন*, (নরওয়ে : কুরআন এডুকেশন সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২৪৫

৫৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আল-কাওছার* (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, ১৯৯৭), পৃ. ৭০১

৫৬. সিরাজ রব্বানী, *ফরহঙ্গ-ই-রাব্বানী* (কলকাতা : রব্বানী পাবলিকেশন, ১৯৫২), পৃ. ৬৫০

৫৭. মাওলানা আহমাদ করিম ছিদ্দিকী, অনু. মাও. আব্দুল হাফিয, *মিসবাহুত লুগাত* (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৯৪৬

৫৮. আল-কুরআন, ০৯: ১১৯

৫৯. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, বাবু কাইফা কানা বাদাউল ওহী ইলা রাসুলিল্লাহি (স.), হাদীস, নং-০১

৬০. আল-কুরআন, ৩৯: ৩

অর্থ : 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিও হয়ে একটিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বীন।[৬১]

ঘ) আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনের প্রতি মহব্বত : আল্লাহর বাণী-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

অর্থ : 'আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আর অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন, তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।[৬২]

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে যত দু'আ করতেন তাঁর মধ্যে অন্যতম হল 'হে আল্লাহ! আপনাকে ভালবাসার তাওফীক আমাকে দিন এবং দান করুন ঐ সমস্ত লোকদের ভালবাসা যারা আপনাকে ভালবাসেন আর দান করুন আমাকে এমন আমলের মহব্বত যে আমল আমাকে আপনার নিকটবর্তী করে দেয়, আর আমার নফস, মাল, পরিবার-পরিজন ও সুশিতল পানি অপেক্ষা আপনার মহব্বতকে আমার জন্য অধিক প্রিয় করে দিন।[৬৩]

রাসূল (স.) এর বাণী-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ আমি তাঁর নিকট তাঁর নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।[৬৪]

ঙ) তাওবা ও ইস্তিগফার : তাওবা অর্থ অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। মহান আল্লাহ মু'মিনের তওবা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ : 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৬৫] রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, التائب من الذنب

---

৬১. আল-কুরআন, ৯৮ : ০৫

৬২. আল-কুরআন, ৩:৩১

৬৩. *জামে' তিরমিযী*, উদ্ধৃত : শেখ ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতিব আত-তিবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (দেওবন্দ : মাকতাবাতু আশরাফিয়া, ২০০০খ্রি.) খ.১. পৃ. ২১৯-২২০

৬৪. *সহীহ্ বুখারী*, প্রাগুক্ত, ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং-১৪

كمن لاذنب له 'যে ব্যাক্তি পাপ থেকে তাওবা করে, সে এমন হয়ে যায়, যেন তাঁর কোন পাপই নেই।[৬৬]

চ) তাকওয়া : তাকওয়া আরবি শব্দ এর অর্থ বিরত থাকা, পরহেয করা। শরী'আতের পরিক্রমায় তাকওয়া হল একমাত্র আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ হতে নিজেরকে বিরত রাখা। সাহাবী হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, কবীরা গুণাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

মুত্তাকী ব্যক্তি সততা আমানতদারী, ধৈর্য্য, আদল ও ইনসাফ ইত্যাদি ধরণের গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে। মুত্তাকীর পরিচয় প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ○ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ○

অর্থ : "যারা গায়েবের প্রতি ইমান রাখে, নামায কায়েম করে, তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। আর আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তাঁর উপর ঈমান রাখে, আর তারা আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"[৬৭]

ছ) তাওয়াক্কুল : তাওয়াক্কুল আল্লাহর উপর ভরসা করা। যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত হলে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে তাওয়াক্কুল যে সব গুণের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহর বাণী-

- وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ 'আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুমিন হও।[৬৮]
- إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারী লোকদের ভালবাসেন।[৬৯]
- وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহই তাঁর জন্য যথেষ্ট।[৭০]

---

৬৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১
৬৬. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, আয যুহুদ অধ্যায়, হাদীস নং-৪২৪০
৬৭. আল-কুরআন, ২ : ৩-৪
৬৮. আল-কুরআন, ৫ : ২৩
৬৯. আল-কুরআন, ০৩ : ১৫৯

জ) যিকর : যিকর এর আভিধানিক অর্থ স্বরণ করা। শরী'আতের পরিভাষায় মনেপ্রাণে মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করাকে যিকর বলে। যিকর বলতে বিভিন্ন ইবাদত যেমন নামায,কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি বুঝালেও তাসাউফের রাস্তায় যিকর এক বিশেষ সাধণার নাম। বিভিন্ন তরীকার নির্দিষ্ট ওযীফা ও নিয়ম কানুন রয়েছে। পাক-ভারত-উপমহাদেশের ১২৬ টি তরিকার মধ্যে ৪টি তরীকার শায়খগণ যিকর এর প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন।

যিকরের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ○ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ○

অর্থ : 'হে ঈমানদারণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।[৭১]

আল্লাহর বাণী- أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 'জেনে রাখ! শুধুমাত্র আল্লাহর স্বরণেই আত্মাসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।[৭২] রসূল পাক (স.) বলেন- 'যে ব্যাক্তি আল্লাহর যিকর করে এবং যে আল্লাহর যিকর করে না তাদের দৃষ্টান্ত হল জীবিত ও মৃতের ন্যায়।[৭৩] শয়তান মানুষকে ধোকায় ফেলে গুণাহের কাজে কিন্তু হয়। ফলে অন্তরে কালিমার সৃষ্টি হয়। আর এ কালিমা উপায় হল আল্লাহর যিকর। রাসূল পাক (স.) বলেন- 'প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কার করার উপকরণ আছে আর অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার উপকরণ হল, আল্লাহর যিকর।[৭৪]

ঝ) শোকর ও কৃতজ্ঞতা : অরনুগ্রহ লাভের কারণে হৃদয় মুখ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে শোকর বলে। আল্লাহর বাণী-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

অর্থ : 'যদি তোমরা আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর তবে আমি তা আরও বাড়িয়ে দিব। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তবে জেনে রেখ নিশ্চয়' আমার আযাব খুবই কঠোর।[৭৫]

---

৭০. আল-কুরআন, ৬৫ : ৩

৭১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪১-৪২

৭২. আল-কুরআন, ১৩ : ২৮

৭৩. মিশকাত শরীফ, প্রাগুক্ত, খ. ২.পৃ.১৯৬

৭৪. ইমাম আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান লিল-বায়হাকী*, ইদামাতি যিকরিল্লাহি 'আযযা ও জাল্লা অধ্যায়, হাদীস নং-৫৫১

৭৫. আল-কুরআন, ১৪ : ৭

ঞ) ন্যায়পরায়নতা : আদল হল কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক যাবতীয় কাজে ও কথায় কম ও বেশী না করে মধ্য পন্থা অবলম্বন করা । আদল করার প্রতি মহান আল্লাহর চিরন্তন নির্দেশ- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদারচরণের নির্দেশ দেন।[৭৬] জাতি, ধর্ম-বর্ণ শ্রেণী- উঁচু- নিচু সবার জন্য বিচারকার্যে আদল প্রতিষ্ঠা করা বিচারকের দায়িত্ব। আল্লাহর বাণী-

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

অর্থ: 'তোমরা যখন মানুষর বিচার করবে, তখন তোমরা ন্যায়পরায়নতার সাতে বিচার করবে।[৭৭]

ট) ক্ষমা ও উদারতা : দয়া-মায়া, ক্ষমা, উদারতা মহান আল্লাহর অন্যতম গুণ। শরী'আতের পরিভাষায়, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেত প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল। মহান আলাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রতাপশালী। আল্লাহর বাণী।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থ: ' আপনি ক্ষমা করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদিগকে এড়িয়ে চলুন।[৭৮]

ঠ) বিনয় ও সরলতা : ইসলামে বিনয় ও সরলতা হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ন বিষয়। বিনয়ের অর্থ হল আল্লাহর অন্য বান্দাদের তুলনার নিজেকে ছোট এবং অন্যকে বড় মনে করা। বিনয়ী বান্দা আবশ্যক। আল্লাহর বাণী-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

অর্থ: 'রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।[৭৯]

ড) অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা : আখলাকে হাসানার মধ্যে অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা হল অন্যতম। এ গুণ ছাড়া ছালিক তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। দলিল প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (স.)

---

৭৬. আল-কুরআন, ১৬:৯০

৭৭. আল-কুরআন, ০৪ : ৫৮

৭৮. আল-কুরআন, ০৭ : ১৯৯

৭৯. আল- কুরআন, ২৫ : ৬৩

বলেন, ايِاكم والظن فان بعض الظن اكذب الحديث 'তোমরা কুধারণা পোষণ ধারা থেকে বিরত থাকবে কেননা কু ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা।'[৮০]

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) ইসলাম প্রচারে ব্রতী থাকতেন সদা-সর্বদা। ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও নামাজ-রোজা, খাওয়া-দাওয়া ব্যতিত তিনি সর্বদাই ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত থাকতেন। জীবনের একটি মুহূর্তকেও তিনি বিনষ্ট হতে দেননি। ইসলামী বই লেখা, রিসালাহ লিখা, ওয়ায-নসিহত, শিক্ষকতা, ঝাড়-ফুক ইত্যাদি যে কোন একটি মানবতার কল্যাণমুখী কাজে স্বীয় জীবনাতিবাহিত করতেন।

ইলমে তাসাউফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ইসলামী অনুশাসন সমূহ মেনে চলে এবং ছোট ছোট আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেকে অটল অবিচল রাখা। তথা ইলমে তাসাউফ অনুসরণে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুখ-দুঃখ সকল কিছু মহান আল্লাহর জন্য বরণ করে নেয়ারই নাম। তারই বাস্তব নমুনা ছিলেন আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)।

তিনি শিক্ষকতার মহান পেশায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষকতাকালীন সময়ে তিনি শিক্ষার্থীদেরকে দ্বীনের পথে এবং কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে জীবন গঠনের দিকে উৎসাহিত করতেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন মনে হয় যেন তিনি একজন ব্যঘ্র হিসেবে ঐ শিক্ষার্থীকে গড়ে তুলছেন। নিজে যেমন চলার পথে অত্যন্ত দৃঢ় অকুতভয় এবং নির্ভীক ছিলেন, তেমনি তাঁর সকল শিক্ষার্থীকে তিনি ঠিক সেভাবোই গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লাভকারী প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যঘ্রের ন্যয় গড়ে ওঠেছিলেন। তাঁরা যেমন ছিলেন জ্ঞানার্জনাগ্রহী শিক্ষার্থী তেমনি ছিলেন শিক্ষকভক্ত ও অকুতভয় সৈনিক। তাদের শিক্ষকের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। আল্লামা নক্সবন্দীর নিকট হতে শিক্ষা লাভ করে তাঁর শিক্ষার্থীগণ সকলেই দ্বীন, ইসলাম, হক, সত্য পথে অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারে সর্বদা সুদৃঢ় ছিলেন। তাদের সুদৃঢ় পন্থা অবলম্বনের ফলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এর সুফল লাভে সক্ষম হয়। আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) একজন মহান শিক্ষক হিসেবে তাঁর শিক্ষার্থীদেরকে চলন, বলন, কথন, লিখন সবকিছুর মাধ্যমে মহান আল্লাহ ও প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রেমিকরূপে গড়ে তুলেছিলেন। যে নবী প্রেমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেকেই নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দীদার স্বপ্নযোগে লাভ করেছিলেন। তাঁর হাতে গড়া দ্বীনের অটল-অবিচল শিক্ষার্থীগণ ইলমে তাসাউফের প্রতি নতশির হয়ে নিরবে আমলে সালেহ তথা সৎকর্মসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীগণ তাদের শিক্ষার পাশাপাশি মহান আল্লাহর ওলীগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এরই সূত্র ধরে তারা শিখেছেন মহান আল্লাহর ওলীগণসহ সকলের সাথে

---

৮০. *আস-সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, নিকাহ্ অধ্যায়, হাদীস, নং-৪৭৪৭

শিষ্টাচার, নম্রতা ও সুন্দর আচরণের এক অনন্য রীতি। তাদের এ অনুপম আদর্শ ধারণ করে পরবর্তী প্রজন্ম ও বিশেষ দীক্ষা লাভ করেছেন তাদের থেকে।

দ্বিতীয়ত : তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে মাঠে ময়দানে তথা সারা দেশব্যাপী ওয়ায নসিহত করে বেড়াতেন। উক্ত ওয়ায-নসিহত, মাহফিল-মজলিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি ইলমে তাসাউফ, সুফী জীবন ব্যবস্থা এবং এ জীবনের অনুসারী ওলী আল্লাহগণের জীবনী নিয়েই বেশী বেশী আলোচনা করতেন। সুফীজমের অনুসরণে মানুষের হৃদয়গ্রাহী, মনোমুগ্ধকর আলোচনা শ্রবণে দূর-দূরান্ত, প্রান্তর, প্রত্যন্তর হতে লক্ষ লক্ষ জনতা ভীড় জমাতো। ইলমে তাসাউফের অনুসরণে তিনি শত সহস্র মুনাযারা তথা বিরোধী গোষ্ঠীর সাথে বিতর্কিত মাসআলা মাসায়েল সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে বিজয় লাভ করেছেন। ইসলামে তাসাউফের একাগ্র চর্চা তিনি তাঁর আলোচনা, বক্তৃতা, বিবৃতি ইত্যাদি সকল কিছুতে ব্যাপক আকারে তুলে ধরতেন। ফলে, তাঁর সম্মুখে কোন স্বাভাবিক নিয়মে কারো পক্ষে অবস্থান নেয়া কখনো সম্ভব ছিল না। তাঁর বীরচিত ও সাহসিকতাপূর্ণ আলোচনা শুনে মানুষ অত্যন্ত আপ্লুত হতেন এবং নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। ফলে, তাঁর ওয়ায-নসিহত শ্রবণের প্রতি ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হতে থাকে। দ্বীন-দরদী সাধারণ মানুষের মনের আকুতি তাঁর প্রতি প্রতিনিয়ত অধিকহারে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। মুসল্লী সমাজে হৃদয় মাঝে অতিব দ্রুতগতিতে তিনি স্থান করে নিতে সক্ষম হন। তাঁর আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন লক্ষ লক্ষ জনতাকে।

তৃতীয়ত : তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নেতৃত্বে ইসলাম ও কুরআন সুন্নাহর পথে ডাকতেন, সেখানেও তিনি যে তাঁর জীবনে ইলমে তাসাউফের ব্যাপক অনুসরণ করেছিলেন তাঁর প্রমাণ মেলে। কেননা, তাঁর গ্রন্থাবলীতে মহান আল্লাহর ওলীগণের জীবনী সুফিতত্ত্বের অনুসরণে তাদের গড়ে ওঠাসহ সার্বিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। ফলে তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ রচনায় সুফিবাদের পূর্ণ অনুসরণ করা হয়েছে। তাঁর এরূপ সূফীতত্ত্বের প্রতি গভীর আগ্রহ ও তা বাস্তবে রূপদানের প্রেক্ষিতে গ্রন্থাবলী আরো আরো বেশী মনোমুগ্ধকর হয়েছে। যা পাঠে সাহিত্যিক ও পাঠামোদীগণ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উৎসাহিত হয়েছে। মানুষের উৎসাহের দরুন তিনি গ্রন্থাবলী রচনা করে আরো বেশি অমর হয়ে থাকলেন সকলের মাঝে। তাঁর ইলমে তাসাউফ অনুসরণীয় এরূপ আলোচনা তাঁকে দিয়েছে পাঠক সমাজের স্বতন্ত্র একটি গ্রহণযোগ্যতা ও বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যও বটে।

চতুর্থত : শিক্ষার্থীদেরকে নিবিড় সাহচর্যের মাধ্যমে তিনি ধন্য করতেন। তাঁর সাহচর্যে অনেকেই ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র পরিবর্তনের বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। তিনি কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসা, ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর ক্বাদেরীয়া তৈয়্যবীয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদরাসা এবং লাকসাম গাজীমুড়া আলিয়া মাদরাসায় অবস্থানকালীন মাদরাসাসমূহের ছাত্র হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন

করেছিলেন। এবং এ দায়িত্বকালীন হোস্টেলে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদেরকে তিনি এমন নৈতিকতাপূর্ণ ও জ্ঞানার্জনমূখী সাহচর্য দিয়েছেন যে, তারা সকলে পরবর্তীকালে দেশের অত্যন্ত মান্যগণ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন এবং বড় বড় পদসমূহে আসীন হয়ে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দেশের বিভিন্ন পদ-পদবীকে অলংকৃত করে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে একটি নৈতিকতা সম্পন্ন দেশের মর্যাদায় আসীন করতে দৃঢ় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তাদের সহায়তায় দেশ ও জাতি পায় এক-একজন আদর্শবান, নৈতিক, স্বচ্চরিত্রবান নাগরিক ও সেবক। যা অন্য সকল ব্যক্তির ব্যাপারে পরিলক্ষিত নয়। ফলে আল্লামা নক্সবন্দীর মর্যাদা সমাজে আরো বহুগুণে বেড়ে যায়।

পঞ্চমত : তাঁর বিশেষ নযর বা নযরে নেগাহদানী ও দোয়া করণের মাধ্যমে অনেকের জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তিনি যাদেরকে স্বীয় হৃদয় মন হতে দোয়া করেছেন তারা পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত উন্নত জীবন-ধারণে ও উন্নত জীবন যাপনে সক্ষম হয়েছেন এবং তিনি তাঁর হৃদয় মন দিয়ে তাঁর পরিবারের জন্য ও দোয়া করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রেখে যান নাই। তাকে প্রশ্ন করা হল যে, আপনার সন্তান সন্ততি কিভাবে জীবন যাপন করবে? তিনি উত্তরে বললেন, আমার সন্তানদের জন্য আমি দোয়া করে গিয়েছি, তারা কেউ না খেয়ে থাকবে না, সকলে কর্মগুণে জীবন-যাপন করবে। সুতরাং তাদের আর্থিক বা অন্য কোন ধরনের রিয্কের সমস্যা হবে না। ঠিকই তাঁর ইনতিকালের পর থে কে আজ অবধি কোন সন্তানই বিশেষ কোন বিপদে পতিত নয় এবং তারা কোন প্রকার সমস্যারও সম্মুখীন নন। তারা সকলে সুন্দরভাবে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সুন্নীয়তের পথেই নিজেদের জীবন-যাপন করছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের সহায় রয়েছেন।[৮১]

৮১. সাক্ষাৎকার- কাজী মাওলানা রাকিব উদ্দীন, কুমিল্লা মাহনগর। সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০৬/০৬/২০১৬ খ্রি.

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর কর্মজীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ : মুহাদ্দিস পদে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উপাধ্যক্ষ পদে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অধ্যক্ষ পদে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শায়খুল হাদীস পদে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আল্লমা নক্সবন্দীর ইনতিকাল, কাফন ও দাফন

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)-এর কর্মজীবন

পাকিস্তানের লাহোর শহরস্থ হিযবুল আহনাফ মাদরাসা হতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে স্বদেশে ফিরে আশার পর আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) তাঁর আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নের ইতি টানেন। আরম্ভ করেন কর্মজীবন। কর্ম জীবনের এ মহতী ক্ষণে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সেবা প্রদান করেন। তাঁর সেবায় শত সহস্র তরুণ শিক্ষার্থী জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইলমে ছরফ, ইলমে নাহু, ইলমে হাদীস, আরবী সাহিত্য, ফিকহ্, তারীখ ইত্যাদিসহ বিভিন্ন জ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করেন। এবং নিজেদেরকে যোগ্যতা সম্পন্ন আলীমে দ্বীন রূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীগণ জ্ঞানগর্ভ জীবন গঠনে ব্রতী হন। তাঁর সাহচর্য লাভে শিক্ষার্থীগণ ধন্য হন। শিক্ষা অর্জনে তাঁকে একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব হিসেবে মেনে নিয়ে এ মহান শিক্ষাগুরুর নিকট শিক্ষার্থীগণ আত্মগঠন, নৈতিক জ্ঞানার্জন, আধ্যাত্মিক ও পারিপার্শ্বিক জ্ঞানার্জনে ধন্য হন। জীবনের বিভিন্ন ধাপে আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত মুহাদ্দিস, উপাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ, শাইখুল হাদীস ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে নিজের ক্যারিয়ার গঠনের পাশাপাশি জাতির জ্ঞানান্বেষণের বিশেষ হীত সাধনে সক্ষম হন। জ্ঞান সাধনার অকুল পাথার পথ পেরিয়ে শিক্ষকতার মহান পেশায় ব্রতী হওয়ার পাশাপাশি জাতির গঠনমূলক কাজেও তিনি আত্ম নিয়োগ করেন। তাঁর জ্ঞান বিতরণের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যে কোন পাঠ তিনি শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ দানের পর সকল শিক্ষার্থী অত্যন্ত সফল ও সক্রিয়ভাবে পাঠ হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হতেন। বহু শিক্ষার্থী তাঁর নিকট পাঠ শ্রবণান্তে শ্রেণি কক্ষেই তাদের পাঠ্য বিষয় সহজে বুঝে ফেলতো এবং বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরই শ্রেণি কক্ষের বাইরে গিয়ে আর পাঠ পুন পঠন বা মুখস্তকরণের প্রয়োজন হতো না। এতই তীক্ষ্ণ ও তীব্র মেধা ও ধী শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন যে, পাঠদান কালীন শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয়ে পাঠে মনোযোগী হলেই প্রায় পাঠ মনে বসে যেত। শিক্ষার্থীকে উক্ত পাঠ আয়ত্বকরণে পুনঃসময় ব্যয় করতে হতো না। অনেক সময় এ রকমও পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে কোন শিক্ষার্থীর দিকে তাকিয়েছেন সে শিক্ষার্থী সারা জীবনের জন্য পরিপূর্ণ মেধার অধিকারী হয়ে গিয়েছেন। ঐ শিক্ষার্থীর জীবনে আর কোন দিন জ্ঞানার্জনে পিছুটান ছিল না। শুধু তাই নয়, তিনি যাদেরকে মৃদু প্রহার করেছেন তারা সকলেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসিন হয়ে বিশ্ব দরবারকে অলংকৃত করেছেন।[১]

---

১. মাওলানা আতাউল করিম মুজাহিদ, মরহুমের হাতে গড়া প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যক্ষ, ফরাজিকান্দী ওয়াইসিয়া ডি. এস. আলিয়া মাদরাসা, উত্তর মতলব, চাঁদপুর, সরাসরি কথোপথন : ০৩/০৬/২০১৬ খ্রি.

পবিত্র কালামে হাকীমে মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেন:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

অর্থ: তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যয়ী ব্যক্তিগণ এবং যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদাও বিদ্যমান। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।[২]

অপর এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

অর্থ : তিনি ঐ মহান স্বত্ত্বা যিনি নিরক্ষরগণের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর বাণীসমূহ তাদেরকে (নিরক্ষর) পাঠ করে শোনাবেন তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন আর তাদেরকে মহাগ্রন্থ ও কৌশল শেখাবেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল।[৩]

বিশ্বমানবতার দূত, কেবল মানবতার কল্যাণ সাধনে প্রেরিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

اطلب العلم من المهد الى اللحد

অর্থ : তোমরা দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর।[৪]

অপর বাণীতে তিনি বলেন:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থ : "প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।"[৫]

অপর এক হাদীসে তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন,-

---

২. আল-কুরআন, ৫৮ : ১১

৩. আল-কুরআন, ৬২ : ০২

৪. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং- ২৩

৫. আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইব্ন মাজা আল্-কাযবীনী, *আস্সুনান লি ইবন মাজা*, (দেওবন্দ : আল্-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি:), মুকাদ্দামাহ (المقدّمة), বাব নং- ১৭ দ্র.

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

অর্থ: তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যিনি কুরআন নিজে শিক্ষা করেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন।[৬]

বাস্তবপক্ষে আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একজন একনিষ্ঠ ও ঘনিষ্ট আশেক হিসাবে সর্বদা নিজে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণে ব্রতী থাকতেন। গভীর রাত পর্যন্ত ইসলামী গ্রন্থাবলী অধ্যয়নসহ, গবেষণা, ধ্যান, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি ছিল তাঁর নিয়মিত এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। তাঁর শিক্ষকতার মহান কর্মজীবনকে আমরা বিশ্লেষণ ও গবেষণা করলে ৪টি ধাপ বা স্তর খুঁজে পাই। তাঁর সমগ্র শিক্ষকতা জীবন এ চার পর্যায়ের বহির্ভূত হিসাবে অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়নি।

নিম্নে এ মহান সাধক, ওলী ও শিক্ষকের শিক্ষকতার বিভিন্ন স্তর সবিস্তারে ও সুনির্দিষ্ট পন্থায় উপস্থাপন করা হল:

৬. *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৫৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহাদ্দিস পদে

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) কর্ম জীবনে একজন প্রথিত যশা মুহাদ্দিস হিসাবে বিভিন্ন কামিল মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘ ৮ বছর মুহাদ্দিস ও প্রধান মুহাদ্দিস রূপে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে উপমহাদেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা হতে কামিল (হাদীস) বিভাগে প্রথম শ্রেণী অর্জন করে কুরআন-হাদীসে আরো অধিক বুৎপত্তি অর্জন ও গবেষণার লক্ষ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ রামপুর আলিয়া মাদরাসায় প্রথমত, অতঃপর পাকিস্তানের লাহোরস্থ দারুল উলুম হিজবুল আহনাফ মাদরাসা হতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভে সক্ষম হন।

ভারত ও পাকিস্তান হতে উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ শেষে তিনি দেশে ফিরে এসে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের বহুল প্রসিদ্ধ দক্ষিণ পূর্ব বাংলার দ্বীপ জেলা ভোলা আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস হিসাবে যোগদান করেন। অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, কঠোর সাধনা, অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার সাথে দুই বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অত্র মাদরাসায় সানী মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ভোলা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা কালীন সময়েই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নৈতিকতা, শিক্ষানুরাগ, শিক্ষার্থীদেরকে সাহচর্য প্রদান, অত্যন্ত আন্তরিকতা পূর্ণ পাঠদান, শিক্ষার্থী তদারকিতে বিশেষ অবদান, গণমানুষের ফিকহী মাসয়ালা মাসায়েলগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, বিভিন্ন অসুস্থ শিক্ষার্থী ও মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ, তাঁর একনিষ্ঠ চেষ্টার ফলে মাদরাসায় অবস্থানরত শিক্ষার্থীগণ নিয়মিত পাঠ প্রস্তুতিতে অগ্রণী অবস্থানে আসীন হন। প্রতিষ্ঠানের ভাল ফলাফল, বোর্ড ও জাতীয় পর্যায়ে বিশেষভাবে ভাল ফলাফল অর্জনে ভোলা আলিয়া মাদরাসা সক্ষম হয়।

শিক্ষার্থী গঠনে বিশেষ অবদানের মাঝে বিশেষত নিবিড় তত্ত্বাবধান ও গভীর সাহচর্য প্রদানই ছিল তাঁর অন্যতম প্রচেষ্টা। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে বার বার ফার্সী কবি রূমীর জ্ঞানাহরণ সংক্রান্ত সে কবিতার পংক্তিদ্বয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপদেশ প্রদান করে শিক্ষাবান্ধব ও জ্ঞানার্জনে ব্রতী করে তুলতেন:

علم را هر گزنیابی تانہ داری شش خصال

حرص و کوتا فهم کامل جمع خاطر کل حال

خدمت استاذ باید همچنیں سبق خاں مدم

لفظ را تحقیق خانی تاشدی مرد کمال

অর্থ : ছয়টি স্বভাব অনুসরণ ব্যতিত জ্ঞান কখনো অর্জিত হবে না। গভীর আগ্রহ, পরিপূর্ণ অবগতি এবং সর্বদা লেগে থাকা, শিক্ষকের সেবা, সম্মুখের পাঠের প্রাথমিক ধারণা নেয়া শাব্দিক বিশ্লেষণসহ পাঠাধ্যয়ন করলেই কেবলমাত্র শিক্ষার্থীগণ পূর্ণত্ব লাভে সক্ষম হবেন।[৭]

পারস্যের বিশিষ্ট কবি জালালুদ্দীন রূমীর উক্ত পংক্তি তিনি শিক্ষার্থীদেরকে আলোচনা করে করে তাদের জানার্জন, জ্ঞান সাধনা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে স্রষ্টার মা'রিফাত লাভে ধন্য করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেন। এরূপ জ্ঞানপূর্ণ ও গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ সাহচর্যের ফলে শিক্ষার্থীগণ নিজেদের জ্ঞানগর্ভ অবস্থান সুদৃঢ় ভাবে আকড়ে ধরে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন।

আর ঐ জ্ঞানার্জনের সিপাহ সালার রূপে কাজ করেন মহান শিক্ষাগুরু আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)। তাঁরই একক তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীগণ ইলম, আমল, ঈমান, আক্বীদায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মীরূপে গড়ে ওঠেন।[৮]

ভোলায় তাঁর শিক্ষকতার যশখ্যাতি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ায় তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। ফলে মাদরাসার কর্তৃপক্ষসহ একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে লেগে যায়। তিনি এরূপ অবস্থা দেখে ভোলা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা ছেড়ে বাড়ি চলে আসেন। বাড়ি চলে আসার কিছুদিনের মধ্যেই পটুয়াখালী পাংগাশিয়া আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করার জন্য প্রস্তাব আসে। তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ১৯৫৯ সালে পাংগাশিয়া আলিয়া মাদরাসা কর্তৃপক্ষের আহবানে সাড়া দিয়ে উক্ত মাদরাসার দ্বিতীয় মুহাদ্দিস রূপে যোগদান করেন।

এখানেও শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী সকলেই তাঁর প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হন। সকলের সাথে এক গভীর বন্ধুত্ব সৃষ্টির পাশাপাশি আল্লামা নক্সবন্দী স্বীয় জ্ঞান সাধনা, শিক্ষার্থী গঠন ও মানব সেবার মহান ব্রত অনুসরণ করেন। তাঁকে কোনরূপ তুচ্ছজ্ঞান করার কোন সুযোগ কেউ পান নাই। তিনি স্বীয় উদ্যোগেই সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের খোঁজ-খবর রাখতেন। বিশেষতঃ মাদরাসার ছাত্রাবাসে অবস্থানরত আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিশেষ খোঁজ খবর ও পাঠোন্নয়নে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন।[৯]

এ মহান শিক্ষাগুরু ১৯৫৯ সাল হতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মোট দু'বছর কেবল পাংগাশিয়া আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস রূপে শিক্ষা প্রদানে ব্রতী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাদান কলাকৌশল, আলোচনা, শ্রেণিকার্যক্রম ইত্যাদি অত্র অঞ্চলের অধিবাসীগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। কিন্তু কালের নির্মম পরিহাস এখানেও তিনি সুন্দর সাবলিলভাবে অবস্থান সংহত করতে ব্যর্থ হন। কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রে নিকট পরাস্ত হয়ে তাঁকে এ এলাকা ত্যাগ করতে হয়।

---

৭. জালালুদ্দীন রূমী, *বোসতাহ* (ঢাকা : এমদাদিয়া কুতুবখানা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬), ভূমিকা দ্র.

৮. *আসলাফ-ই-জামেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৯. আব্দুল কাদের জিলানী, প্রাগুক্ত, তারিখ : ২৯/০৫/২০১৬ খ্রি.

তবুও এ অকুতোভয় সৈনিক কভুও দমে যাননি। তাঁর অধ্যবসায়, জ্ঞান-সাধনার-গতিবেগ উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়ে তাঁকে আরো শানিত করে তোলে। তিনি স্বীয় ধ্যন-ধারণায়, ঈমান-আক্বীদায় হয়ে ওঠতে থাকেন আরো মযবুত এবং সুদৃঢ়।

তাঁর সুচিন্তিতি, দৃঢ়চেতা মনোভাব তাঁকে জনসমাজে করে তোলে আরো অধিক সমাদৃত। চাঁদপুর জেলার ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদরাসা হতে তাঁর প্রতি ডাক আসে। কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তিনি ফরিদগঞ্জ থানার একমাত্র ও সুপ্রসিদ্ধ মজিদিয়া আলিয়া মাদরাসার অন্যতম দ্বিতীয় মুহাদ্দিস রূপে যোগদান করেন, তাঁর গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার (তৎকালীন নোয়াখালী) অবস্থিত ছিল বিধায় তিনি ফরিদগঞ্জ মজিদীয়া আলিয়া মাদরাসায় আরো অনেক বেশী সম্মানিত হন। সকলেই তাঁকে স্বাদরে গ্রহণ করে নেন। ফরিদগঞ্জ থানা তৎকালীন নেয়াখালী জেলার রায়পুর থানার নিকটবর্তী হওয়ায় তাঁর সম্মান ও সেখানে আরো অনেক ঘনিষ্ঠ জনের মতই থাকে।

এ মহান ওলী এখানেও অত্যন্ত সুখ্যাতি ও সুনামের সাথে **১৯৬১** ও **১৯৬২** দু'বছর মুহাদ্দিস রূপে শিক্ষকতা করেন। তাঁর সুন্নী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক শিক্ষার্থী গভীর অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ আলিমে পরিণত হন। তিনি অতি স্নেহে শিক্ষার্থীদেরকে স্বীয় সাহচর্য দিয়ে গড়ে তুলতেন। বিশেষতঃ অধ্যয়নমূখী, অধ্যবসায়ী, জ্ঞানান্বেষণে তৎপর সচ্চরিত্র শিক্ষার্থীগণকে তিনি খুবই স্নেহসহ তাদের প্রতি বিশেষ সহায়তার হস্ত সম্প্রসারিত করতেন।

তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অন্যতম প্রসিদ্ধ মাদরাসায় পরিণত হয়। তাঁর সেবা ও আন্তরিক সাহায্যে যথেষ্ট জ্ঞান সাধনাকারী শিক্ষার্থী উক্ত মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ভাল ফলাফলের মাধ্যমে মাদরাসার সুনাম-সুখ্যাতি উর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদরাসায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের তরীকা অনুযায়ী সবকিছু পরিচালনার যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর এ প্রক্রিয়ার পরতে পরতে ছিলেন আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)।

ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদরাসায় থাকা অবস্থায়ই তাঁর পিতৃ জেলা নোয়াখালী হতে ডাক আসে। নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা, সোনাপুর হতে তাঁর প্রতি আহবান আসে সেখানে মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করার জন্য। সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তিনি উক্ত ডাকে সাড়া দিয়ে অবশেষ **১৯৬৩** সালের শুরুর দিকে নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন।[১০]

---

১০. *আসলাফ-ই-জামেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৯৬৩ সালের প্রারম্ভ লগ্নে তিনি নোয়াখালী জেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব বরেণ্য পীরে কামিল মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। যোগদানান্তেই তিনি পূর্ববর্তী স্বভাব অনুসারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি আদর্শের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক সেবায় নিমগ্ন হন। তাঁর সুকণ্ঠী পাঠদানে এখানের শিক্ষার্থীগণ অত্যন্ত বিমোহিত হতে থাকেন। তাঁর পাঠ শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ তাঁকে নিজেদের নয়নমণি হিসেবে গ্রহণ করেন।[১১]

তাঁর চারিত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীগণ তাঁকে নিজেদের স্ব স্ব এলাকার বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলে আলোচনার জন্যে নিয়ে যেতেন। দ্বীনি আদর্শ প্রচারের স্বার্থে তিনিও আনাচে-কানাচে সফর করে বেড়াতেন এবং মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে হিদায়াতের বাণী শোনাতেন। তাঁর ওয়ায-নসিহত ও আলোচনাগুলো ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ও দৃঢ়চেতামূলক খুবই জযবাসম্পন্ন। ফলে মানুষ কোন কোন সময় আলোচনা শ্রবণে আনন্দে আত্মহারা হতেন আবার কোন কোন সময় গভীর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে ফেলতেন। তাঁর আবেগময় আলোচনায় অভিভূত হয়ে অনেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতেন।

আল্লামা নক্সবন্দীর শ্রেণিকক্ষের আলোচনা ও হাদীসসমুহের ব্যাখ্যা প্রদানও ছিল অত্যন্ত ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে এমনভাবে আবেগ আপ্লুত করতে সক্ষম হতেন যে, শিক্ষার্থীগণ যেন শ্রেণিকক্ষেই নবীজীর দীদার লাভ করে ফেলবেন। বিশেষত: তিনি হাদীস শরীফে কিতাবুল হজ্জ নিয়ে আলোচনাকালে মক্কা, মদীনা, জিদ্দাহর এমন আকর্ষনীয় হৃদয়গ্রাহী ও মনোলোভা বর্ণনা উপস্থাপন করতেন যে, শিক্ষার্থীগণ যেন তখনই হজ্ব করে ফেলবেন। তাঁর এরূপ আবেগঘন আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ বাস্তবকর্মের প্রতি হয়ে ওঠতেন অত্যন্ত আগ্রহী।[১২]

এ জাতীয় আলোচনা ও শ্রেণি পাঠদান শ্রবণে শিক্ষার্থীগণ তাদের শিক্ষকের প্রতি আরো অধিক শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠতো। এভাবেই তিনি গড়ে তুলতেন অত্যন্ত আন্তরিক, দৃঢ়চেতা, প্রত্যয়ী ও সুস্পষ্টভাষী শিক্ষার্থী। যাদের পদচারণায় দেশ-বিদেশ হয়েছিল মুখরিত।

কালক্রমে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) কারামাতিয়া মাদরাসায় মাত্র একবছর শিক্ষকতা শেষে সেখান হতে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। অবশেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে শিক্ষকতা শেষে ১৯৮০ সনে কুমিল্লা জেলার সোনাকান্দা আলিয়া মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে শিক্ষকতা করেন। এখানে তিনি মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে

---

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১২. আতাউল করিম মুজাহিদ, প্রাগুক্ত, তারিখ : ০৩/০৬/২০১৬খ্রি.

প্রতিষ্ঠানের সকল দায়-দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করা হয়। কেবল প্রশাসনিক কিছু দায়-দায়িত্ব অধ্যক্ষের জন্য ধার্য রেখে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস, পাঠদান, উন্নত শিক্ষা, যাবতীয় উন্নয়নমূলক কমিটির দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। তিনি সবগুলো দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেন। ফলে, তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু, কালের মহা পরিহাস তিনি এখানেও বেশীদিন টিকে ওঠতে সক্ষম হলেন না। মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের সাথে মাসয়ালাগত বিষয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হলে তৎক্ষণাৎ তিনি মাদরাসা ত্যাগ করেন। অত্যন্ত সাধাসিধে মুসাফেরী জীবন যাপন করতেন আল্লামা নক্সববন্দী। অতীব সহজ সরল, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদ্বীপ্ত সুঠামদেহী ব্যক্তিত্বের অধিকারী আল্লামা নক্সবন্দী অত্যন্ত গভীরভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একান্ত প্রেমিক ছিলেন।

বিভিন্ন আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা, কুরআন ও হাদীসের বাণী উপস্থাপন করে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শান ও মান তাঁর শিক্ষার্থীর ওয়ায মাহফিলে সকলের উর্ধ্বে তুলে ধরতেন। তাঁর আবেগপূর্ণ আলোচনা শ্রবণে মানুষ অনায়াসেই বিভিন্ন প্রকার বিপ্লবী ও রাসায়েলী শ্লোগান তুলতেন।[১৩]

১৩. কবি মাওলানা রুহুল আমিন খান, সাবেক নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, মরহুমের হাতে গড়া প্রাক্তন ছাত্র। সরাসরি কথোপকথোন : ২৮/০২/২০১৭ খ্রি.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপাধ্যক্ষ পদে

বর্ণাঢ্য জীবনে আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) বিভিন্ন পদ-পদবী অলংকৃত করেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ কাদেরীয়া তাইয়্যেবিয়া আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ হিসাবে ১৯৭৮ সনে যোগদান করেন। এ পদে সমাসীন অবস্থায় তিনি ঢাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে একটি বিশেষ সেতুবন্ধন তৈরি করতে সক্ষম হন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা মানুষ অতীব মনোযোগসহ ব্যাপক আগ্রহভরে শ্রবণ করতেন।

তিনি ক্বাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়ার উপাধ্যক্ষ পদে আসীন থাকা কালীন অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা আব্দুল জলিল মতলবী (রহ.)। বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনকারী আল্লামা নক্সবন্দীর সাথে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের দলিল ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নিয়ে পরস্পর উপকৃত হতেন এবং তাঁদের শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর সাথে আরো ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি মানুষ এত বেশি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছিলেন যে, তাঁকে নিজেদের জমি দান করে দিতে অনেকেই আগ্রহী হন। কিন্তু অতীব উদার নক্সবন্দী (রহ.) মানুষের ঐ সকল জমি গ্রহণে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানান। ফলে মানুষ উক্ত জমি তাঁকে প্রদানে আর সক্ষম হয়নি। তিনি এত উদার ও নৈতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন যে, খুবই সহজে সকলের উপঢৌকন তিনি গ্রহণ করতেন না। যে কোন উপঢৌকন গ্রহণের পূর্বে তা বিশ্লেষণ করে সঠিক স্থান হতে সঠিক বস্তু যথাযথবাবে এসেছে কিনা তা জেনে সুনিশ্চিত হয়েই তিনি কেবল তা গ্রহণ করতেন।[১৪]

অতীব নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনি মোহাম্মদপুর ক্বাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদরাসায় একাধিকক্রমে ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ দুই বছর দায়িত্ব পালন করেন। মাদরাসার অধিকাংশ শিক্ষার্থী, শিক্ষকগণ ও প্রিয় এলাকাবাসী সকলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় এখানেও তাঁর সাথে একটি মহলের সাথে বৈরীভাব শুরু হয়। কিন্তু অত্যন্ত অকুতভয় এ সৈনিক নিয়মিত স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্রতী থাকেন। অবশেষে মাদরাসার আভ্যন্তরীন ২/৪টি বিষয়ে অধ্যক্ষের সাথে মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি অতি দ্রুত উক্ত মাদরাসা হতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে স্থানান্তরিত হন।

শত চেষ্টার পরও তাঁকে এখানে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। তিনি প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন কুমিল্লার সোনাকান্দা আলীয়া মাদরাসায়। এখানে এক বছর তিনি প্রধান মুহাদ্দিসের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সম্পন্ন করেন।

---

১৪. শাহজাদা জহিরুল করিম ফারুক, প্রাগুক্ত, তাং- ৩০/০৫/২০১৬ খ্রি.

সোনাকান্দা আলীয়া মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে পাঠদানকালে লাকসাম থানার গাজীমুড়া আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ পদ খালি হয়। তখন তাঁর প্রতি আমন্ত্রণ আসে সেখানে উক্ত উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করার জন্যে। তিনি উক্ত আমন্ত্রণ স্বদরে গ্রহণ পূর্বক গাজীমুড়া মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ পদে ১৯৮১ সালে যোগদান করেন।

উপাধ্যক্ষ পদটি প্রশাসনিক হলেও তিনি গভীর রাত পর্যন্ত কিতাব মোতালায়া, অধ্যয়ন, অধ্যবসায় ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। তুচ্ছ কোন বিষয় হলেও তিনি তা কিতাব দেখে নিশ্চিত হয়ে ফতওয়া প্রদান করতেন। তিনি বেশীরভাগ সময় কিতাব অধ্যয়নেই কাটাতেন। প্রশাসনের অধিকাংশ কাজ অধ্যক্ষ সাহেবের মাধ্যমেই সম্পন্ন করাতেন। তিনি সর্বদা সফল ও আদর্শ শিক্ষাগুরু রূপেই শিক্ষার্থীদের সম্মুখে প্রতিভাত ছিলেন। তাঁর উন্নতমানের পাঠদান পদ্ধতি, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাবলী ও সাবলীল ভাষায় কুরআন, হাদীস ও ফিক্হের জটিল ও কঠিন বিষয়াদি অতীব সহজ এবং স্বাভাবিক পন্থায় শিক্ষার্থীগণের বোধগম্য হয়ে ওঠতো।[১৫]

শিক্ষার্থীগণ শ্রেণিকক্ষে তাঁর পাঠ শ্রবণে অতীব আগ্রহী হয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন আর গ্রহণ করতেন তাঁর হৃদয়স্পর্শী পাঠ। যা কিনা শিক্ষার্থীদেরকে করে তুলতো অতীব মনোযোগী ও আকর্ষণীয়। পাঠ উপস্থাপন, বাগ্মিতার চৌকশ পদ্ধতি তাঁকে শিক্ষার্থীদের মাঝে করে তুলতো এক অনন্য আদর্শের অনুসারী ব্যক্তিরূপে। মহান শিক্ষাগুরুর পাঠ শ্রবণে বিমোহিত হয়ে ওঠতেন সকলেই।

একান্ত নিষ্ঠার সাথে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) ১৯৮১-১৯৮২ সন নিরলসভাবে দায়িত্ব পালনের পর অবশেষে তাঁর অতিমাত্রায় ডায়াবেটিক ও কুষ্ঠ রোগ ধরা পড়ে। দীর্ঘ ১ বছর অর্থাৎ ১৯৮৩ সন প্রায় পুরোটাই তিনি গাজীমূড়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ পদে আসীন থাকাকালীণ চিকিৎসার জন্য তৎকালীণ চিকিৎসার প্রধান কেন্দ্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। বছরব্যপী চিকিৎসা উক্ত হাসপাতালে চলতে থাকে। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী শুভাকাঙ্খী প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলের সহায়তায় দীর্ঘ চিকিৎসার পর অবশেষে পায়ের অপারেশন করাতে হয়।[১৬]

কর্তব্যরত ডাক্তারগণ দীর্ঘ সময় নিয়ে অবশেষে পায়ের অপারেশন সম্পন্ন করলেও তা শুকিয়ে ভাল হতে দীর্ঘ দিন সময় লেগে যায়। তাঁর শরীরে ডায়াবেটিক রোগের বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকায় তাঁর অপারেশনকৃত পায়ের ক্ষত শুকাতে বেশ সময় লেগে

---

১৫. মাওলানা কাজী রকীবুদ্দীন, প্রাগুক্ত, তারিখ : ১৮/০৩/২০১৭ খ্রি.

১৬. শাহজাদা ফেরদৌস করিম দরবেশ, মরহুমের দ্বিতীয় পরিবারের দ্বিতীয় পুত্র, সরাসরি কথা, তারিখ: ৩১/০৫/২০১৬খ্রি.

যায়। দীর্ঘ এক বছর ব্যাপিয়া তাঁর চিকিৎসা শেষে পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর তিনি পুনরায় গাজীমূড়ায় ফিরে যান। কিন্তু এখানে আর বেশি দিন থাকা হয়নি।[১৭]

মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদরাসাও গাজীমূড়া আলিয়ায় মিলে সর্বমোট ৫ বছর তিনি উপাধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের কুচক্রি মহল তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় ভূমিকা পালন করলেও তাঁর দায়িত্বকালীন কোন প্রতিষ্ঠানে কোনরূপ তহবিল তসরুফ, ফান্ড বিনষ্ট করা, অতি আবেগে কোনরূপ ব্যয়করণসহ কোন প্রকার অনৈতিক বা আর্থিক কোন প্রকার কেলেঙ্কারি প্রদর্শন করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভাধিকারী, অনুপম চরিত্রবান, নিরহংকার ব্যক্তিত্ব, নম্রতা-ভদ্রতা ও বিনয়ের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত, উন্নত রুচি, মার্জিত আচরণ, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, মিষ্টিভাষী, সদা হাস্যোজ্জ্বল এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। খুব সহজে কেউ তাঁকে দোষারোপ করতে পারে এমন কোন কাজে তিনি জড়িত হতেন না। জ্ঞান জগতে যেমন ছিলেন উজ্জল নক্ষত্র তেমনি চিন্তা-চেতনা মনন-মানসিকতায় ছিলেন একজন দার্শনিক পণ্ডিত।

তাঁর অনন্য শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে তিনি উপাধ্যক্ষ থাকাকালীণ ও প্রশাসনের চেয়ে মহান শিক্ষকতাও বিদগ্ধ গবেষণায়ই বেশি সময় ব্যয় করতেন। জ্ঞানার্জন ও বিতরণের পাশাপাশি দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে ছিলেন একজন মশালবাহী সিপাহসালার। শত সহস্র বিতর্ক অনুষ্ঠান, মুনাযারা এবং বাহাছে উপস্থিত থেকে ইসলামের পক্ষে এবং প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান-মানের ব্যাপারে বিরোধী পক্ষের সহস্র প্রশ্নোত্তর, কুরআন-হাদীসের দলীলসহ ইজমা, কিয়াস এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করে সদা সর্বদা বিজয়ী বেশেই প্রত্যাবর্তন করতেন। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের পথে যাবতীয় জিহাদে একজন অকুতোভয় বীর সাহসী যোদ্ধাও সৈনিক ছিলেন। বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহকে ভয়ের ক্ষেত্রে ছিলেন প্রকাণ্ড আত্মার অধিকারী।

জ্ঞান-গর্ভে অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, শারিরিক গঠন, আমল আখলাক সাধনা-চেষ্টা ইত্যাদিতে ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যাবতীয় আদর্শের প্রথম শ্রেণির একজন মহান সৈনিক। তাঁর অতি মায়াবী চেহারা ও ভাব গাম্ভীর্য প্রদর্শনে অনেক সময় মানুষ তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হতেন। বিশেষতঃ তাঁর বক্তব্য, বাণী, নসিহত ইত্যাদি শ্রবণান্তে আরো বেশি তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষ ভক্তি শ্রদ্ধায় অবনত হতেন।

চারিত্রিক মাধুর্যতায় এমন অগ্রণী ছিলেন যে, কোন প্রকার প্রলোভন, লোভ, কোন বস্তুর প্রতি অতি আসক্তি ইত্যাদি মুক্ত ছিলেন। এমন অনেক পরিবেশ অতিবাহিত হয়েছে যে,

---

১৭. শাহজাদী মারজান বেগম সুফিয়া, সরাসরি কথা : ২৩/১২/২০১৬খ্রি.

তাঁর বাগ্মীতা, যুক্তি, বক্তব্য শ্রবণে কারো পক্ষে কোন প্রকার প্রলোভনের প্রস্তাব দেবে সে সাহস কারো ছিল না। তাঁর ধমনিতে প্রবাহিত ছিল মহান ওলীর রক্ত। সর্বদা ছিলেন সঠিক, নির্ভিক সুদৃঢ় ও অটল, ফলে তিনি যাবতীয় প্রলোভন ও লোভনীয় পথকে বিসর্জন দিয়ে অতি সাধারণ পুতঃপবিত্র, পরিচ্ছন্ন জীবন গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিপক্ষের যুক্তিসমূহ সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ, উত্তেজনাহীন ও আবেগমুক্ত ভাবে অতীব ঠাণ্ডা মাথায় কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াসের আলোকে উপস্থাপন করতেন এবং তা খণ্ডন করে বিরোধী পক্ষকে সর্বদা পরাজিত করে যেতেন। স্বভাবত মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হার জিত থাকে, জয়-পরাজয় নিয়েই জীবনের ধারা প্রবাহিত হয়। কিন্ত, অত্যন্ত ব্যতিক্রম জীবন যাপনকারী আল্লামা নক্সবন্দীর (রহ.) জীবনে কোন দিন পরাজয় বলতে কিছুই ছিল না। হয় তিনি যুক্তি তর্কে বিজয়ী হতেন না হয় বিরোধী পক্ষ বাহাস, মুনাযারায় উপস্থিত হতো না। তিনি একাই স্বীয় পক্ষ নিয়ে উপসিস্থত জনতাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়ে বিজয় নিয়ে ফিরে আসতেন।

তাঁর জ্ঞানের পরিধি এমনই ব্যাপক ছিল যে, তিনি কখনো অহংকার প্রদর্শন করে চলতেন না। যুক্তি, তর্কে বাহাসে প্রতিপক্ষকে বার বার পরাজয়ের গ্লানিতে নিক্ষেপ করলেও তাদের পক্ষে তাঁকে দাম্ভিক, অহংকারী ইত্যাদি বলা সম্ভব হয়নি। বরং তিনি সকলের সম্মুখে যুক্তি উপস্থাপন করে বলতেন, আল্লাহ আমাদের বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনুল কারীমে উপস্থাপন করে জানিয়ে দিয়েছেন:

فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب

অর্থ: হে নবীজী! নিশ্চয়ই আপনার দায়িত্ব হলো আমার বাণী পৌঁছে দেয়া আর আমার কর্তব্য হলো তাদের (শ্রোতাগণ) থেকে হিসাব নিকাশ বুঝে নেয়া।[১৮]

পবিত্র কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত বাণীর সম্পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণে তিনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিকসহ জীবনের যাবতীয় দিক গঠন করেছিলেন। কখনো অকারণে কারো প্রতি তিনি রাগান্বিত হতেন না। তিনি সকল কিছু সর্বদা বুঝিয়ে বলতেন এবং স্বস্নেহে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিয়ে নেয়ায় অগ্রণী ছিলেন। অত্যন্ত মার্জিত ভদ্রোচিত, রুচিশীল, যুক্তিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ ও ভাষা ব্যবহার করে সকলের হৃদয়কে কোমল করে দিয়েই মানুষ হতে কাজ আদায় করিয়ে নিতে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। ফলে, খুব সহজে তাঁর প্রতি কারো পক্ষে রুঢ়ভাব প্রদর্শনের সুযোগ ছিল না। প্রতিপক্ষ শত্রুগণও কোনদিন তাঁর জ্ঞান-গবেষণা, চারিত্রিক মাধুর্য, চেষ্টা-সাধনার সাঠিকতা ইত্যাদি বিষয়ে অদ্যাবধি কোন প্রকার প্রশ্ন তুলতে সক্ষম হননি। এমনকি তাঁর এরূপ মাধুর্যপূর্ণ চরিত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। যা তাঁকে করে রেখেছে অমর ও মহান আদর্শবান।

---

১৮. আল-কুর'আন, ১৩ : ৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন

জ্ঞানের বিশালতা, গবেষণা, দর্শন, সাধনা ইত্যাদির সুউচ্চ গতি শায়খুল হাদীস আল্লামা নক্সবন্দীকে (রহ.) এক সময় দেশের আলিয়া মাদরাসা জগতের সর্বোচ্চ পদ অধ্যক্ষের পদে আসীন করে। যদিও জ্ঞানের মশালবাহী সিপাহ সালার খ্যাত নক্সবন্দী ছিলেন অতীব সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী, তবুও তাঁর চৌকশ নেতৃত্বের যোগ্যতার প্রতি আস্থাশীল হয়ে কুমিল্লাবাসী তাঁকে কুমিল্লা ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা, চকবাজর-এর অধ্যক্ষ হিসাবে ১৯৬৪ ইং সালে নিয়োগ প্রদান করেন। পদ-পদবীর প্রতি নির্লোভ ব্যক্তিত্ব আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) কে নিয়োগ প্রদানের অন্তত এক সপ্তাহ পর বহু দিক হতে বুঝিয়ে রাজি করানোর পর তিনি উক্ত পদে যোগদানে আগ্রহী হন এবং অবশেষে যোগদান করেন। তাঁর এরূপ পদলোভহীন দৃঢ় মানসিকতায় মাদরাসা পরিচালনা পরিষদ অতীব সন্তুষ্ট হন এবং সকল সদস্য সর্বদা তাঁর প্রতি আন্তরিক সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করে তাঁকে সহায়তা করতেন। যে কোন বিষয়ে সকলের আন্তরিকতায় সিক্ত হয়েই তিনি মাদরাসার যাবতীয় কাজ আনজাম দিতেন।

মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের সভাপতির অবগতির বাইরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি পাতাও নড়তে দিতেন না। এমন আন্তরিকতাপূর্ণ একনিষ্ঠ দায়িত্বের প্রতি সচেতনতায় সকলে তাঁর প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। প্রতিনিয়ত মাদরাসার কমিটির সদস্যবৃন্দ তাঁকে তদারকি , সহায়তা, সাহচর্য, কর্মদ্দিপনা, উৎসাহ প্রদান করতে থাকেন। তাদের সকলের ঐকান্তিক আন্তরিকতা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় তিনি কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে সুদীর্ঘ ১০ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৪ ইংরেজি সনের শুরুতে উক্ত পদে যোগদান হতে শুরু করে ১৯৭৩ ইংরেজি সনের সমাপ্তি লগ্ন পর্যন্ত একাধিক্রমে দশটি বছর তিনি অতীব নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, আন্তরিকতা দিয়ে যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও দায়-দায়িত্ব আনজাম দিতে সক্ষম হন। অফিসের যাবতীয় কাজকর্ম কর্ম-দিবসের অফিসকালীণ সময়েই নিরলসভাবে সম্পাদন করে নিতেন। অফিসের আগে পরে কখনো কোন কাজ তিনি রেখে দিতেন না। ফলে, অফিসের বাইরের অবসর সময়ে নিরলস পরিশ্রম করে তাঁর জ্ঞান-গবেষণা, প্রচেষ্টা, সাধনা অব্যাহত রাখতেন। নিয়মিত কিতাবাদি অধ্যয়ন অব্যাহত রেখে স্বীয় জ্ঞানের গভীরতাকে উত্তরোত্তর আগ্রসরমান করতেন। তাতে তাঁর শিক্ষানুরাগ, শিক্ষা সাধনা ও জ্ঞানার্জন স্পৃহা দর্শনে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ দারুনভাবে জ্ঞান সাধনায় আগ্রহী হয়ে উঠতেন।[১৯]

---

১৯. মাওলানা আব্দুল কাদের জিলানী, প্রাগুক্ত, সরাসরি কথা- তারিখ : ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি.

শিক্ষার্থীবৃন্দ যখন অবলোকন করতেন যে, অধ্যক্ষ পদের এমন বহুমুখী কর্মকান্ডের দায়িত্ব পালনের পরও তিনি নিয়মিত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফসহ বড় বড় হাদীস-তাফসীরের ক্লাস সমূহে পাঠদান করছেন গভীর রাত পর্যন্ত অধ্যয়ন-অধ্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছেন আবার ভোররাতে ওঠে নিয়মিত যাবতীয় ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সমাপনান্তে অধ্যয়নে সময় ব্যয় করছেন। এরূপ একটি অধ্যয়নী ধারা সম্পন্ন জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েছেন তাঁর সকল শিক্ষার্থী। তারা পদে পদে তাঁকে অনুসরণ অনুকরণ করেছেন। তরান্বিত করেছেন মাদরাসার উন্নত ফলাফল। বেরিয়ে পড়েছে মাদরাসার সুনাম ও খ্যাতি সর্বত্র।[২০]

দীর্ঘ দশ বছরের প্রশাসনিক পদে আসীন থাকাকালীন আল্লামা নক্সবন্দী হাজার হাজার শিক্ষার্থী গড়ে তুলেছিলেন যারা পরবর্তী সময়ে নয় শুধু অদ্যাবধি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নামী-দামী ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ণধার রূপে অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন। তাদের দায়িত্বপূর্ন ও যথাযথ ভূমিকায় দেশবাসী পাচ্ছেন উন্নত মানের সেবা।

মাদরসার অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদানের পর হতেই তিনি অধ্যক্ষের জন্য নির্ধারিত মাদরাসার আবাসন কক্ষেই অবস্থান করতেন। মাদরাসার যাবতীয় বিষয়াবলী ছিল তাঁর নখদর্পনে। মাদরাসার আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক যে কোন সমস্যা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ দৃষ্টি গোচরে। প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূল যে কোন পরিস্থিতি তাঁর নযরে নয় শুধু, কানে আসার সাথে সাথেই ব্যবস্থাপনা পরিষদকে সাথে নিয়ে তিনি দ্রুত তা সমাধান করে দিতেন। কোন প্রকার কানকথা, গুজব পরিস্থিতিতে সর্বদা শান্ত, স্থির, কোমল স্বভাবে ধীর গতি যথাযথ ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সে সকল সিদ্ধান্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করতেন। সক্ষম হতেন সকলের মন জয় করে কর্মকাণ্ড সমাধানের।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন। তাঁর সমসাময়িক কালে মাদরাসার অবকাঠামোগত বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এলাকাবাসীর সার্বিক ও আন্তরিক সহযোগিতায় এবং সাফল্যজনক ফলাফলের কারণে সরকারি অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় উক্ত মাদরাসা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উন্নত ধরনের দালান-কোঠা নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ, পাঠদান, আবাসন সমস্যা সমাধনসহ যাবতীয় ধর্মীয় কাজ সম্পাদনে নিবিড়তম পরিবেশ তৈরী করে দিয়েছেন। অদ্যাবধি যা একটি দৃষ্টি নন্দন পরিবেশ হিসেবে দৃষ্টি গোচর হয়।

শিক্ষার্থীদেরকে নিবিড় ও নিরবিচ্ছিন্ন তত্ত্বাবধানে তিনি ছিলেন খুবই চতুর ও সাহসী। বিশেষত মাদরাসা ছাত্রাবাসে অবস্থানরত আবাসিক শিক্ষার্থীগণকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিতে রাখতেন। রাতের গভীরে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়তেন তখনও তিনি স্বীয় জ্ঞান-সাধনা,

---

২০. আব্দুল কাদের জিলানী, প্রাগুক্ত, তারিখ : ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি.

অধ্যয়ন, অধ্যবসায় সমাপনান্তে পুরো ছাত্রাবাস ঘুরে আসতেন আর তদারকি করতেন কোথাও কোন সমস্যা আছে কিনা বা কোন প্রকার সমস্যা হচ্ছে কিনা?

একদিনের এক বিশেষ ঘটনা তাঁর দৃষ্টি গোচর হয়। তিনি গভীর রাতে ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে গিয়ে দেখেন যে, সেখানে একটি মশারীর নীচে আলো জ্বলছে। কয়েকজন শিক্ষার্থী আস্তে আস্তে কথা বলছেন। তিনি স্থির গতিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অবস্থান করে দেখলেন যে, কথাবার্তা থামছে না। হঠাৎ তিনি দরজায় করাঘাত করলেন। শিক্ষার্থীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। দিক-বিদিক ছুটোছুটে করতে গিয়ে তাদের মশারীর পাশগুলো ছিঁড়ে যায়। প্রত্যেকে বেরিয়ে দরজা খুলতেই অধ্যক্ষ হুজুরকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন শিক্ষার্থীদের জমাট বসা খাটে তাসের কার্ড। তিনি ২/৩টি কার্ড হাতে নিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কি ছাত্রাবাসে? প্রত্যেকে তাঁর পায়ে লুটে পড়ে ক্ষমা চান। কিন্তু তিনি সকলকে বললেন ক্ষমা করার শর্ত আছে তা সকালে জানানো হবে। সকালে তিনি ঐ সকল শিক্ষার্থীকে অফিস সময়ের পূর্বেই নিজ কক্ষে ডেকে পাঠান। তাদেরকে শর্তাবদ্ধ করেন যে, তাদের সকলের অভিভাবককে পরবর্তী দিনে দুপুর ৩ টার মধ্যে মাদরাসায় উপস্থিত করাবে। প্রত্যেক অপরাধী শিক্ষার্থীকে তাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে পরবর্তী দিন দুপুর ৩ টার মধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীগণের অভিভাবকগণকে বিষয়টি জানিয়ে ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর হবে না বলে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণের মুসলিকা গ্রহণ করে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে জরুরী ভিত্তিতে মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের অভিভাবক সদস্যবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে সভাপতি সাহেবের নির্দেশনা নিয়ে বিষয়টি সুরাহা করেন।

উক্ত ঘটনার যাবতীয় বিষয় পরবর্তীতে নোটিশ আকারে নোটিশ বোর্ডে উপস্থাপন করে পুরো মাদরসাার সকল শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে কোন প্রকার অনৈতিক কাজে জড়িত না থাকার জন্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। শিক্ষার্থীরা সতর্কতা অবলম্বনের সুযোগ পান। ঐ ঘটনার পরবর্তী সময়ে শুধু ছাত্রাবাসে নয়, মাদরাসা ক্যাম্পাসের বাইরেও শিক্ষার্থীগণ কোনরূপ অনৈতিক কাজ করার ব্যাপারে যথেষ্ট ভয় পেতেন এবং সতর্ক থাকতেন। ফলে মাদরাসায় সার্বিক শৃঙ্খলা বিধানে তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব যেমন সহায়ক হয়, তেমনি কর্তৃত্ববাদী মানসিকতার পরিবর্তে অত্যন্ত সহনশীল ও নৈতিকতা সম্পন্ন জীবন গঠনে উৎসাহ সৃষ্টিতে তিনি অগ্রণী ব্যক্তিরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রগাঢ় প্রত্যয়শীল এ মহান ওলী আল্লাহ তাঁর নিরলস চেষ্টা, প্রচেষ্টা, সাধনা ও তৎপরতার মাধ্যমেই বস্তুতপক্ষে একজন যশসী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। এজন্যেই পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ-

অর্থ : আল্লাহ তাআলা কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের যাবতীয় চেষ্টা তারা না করেন।[২১]

আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) উল্লেখিত আয়াতের পরিপূর্ণ অনুসরণ অনুকরণের মাধ্যমে আত্মগঠন, সমাজগঠন, পরিবার গঠনে ব্রতী ছিলেন। ফলে তাঁর পরিচিতি, সম্মান মর্যাদা সর্বদা ও সর্বত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু হিসেবে।[২২]

কুমিল্লায় মাদরাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ থাকাকালীন অতীব সাধারণ জীবন যাপনে তিনি যে অভ্যস্থ ছিলেন, তা সকল মহলেই স্মরণীয় ছিল। সে সময় তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি কুমিল্লায় মুদি দোকানের ব্যবসা চালিয়েছিলেন। সে দোকানে তাঁর ভাতিজা জনাব মুদাচ্ছের হোসেন চাকুরি করতেন। অবশ্য দেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পর জনাব মুদাচ্ছের হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের কর্মচারী পদে যোগদান করেন। এখান হতেই তিনি চাকুরি জীবন সমাপ্ত করেন। কুমিল্লার উক্ত মুদি দোকানে অবস্থান কালীণ তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছায় প্রতিপক্ষ শক্তি বার বার চেষ্টা করেও আল্লামা নক্সবন্দীকে কোন প্রকার আঘাত দিতে পারেননি। তিনি নিরবে নিরাপদে দেশের যুদ্ধ বিগ্রহ চলাকালীনও স্বীয় দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আনজাম দিতে সক্ষম ছিলেন। এবং অত্যন্ত নির্ভীকভাবে ঐকান্তিকতার সহিত সদা সচেতন থেকে স্বপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন এবং সদা তা সম্পাদন করতে সচেষ্ট থাকতেন।

সদা তৎপর সদা জাগ্রত সর্বক্ষণ সচেতন থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে তিনি কুমিল্লায় আর অবস্থান করতে পারলেন না। প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুৎসা রটাতে থাকলে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অতীব নীরব পন্থায় তিনি অবশেষে ১৯৭৩ সনে স্বেচ্ছায় অধ্যক্ষ পদ হতে ইস্তফা প্রদান করেন। এরপর তিনি স্বীয় পিত্রালয়ে ফিরে যান। এদিকে মাদরাসার শুভাকাঙ্খীও সুধী মহলে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) এর প্রস্থানের সংবাদে বিষণ্নতার ছায়া নেমে আসে। অনেকেই হতাশা ব্যক্ত করতে থাকেন যে, কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসা তাঁর ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হবে না এবং তাঁকে পুনরায় নিয়ে আসার চেষ্টা চলে। কিন্তু, তিনি কোন প্রকার সায় না দিয়ে ধৈর্য্যের সাথে অন্য কিছুর জন্য অপেক্ষা করেন। অবশেষে তা মিলেও যায়।[২৩]

---

২১. আল-কুর'আন, ১৩ : ১১

২২. কাজী মাওলানা রকিব উদ্দীন, প্রাগুক্ত

২৩. মাওলানা আতাউল করিম মুজাহিদ, প্রাগুক্ত, তারিখ : ০৩/০৬/২০১৬ খ্রি.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শায়খুল হাদীস পদে

অতীব সহিষ্ণু আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) তাঁর ধৈর্য্যের ফল অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই পেয়েছিলেন। কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসা হতে পদত্যাগান্তে বাড়ি পৌঁছে কিছুদিন অবস্থান পরবর্তী সময়েই চট্টগ্রাম জামিয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদরাসার পক্ষ হতে উক্ত মাদরাসায় হাদীস শরীফ পাঠদানের শিক্ষক স্বল্পতার দরুন কামিল শ্রেণিসহ উচ্চ শ্রেণিসমূহে হাদীস বিষয়ে পাঠদানের জন্য তাঁকে বিশেষভাবে মনোনীত করা হয়। তিনি কাল বিলম্ব না করে হাদীসের খিদমতের উদ্দেশ্যে তাদের ডাকে সাড়া দেন। তারা সকলে তাঁকে অত্যন্ত সাদরে ও সাগ্রহে গ্রহণ করেন।

উক্ত মাদরাসায় তিনি যোগদানের পর পরই মাদরাসার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়ে যায়। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি উন্নত সেবা, আন্তরিক ও ঐকান্তিক জ্ঞান বিতরণ স্পৃহা ইত্যাদি মাদরাসা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দকে অতি অল্প সময়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তাঁর পাঠদানের প্রতি উৎসাহিত হয়ে এবং সর্বদিকে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখে মাদরাসা পরিচালনা পরিষদ তাদের সভায় আল্লামা নক্সবন্দীকে পদ সৃষ্টি করে "শায়খুল হাদীস" পদে আসীন করেন। এতে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) তাঁর অতীত পদসমূহ হতে এ পদকে আরো বেশী সম্মানের পদ হিসেবে মেনে নিয়ে তা আরো আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষের প্রতি অতীব কৃতজ্ঞচিত্তে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

খুবই স্নেহশীল পরিবেশে জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীস পদে অতীব সুনাম-সুখ্যাতির সাথে সাহসী ব্যাঘ্ররূপী সিপাহসালার হিসেবে পাঠদান করেন। হাদীস শাস্ত্রে জামেয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসায় অদ্যাবধি তাঁর বিকল্প কোন শিক্ষকের পক্ষে এরূপ হাদীস শাস্ত্র পাঠদান, ব্যাখ্যা বুঝিয়ে বলা সম্ভব হয়নি। এমনকি কোন বিকল্প শিক্ষকও গড়ে ওঠেনি।

আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) জামেয়ার শ্রেণি কক্ষে হাদীস শাস্ত্র পাঠদান করতেন এমন মধুর ও সাবলীল কণ্ঠে পড়াতেন যে, শিক্ষার্থীগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হতেন। তাঁর হাদীস পাঠদানে আদব ও নবীজীর শান-মানের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

এ প্রথিতযশা মুহাদ্দিসুল আল্লাম ও শাইখুল হাদীস নক্সবন্দী (রহ.) ১৯৭৪ সালে জামেয়া-ই-আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার "শায়খুল হাদীস" পদে যোগদানের পর ১৯৭৭ সন পর্যন্ত স্বীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। সুদীর্ঘ এ চার বছরের পাঠদানে তিনি এমনই উন্নত পদ্ধতির পাঠ সরবরাহ করেন যে, শিক্ষার্থীগণ তাঁর ঐ সময়ের সরবরাহকৃত পাঠ হতে সারা জীবনের পাঠের সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর নিকট হাদীস শরীফ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার পর আর কারো নিকট তাদেরকে মুখাপেক্ষী থাকতে হয়নি।

কেননা, তাঁর পাঠদান এমন আদর্শিক বাস্তবভিত্তিক ও উদাহরণ সমৃদ্ধ ছিল যে, তা হৃদয়ংগম করলেই সকলের মনের খোরাক হয়ে যেত। তাদেরকে পরবর্তী আর কোন বিকল্প চিন্তা করতে হতো না।[২৪]কিন্তু তাঁর এমন সুন্দর সুখ্যাতিপূর্ণ অবস্থান প্রশাসনের কিছু ব্যক্তির অসহ্য হওয়ায় তারা তাঁকে নিয়ে কিছু কটু কথা রটনা করে, যা তিনি অসত্য হওয়ায় ঘৃণাভারে প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি ঐ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে তিনি চাকুরির পদটিও ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁকে পদত্যাগ করে বসে থাকতে হয়নি। সেখান হতে তিনি ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়ায় যোগদান করেন।

আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) চিকিৎসাধীন থাকা কালীন তৎকালীন শ্রিকোট দরবার শরীফ, পাকিস্তানের প্রধান খাদিম আল্লামা তৈয়্যব শাহ (রহ.) একদা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে দেখতে আসেন এবং তাঁর জন্যে দোয়া করে বলেন,

آپ عجلا تندرست ہو جائیگا اور جامعہ میں پہر آئیگا-

অর্থ : "আপনি সহসা সুস্থ হয়ে যাবেন, সুস্থ হয়ে পুনরায় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ায় ফিরে আসবেন।"

এই সুসংবাদ শুনে আল্লামা নক্সবন্দী তাঁকে কথা দেন, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুস্থ করলে জামেয়া সুন্নিয়ায় আবার ফিরে আসবো।[২৫]

ঠিকই মহান আল্লাহর মহৎ ওলীগণের দোয়া কবুল হলে তিনি কিছুদিন পর সুস্থ সবল হয়ে পুনরায় জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া ষোলশহর, চট্টগ্রামে গিয়ে "শায়খুল হাদীস" পদে ১৯৮৪ সালে যোগদান করেন। আবার সরব পর্যায়ে তাঁর সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার আলোকে শিক্ষার্থী গঠনের কাজে ও গভীর পাঠ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। কিতাবের পাতায় পাতায় আবার নিজেকে সপে দেন। সঠিক ও যথাযথ পন্থায় জ্ঞানার্জনের আলোক বর্তিকা নিয়ে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া চট্টগ্রামের আঙ্গিনায় জ্বালাতে আরম্ভ করেন জ্ঞান মশাল। কেননা, তিনি মহান আল্লাহর সে বাণীর খুবই অনুসারী ছিলেন, যেখানে আল্লাহ বলেছেন-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ○

অর্থ : হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি বলে দিন যাঁরা জ্ঞানর্জন করেন, আর যাঁরা জ্ঞানার্জন করেন না, তাঁরা কি সমান হতে পারে? কেননা, কেবল জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ মাত্রই আল্লাহকে স্মরণ করেন।[২৬]

---

২৪. মাও. আব্দুল কাদের জিলানী, প্রাগুক্ত, তারিখ : ৩০/০৫/২০১৬ খ্রি.

২৫. জহিরুল করিম ফারুক, প্রাগুক্ত, তারিখ : ০৮/১২/২০১৬ খ্রি.

২৬. আল-কুর'আন, ৩৯ : ৯

এ জ্ঞান সাধনার ধারাবাহিকতায় আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) আমৃত্যু উক্ত প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানান্বেষণেই কাটিয়ে দেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ১৯৮৪ সাল হতে ১৯৮৭ ইং সন পর্যন্ত প্রায় ৪ বছর শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন।

উক্ত চার বছরে জামেয়া সুন্নিয়ায় কামিল শ্রেণিতে প্রতি বছর দেশের মাদরাসা বোর্ডের সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী ভাল ফলাফল করতেন। দরস ও তাদরীসের পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠের সুবিধার্থে 'তাকারীরে বুখারী' এবং 'তাকারিরে মুসলিম' 'তাকারীরে তিরমিযী' ইত্যাদি সিহাহ সিত্তার উর্দু ভাষায় এমন সুন্দর প্রশ্নোত্তর সমৃদ্ধ নোটবই বের করেন যে, শিক্ষার্থীগণ তা পাঠ করে তাদের কামিল পরীক্ষার যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে সমর্থ হতেন এবং ভাল ফলাফলের উপযুক্ত করে নিজেদের পক্ষে গড়ে তুলতে সক্ষম হতেন এবং এ যুক্তিপূর্ণ তাকরীর পাঠ করার পর শিক্ষার্থীগণের পরীক্ষা সংক্রান্ত হাতাশা কেটে গিয়ে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাস জন্মাতো। তাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন ভাবাবেগের উচ্ছাস প্রতিভাত হতো। তারা হতো আনন্দে আত্মহারা।

সে কয়েক বছরসহ পরবর্তী দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত জামেয়া আহমদিয়ার কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীগণ আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) এর লিখে যাওয়া উর্দু নোট বই অনুসরণ করে নিজেদের পরীক্ষাসমূহের উন্নত ফলাফল এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সর্বোচ্চ ফলাফল লাভে বিশেষভাবে সক্ষম ছিলেন। আর এ ক্ষেত্রে ইনতিকালের পরও মরহুম নক্সবন্দী (রহ.)এর ভূমিকা তথা তাঁর লিখিত উর্দু ভাষায় নোট বইসমূহের ভূমিকা ছিল সবেচেয়ে বেশি।

এমনকি তাঁর ইনতিকালের পরও লিখে যাওয়া বইসমূহ পাঠান্তে ভাল ফলাফল লাভ করার পর শিক্ষার্থীগণ তাঁর বাড়ি এসে কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সাক্ষাৎ করে যেতেন। এবং তাঁদের দোয়া গ্রহণ করতেন। এমনকি কেউ বাড়ির দরজাস্থ তাঁর কবর যিয়ারতে ধন্য হতেন।

তাঁর হাতে গড়া শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে তাঁদের মধ্য হতে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো-

আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি সম্পন্ন প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ

১। আলহাজ্ব হযরত মাও: ফজলুল করিম, (কুলাউড়া, মৌলভী বাজার), সাবেক অধ্যক্ষ, ক্বাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ইমাম ও খতিব, ইস্টলন্ডন জামে মসজিদ, লন্ডন, ইউ.কে।

২। মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাবেক খতিব, দুবাই জামে মসজিদ, ইউ.এ.ই., বিশিষ্ট গবেষক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, বর্তমানে চেয়ারম্যান ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ ও চেয়ারম্যান আলা হযরত গবেষণা একাডেমী চট্টগ্রাম।

৩। আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল করিম সিরাজগঞ্জী, আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন বক্তা ও ইসলামী গবেষক, অধ্যক্ষ, সিরাজনগর মোমতাজিয়া মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, হবিগঞ্জ, সিলেট। সফর : ইউ.এস.এ, ইউ.কে, ইউ.এ.ই. (দুবাই), ভারত।

৪। ড. আব্দুল্লাহ আল-মারুফ, উপ-পরিচালক ও গবেষক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মোকার্‌রম, ঢাকা এবং আন্তর্জাতিকভাবে ওআইসি কর্তৃক মনোনীত মুফতি।

৫। আলহাজ্ব হযরত মাওলনা খাজা আবু তাহের নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী, পীরে কামিল, গাছতলা দরবার শরীফ, সদর, চাঁদপুর। আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন বক্তা।

৬। আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আলাউদ্দিন আকন্দ আল-ক্বাদরী, পীর, চুনারঘাট কাদেরিয়া দরবার শরীফ, হবিগঞ্জ, সিলেট এবং আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন বক্তা।

৭। মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল-কাদরী, সাবেক খতিব, মুন্নু টেক্সটাইল মিল জামে মসজিদ, টঙ্গী, গাজীপুর এবং আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন বক্তা।

জাতীয় পর্যায়ে খ্যতিসম্পন্ন প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ

১। মরহুম মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক মুহাদ্দিছ ক্বাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও সাবেক অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদরাসা, চাঁদপুর। আল-কুরআন গবেষণায় ৩ বার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে বার বার পদকপ্রাপ্ত এবং বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণেতা।

২। ড: মাহবুবুর রহমান, বর্তমান অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদসরাসা, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সভা-সেমিনারে খ্যতিমান বক্তা।

৩। মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, বোরহান উদ্দীন, ভোলা, সাবেক অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদরাসা ও শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আদর্শ শিক্ষকরূপে জাতীয় পুরুষ্কার প্রাপ্ত এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

৪। আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আব্দুল আলিম রেজভী, অধ্যক্ষ, ক্বাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৫। হযরত মাওলানা মোস্তাক আহম্মদ আল-ক্বাদেরী, হেড মুহাদ্দিছ, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৬। হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন, অধ্যক্ষ, কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসা, চকবাজার, কুমিল্লা।

৭। আলহাজ্ব আবু তাহের হেশামী, মুহাদ্দিছ, কুমিল্লা আলিয়া মাদারসা, চকবাজার, কুমিল্লা।

৮। আলহাজ্ব মাওঃ এ.কে.এম খায়রুল্লাহ, সাবেক উপাধ্যক্ষ, শাহচন্দন আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম; সাবেক অধ্যক্ষ, জামালপুর আলিয়া মাদরাসা, জামালপুর।

৯। আলহাজ্ব মুফতি মাওলানা আতাউল করিম মুজাহিদ, অধ্যক্ষ, ফরাজিকান্দি ওয়াইসিয়া ডি. এস আলিয়া মাদরাসা, উত্তর মতলব, চাদপুর।

১০। আলহাজ্ব হযরত মাওঃ মফিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, শাহরাস্তি ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসা, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

১১। ডঃ আব্দুল ওয়াদুদ, অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১২। আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম মুজাহিদী, সাবেক অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদরাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; আন্তর্জাতিক খ্যতি সম্পন্ন বক্তা ও গবেষক; বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

১৩। আলহাজ্ব হযরত মাওলনা ফজলুল হক, উপাধ্যক্ষ, সোনাকান্দা দারুল হুদা আলিয়া মাদরাসা, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

১৪। আলহাজ্ব হযরত মাওলনা আব্দুল করিম নাঈমী, অধ্যক্ষ, শরিয়তপুর সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা; গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

১৫। আলহাজ্ব হযরত মাওঃ আবু জাফর মো. হেলাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী, অধ্যক্ষ, নারিন্দা শাহ্ আহসানুজ্জামান কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

১৬। মরহুম আলহাজ্ব আইয়ূব আলী আযমী, সাবেক মুহাদ্দিছ, সোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

১৭। আলহাজ্ব মাওলানা মাঈনুদ্দীন আশ্রাফী, হেড মুহাদ্দিছ, সোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

১৮। আলহাজ্ব হযরত মাও. আবু তাহের নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী, অধ্যক্ষ, গুনারকাটি আলিয়া মাদরাসা, সাতক্ষিরা।

১৯। আলহাজ্ব হযরত মাও. রবিউল ইসলাম, হেড মুহাদ্দিছ, গুনারকাটি, সাতক্ষিরা।

২০। আলহাজ্ব কাজী সোলায়মান চৌধুরী, সভাপতি, কাজী সমিতি, বাংলাদেশ।

২১। আলহাজ্ব ক্বাজী মোবারক হোসাইন, সেক্রেটারী জেনারেল, কাজী সমিতি, বাংলাদেশ। গভর্নিং বডির সদস্য, ক্বাদেরীয়া আলিয়া মাদরাসা পরিচালনা পরিষদ।

২২। আলহাজ্ব আব্দুর রহমান আল-ক্বুদেরী, খতিব, আবুল উলাইয়া দরবার শরীফ জামে মসজিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওয়ায়েজ।

২৩। মুফতি আলহাজ্ব হারিসুর রহমান আনোয়ারী ফেরদৌসী, পীর সাহেব ফেরদৌসিয়া দরবার শরীফ, বিরতুল, গাজীপুর, ঢাকা; সাবেক খতিব, মাদারটেক বড় বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা।

২৪। মরহুম মোস্তাক আহমদ রিজভী, সাবেক পীর, রেজভীয়া দরবার শরীফ, নীলফামারী।

২৫। আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আতাউর রহমান রিজভী, খতিব ও বিশিষ্ট বক্তা, রাজশাহী।

২৬। হাফেজ মাওলনা আবু তাহের, মুহাদ্দিছ, লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, লক্ষ্মীপুর।

২৭। মরহুম মাওলানা আলহাজ্ব বাকী বিল্লাহ আল-ক্বাদেরী, আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন বিশিষ্ট বক্তা ও সাবেক খতিব, দেওভোগ জামে মসজিদ, নারায়নগঞ্জ এবং প্রতিষ্ঠাতা, জামেয়া ক্বাদেরীয়া তাহেরীয়া মাদরাসা, বন্দর, নারায়নগঞ্জ।

২৮। মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা নোমান ওসমানী, সাবেক অধ্যক্ষ, বরুড়া সিনিয়র মাদরাসা, কুমিল্লা।

২৯। আলহাজ্ব হযরত মাওলনা জয়নুল আবেদীন জুবাইর, অধ্যক্ষ, নিছারিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৩০। আলহাজ্ব হযরত মাওলনা রফিকুল ইসলাম, হেড মুহাদ্দিছ, নিছারিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৩১। আলহাজ্ব মাও. আলহাজ্ব আব্দুস ছাত্তার, সাবেক অধ্যক্ষ, ক্বাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা।

৩২। মরহুম আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সাইফুল্লাহ নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.), প্রতিষ্ঠাতা পীরে কামিল, চান্দ্রা দরবার শরীফ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

৩৩। মাওলানা ইকবাল হোসেন আল-ক্বাদরী, অধ্যক্ষ, তৈয়্যেবিয়া ওয়াদুদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, চন্দ্রঘোনা চট্টগ্রাম, বিশিষ্ট ওয়েজীন।

৩৪। আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি ওয়াছিউর রহামন আল-ক্বাদেরী, প্রধান ফকীহ, জামেয়া আহম্মদীয়া ছুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, বিশিষ্ট ওয়ায়েজীন।

৩৫। আলহাজ্ব মুফতি মাওলনা আব্দুল ওয়াজেদ, ফকীহ, জামেয়া আহম্মদীয়া ছুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম, খ্যতিমান ইসলামী বক্তা।

৩৬। মরহুম মাওলানা আলী হোসেন, সাবেক অধ্যক্ষ, কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসা, চকবাজার, কুমিল্লা।

৩৭। আলহাজ্ব মাওলানা কবি রুহুল আমিন খান, সাবেক নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব। বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিষ্ট ও খ্যাতিমান বক্তা।

৩৮। আলহাজ্ব হযরত মাওলনা আব্দুল্লাহ তাহের, অধ্যক্ষ, আটরশি দরবার শরীফ কামিল মাদরাসা, ফরিদপুর।

৩৯। আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবু নছর জিহাদী, মুহাদ্দিছ, আটরশি দরবার শরীফ কামিল মাদরাসা, ফরিদপুর।

৪০। আলহাজ্ব হযরত মাও. উসমান গনি, ময়মনসিংহ। প্রধান মুফতি, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

৪১। মরহুম আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোক্তার হোসাইন, সাবেক অধ্যক্ষ, মুক্তাগাছা কামিল মাদরাসা, ময়মনসিংহ।

৪২। আলহাজ্ব মাওলানা হেলাল উদ্দীন, খতিব, ষাটগম্বুজ জামে মসজিদ, বাগেরহাট, খুলনা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা।

৪৩। আলহাজ্ব মাওলানা সুলতান আহম্মদ নূরী, অধ্যক্ষ, হাসা ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

৪৪। মরহুম হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম নক্সবন্দী, ফরিদগঞ্জ, সাবেক অধ্যক্ষ, ধানুয়া, ইসলামিয়া সিনিয়র ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা, চাঁদপুর।

৪৫। মাও. হাফেজ সাঈদুর রহমান মোখলেছী। অধ্যক্ষ, খিলক্ষেত ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা এবং খতিব মসজিদে গাউছুল আযম, টিবি গেইট, মহাখালী, ঢাকা।

৪৬। ড. আবু বকর ছিদ্দিক, মুজাদ্দিদে আলফে সানীসহ বহু গ্রন্থপ্রণেতা ও সাবেক পরিচালক, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৪৭। মাওলানা সালাহ উদ্দিন, অধ্যক্ষ, সৈয়দপুর আলিয়া মাদ্রাসা, রংপুর।

৪৮। আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ, অধ্যক্ষ, ভাগড়া দারুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা, বরুড়া, কুমিল্লা।

৪৯। মাওলানা মাজেদুর রহমান, অধ্যক্ষ, পাবনা পুষ্পপাড়া আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা সদর, পাবনা।

৫০। মরহুম হযরত মাওলনা সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ, হোসেনপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, বন্দর, নারায়নগঞ্জ।

৫১। হযরত মাওলানা ফখরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, নূনীয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা, শাহরাস্তি, চাঁদপুর।

৫২। মরহুম অধ্যাপক ডক্টর রুহুল আমিন, সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইন্তিকাল, কাফন ও দাফন

মহান রব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অবধারিত মৃত্যুর অমোঘ বিধান সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে :

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

অর্থ : তুমি রক্ষিত দূর্গে আবদ্ধ থাক বা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাকে পাবেই।[২৭]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

অর্থ : তোমার যখন সুনির্দিষ্ট সময় হয়ে যাবে তখন এক মুহূর্তও কম বেশী করা হবে না।[২৮]

সুতরাং পৃথিবীর চির সত্য ও নিত্যসত্য হলো মৃত্যু। যে কোন প্রাণীকে মৃত্যুর নিকট নত শির করতেই হবে। অনেক মানুষ মৃত্যুতে হতাশা ব্যক্ত করেন। বস্তুতঃ আমরা বেঁচে থাকছি সম্পূর্ণ অলৌকিক ভাবে মহান আল্লাহর বিশেষ ও অশেষ রহমত, অনুগ্রহ ও করুণায়।

তারই ধারায় আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর জীবন সন্ধিক্ষণে এসে কিছুকাল কুষ্ঠ রোগের প্রাদুর্ভাব জনিত কারণে শায়খুল হাদীস অবস্থায় দ্বিতীয় পর্যায়ে জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদরাসায় দায়িত্ব পালনকালীন কিছু কষ্টে ভুগেছেন। একাকি তাঁর চলা-ফেরা সম্ভব ছিল না। তাঁর খিদমতে সর্বদা একজন সাথে অবস্থান করতে হতো। এ ক্ষেত্রে তাঁর সাথে তাঁর একান্ত খাদিম হিসাবে দ্বিতীয় পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান শাহাজাদা মোহাম্মদ জহিরুল করিম ফারুক ছিলেন। এছাড়া তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন কোন সময় জামিয়ার ২/৪ জন শিক্ষার্থী তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। অবশ্য সাধারণত অধ্যয়ন, অধ্যবসায় ইত্যাদির জন্য তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মরহুম ফেরদাউস আরা সুরাইয়া সর্বদা পাশে ছিলেন। কিন্তু কখনো ওয়ায-নসিহত, বাহাস, মুনাযারা, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, বড় কোন জামাতে শরীক হওয়া ইত্যাদি ঘর বহির্ভূত কাজের জন্য তাঁর সেবক প্রয়োজন ছিল এবং সেবকগণের সেবা গ্রহণ করেই তিনি চলাফেরা করতেন।

---

২৭. আল-কুর'আন, ৪ : ৭৮

২৮. আল-কুর'আন, ৭ : ৩৪

৩০শে মার্চ, ১৯৮৭ ইং সন এর ২/১দিন পূর্ব হতেই তাঁর শারিরীক অবস্থা একটু দুর্বল হতে থাকে। তিনি যেন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন এরূপ ভাব শরীরে উপলব্ধি করতে থাকেন। এবং স্বপ্ন যোগে বিভিন্ন আকার ইঙ্গিত ইত্যাদি পেতে থাকেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছিলেন না। তাঁর পক্ষে আর পূর্বের ন্যায় চলাচল সম্ভব ছিল না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জ্বর, কাশি, মাথাব্যথা, কুষ্ঠ রোগের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি তাঁকে আকড়ে ধরলে তিনি ১১ই এপ্রিল ১৯৮৭খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১৩ দিন অসুস্থতা নিয়ে চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসায় তাঁর জন্যে নির্ধারিত বাসভবনে অবস্থান করে চিকিৎসাধীন ছিলেন।[২৯]

তৎকালীন মার্চের স্বৈরাচার এরশাদ শাহী বিরোধী হরতাল অবরোধের মাঝেও তিনি তাঁর স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র মো. জহিরুল করিম ফারুককে নির্দেশ দেন যাতে ১১ তারিখের মধ্যেই তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু জ্বালাও পোড়াও, হরতাল অবরোধ ইত্যাদির মাঝে কিভাবে ঝুঁকি নিয়ে বাড়ি আসা হবে তা ভেবে তারা যখন ব্যাকুল, ঠিক তখনই তাঁর নির্দেশে জনাব জহিরুল করিম ফারুক বাসার সম্মুখে বের হতেই একটি বেবি টেক্সি পেয়ে যান, তাঁর সাথে তৎকালীণ ৯০০/- (নয়শত) টাকায় লক্ষ্মীপুর আসার কথা পাকাপাকি করে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) কে নিয়ে স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ভাতিজা মুদাচ্ছের হোসেন মোট ৩ জন তাঁকে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে চট্টগ্রাম বারিয়াহাট পৌঁছাতে দুপুর হয়ে যায়। আল্লামা নকশবন্দীর নির্দেশে এখানে ভাল হোটেলে ড্রাইভারসহ সকলে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য প্রবেশ করলে তিনি নির্দেশ দেন গরুর কলিজা দিয়ে সকলকে খাবার দেয়ার জন্য। সেভাবেই পরিবেশন করা হয়। তিনি সকলের সাথে গরুর কলিজা দিয়ে পেটপুরে খাবার খেয়ে তাইয়াম্মুম করে ইশারায় জোহর সালাত আদায় করে পুনরায় বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে তাইয়াম্মুম করে ইশারায় আসর ও মাগরিব সালাত যথাসময়ে আদায় করে ইশার নামাযের সামান্য পূর্বে বাড়ি এসে পৌঁছান। বাড়ি এসে অযু করে সালাতুল ঈশা আদায় করেন। এ জাতীয় অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করতে হয়নি।

বাড়িতে এসে ১১ই এপ্রিল ১৯৮৭ইং দিবাগত রাত হতে তাঁর শারিরীক অবস্থা যেন আরো খারাপ হচ্ছিল। শরীর দূর্বল হতে থাকে। ঠিক বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন তাঁকে দেখতে আসেন। তাঁর অসুস্থতার অবনতি দেখে অবশেষে আত্মীয়-স্বজনগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি হতে তাঁকে ১৭ই এপ্রিল ১৯৮৭ রায়পুর মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যায়। রায়পুর মেডিকেলের উদ্দেশ্যে নেয়ার জন্য বের করার সময়ে তিনি সকলকে জানালেন যে, "তোমরা আমাকে কোথাও নিওনা, এতে কোন কাজ হবে না, কারণ আমি সুস্পষ্ট ভাবে দেখছি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার জন্য শরবতের

২৯. ফেরদৌস করিম দরবেশ, প্রাগুক্ত, তারিখ : ৩১/০৫/১৬ খ্রি.

পেয়ালা নিয়ে দাড়িয়ে আছেন। আমার সময় শেষ, শত চেষ্টা করেও আমাকে তোমরা রাখতে পারবে না।"

তারপরও আত্মীয়-স্বজনের মনে বুঝেনি। তারা তাঁকে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসা তাঁকে সুস্থতো করেইনি বরং রোগ আরো বেড়ে যেতে থাকে। রায়পুর হাসপাতালে ১৮ এপ্রিল ১৯৮৭ ইং তারিখ পার হলে অসুস্থতার পরিস্থিতি অবনতিশীল দেখে ১৯ এপ্রিল ১৯৮৭ইং সকালে তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু, তিনি বরাবরই বাধা দিয়ে আসছিলেন যে, কোন লাভ হবে না আমাকে মেডিকেলে নিয়ে। তথাপি ১৯ এপ্রিল ১৯৮৭ রোজ রবিবার সকালবেলা তাঁর দ্বিতীয় পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব জহিরুল করিম ফারুক, মেজভাই মফিজ উল্যা মিঞা, ভাতিজা মোস্তাফিজুর রহমান, ছোট শালা মাইনুল হাসান মানু এবং বড় সমন্দীর সেজ ছেলে মাসুদ শাহজাহানসহ কয়েকজন মিলে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে ভাল চিকিৎসা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এম্বুলেন্স সংগ্রহ করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি বার বার নিষেধ করলেও তারা আল্লামা নক্সবন্দীর (রহ.) কথা না শুনে এ্যম্বুলেন্সে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে রওয়ানা হন।

পথিমধ্যে রায়পুর পার হয়ে তাঁর বাড়ির এলাকা শেষে লক্ষ্মীপুর পৌঁছা মাত্র তিনি সবাইকে বললেন, আপনারা উচ্চস্বরে সালাত-সালাম ও কালেমা পড়ুন। এ অবস্থায় চন্দ্রগঞ্জ পার হয়ে গাড়ি কেন্দুরবাগ বাজার পার হলে, তিনি পানি তালাশ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব শাহজাদা জহিরুল করিম ফারুক চাহিদানুযায়ী পানি পান করান। পানি পান করানোর সাথে সাথেই উচ্চস্বরে সালাত ও সালাম পড়ে কালিমা তায়্যিবা শরীফ উচ্চারণ করেন। তাৎক্ষণাৎ এম্বুলেন্সের পিছনের দুটি চাকা বসে যায়। গাড়ি আর সামনে চলেনি। গাড়ি বসে যেতে না যেতেই তাঁর রূহ মুবারক দেহ হতে আলাদা হয়ে যায়। তিনি ইনতিকালের চিরধার্য বিছানায় শুয়ে পড়েন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। এদিন ছিল ১৯ শাবান, ১৪০৭ হিজরী এবং ৫ বৈশাখ ১৩৯৪ বাংলা।

তারপর ড্রাইভার নেমে গাড়ি দেখেশুনে পুনরায় চালূ দিলে গাড়ি আবার সচল হয়। ইতিমধ্যে তাঁর ভাতিজা মোস্তাফিজুর রহমান চৌমুহনী বাজারে গিয়ে তারবার্তা অফিস হতে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মীয়-স্বজনকে তাঁর ইনতিকালের সংবাদ প্রদান করেন। বড় সমন্ধীর ছেলে মাসুদ শাহজাহানকে লোকাল গাড়িতে দ্রুত বাড়ি পৌঁছে সংবাদ দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। এভাবে বিদ্যুৎ গতিতে তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে আরেকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায় আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় যেখানে বাবার কবরের পাশে শুয়ে আছেন। সেখানে একটি বড় নারিকেল গাছ দাড়িয়ে ছিল। নক্সবন্দী (রহ.) ইনতিকালের এক সপ্তাহ পূর্বে তাঁকে চট্টগ্রাম হতে বাড়ি নিয়ে আসার ২/৩দিন পূর্বে তাঁর মেজভাই জনাব মফিজ উল্যা মিঞা ঐ নারিকেল গাছটি কেটে উপড়ে ফেলতে গেলে মাটির উপর দিয়ে গাছের চতুর্পার্শ্বে কুড়াল দিয়ে ১টি করে

কোপ দেয়ার পর পরই গাছটি আপন গতিতে মূলসহ উঠে পড়ে। আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) চট্টগ্রাম হতে এসে বেবিটেক্সিতে থাকা অবস্থায় পিতার কবর যিয়ারত করতে গিয়ে উক্ত স্থান দেখে বলে দিলেন, "এই স্থানে আমি শয়ন করবো।" ঠিক সেখানেই তিনি বর্তমানে শায়িত আছেন।

১৯ এপ্রিল, ১৯৮৭ ইং দুপুরে ইনতিকাল করলেও আত্মীয়-স্বজনের আগমনের জন্য পরদিন ২০ এপ্রিল, ১৯৮৭ ইং রোজ সোমবার বাদ আসর নামাযে জানাযার সময় নির্ধারণ করা হয়। চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীগণসহ ৬ টি বড় বাস ভর্তি লোকজন দেশের আনাচে কানাচের তাঁর আত্মীয় স্বজন, ভক্তবৃন্দ, প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ মিলে পরদিন সোমবার বাদ আছর লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে তাঁরই নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত বাড়ির প্রাঙ্গনস্থ এনায়েতিয়া দাখিল মাদরাসার মাঠে এ মহান ব্যক্তিত্বের জানাযা সালাত অনুষ্ঠিত হয়।

সালাতুল জানাযার পূর্বে গোসল দেয়া হয় বাড়ির প্রাঙ্গণস্থ মসজিদের মাইয়েত ধৌত করার জায়গায়। তারপর সুগন্ধি আতর, গোলাপ, লোবান ইত্যাদির সংমিশ্রণে সাদা কাপড়ের কাফন পরানো হয়। কাফনের কাপড় পরানো শেষে তাঁর চেহারা এমন হলুদ আকৃতি ধারণ করে যে, মনে হয় যেন সূর্যের আলো বিকিরণ করছিল। চেহারায় একটি নূরানী আলোকচ্ছটার আবহ বিরাজিত ছিল। তাঁকে এক নযর দেখে প্রত্যেকেই সেদিন সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, "তিনি আসলেই ইলম, আমল ও তরীকত জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ও খুবই ভাল মানুষ ছিলেন।"

ত্যার বিশাল নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন তৎকালীন ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ও মরহুমের ১ম পরিবারের ১ম কন্যার স্বামী বড় জামাতা আলহাজ্ব মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব। জানাযা তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার আঙ্গিনা পেরিয়ে মাদরাসার পূর্ব পার্শ্বস্থ সি এন্ড বি এর পাকা সড়কের দক্ষিণ দিকে জগন্নাথ ভূঁইয়ার দিঘি এবং উত্তর দিকে মাইলের মাথা স্টেশন সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লোকে লোকারাণ্য জানাযাস্থল যেন তিল ধারণের জন্যও কোন ঠাঁই ছিল না। আল্লাহর অশেষ রহমতে এত বিশাল জানাযা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে চতুর্দিকে মুকাব্বিরের ধ্বনিতে সম্পন্ন হয়।

দাফন

এ বিশাল আকারের নামাযে জানাযা সম্পন্ন হলে আগ্রহী মুসল্লীগণ তাঁকে কবরস্থ করার জন্য এগিয়ে আসতে থাকেন। কিন্তু মসজিদের মাইক দিয়ে ঘোষণা দেয়া হয় যে, জানাযা শেষে প্রত্যেকে যেন স্ব-স্ব গন্তব্যস্থলে ফিরে যান। কেননা, ইতিমধ্যে জানাযা উপলক্ষ্যে সি এন্ড বি এর রায়পুর লক্ষ্মীপুর পাকা মহাসড়কে দীর্ঘ পথ পর্যন্ত ভীষণ যানজট লেগে যায়। সে জন্য অবস্থা বুঝে প্রত্যেককে স্বীয় গন্তব্যে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়ায় পরিস্থিতি স্বল্প সময়ে নিয়ন্ত্রণে আসে। নতুবা অবশ্যই তা সামাল দেয়া অতীব কষ্টকর হয়ে যেত।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, মাইকের ঘোষণা শ্রবণে জানাযা নামায শেষে অধিকাংশ মানুষ বাসে, ট্রাকে, বেবীটেক্সী, রিক্সা, সাইকেল ও পায়ে হেটে স্ব স্ব গন্তব্যে ফিরে যান। স্বজনরা কোন প্রকার বেগহীন ভাবেই সকল চাপ সামলাতে সক্ষম হন। তবুও তাঁর আন্তরিক ভক্তগণ, দীর্ঘ দিন হতে স্নেহশীল শিক্ষার্থীগণ, প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি মিলে কয়েক হাজার মানুষ তাঁকে কবরে রাখার পর মাটি দিয়ে সুন্দর কবর খানা ভরাট করে দেন। অত্যন্ত সুন্দরভাবে কবরস্থকরণ সম্পন্ন হয়। এমন বৈশাখ মাসের গরমের দিনেও তাঁর শরীর ধোয়ার পর সামান্যতম ঘাম দেয়নি এবং কবরে কোন চা-পাতা বা ধানের ভূষি ইত্যাদি দিতে হয়নি। গ্রীষ্মকালে সাধারণত এসব বস্তু কবরে দিয়ে কবরকে গরমমুক্ত রাখতে হয়।

সুন্দর সুচারুরূপে কবরস্থ করণ সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁরই বড় জামাতা মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া) উপস্থিত সহস্র জনতাকে নিয়ে তাঁর মাগফিরাত কামনা করে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান নির্ধারণের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া-মুনাজাত পরিচালনা করেন।

তাঁর ইনতিকালের পর হতেই প্রতি বছরই তাঁর বাড়ির আঙিনাস্থ মাদরাসা প্রাঙ্গনে ওয়ায-নসিহত, মিলাদ মাহফিল ও তাবারুক বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। সহস্র সহস্র লোকজন উক্ত মাহফিল সমূহে উপস্থিত থাকেন। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের ওলামায়ে কিরামগণ উক্ত মাহফিলে আলোচনা ও ওয়ায নসিহত পেশ করে থাকেন। বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের আলোচনায় জনগণ কুরআন হাদীসের বাণী শ্রবণে ইলম ও আমলের দীশা লাভ করেন। এবং সেগুলো অনুসরণ করে পার্থিব ও আখিরাতের অশেষ সাওয়াব অর্জনের সুযোগ লাভ করেন।

তাঁর ইনতিকালান্তে ২য় স্ত্রী ফেরদৌস আরা সুরাইয়া এবং সন্তান-সন্ততিগণ বার বার তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন। তাঁর স্ত্রীর স্বপ্নের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তরে জানতে পেরেছেন যে, আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) ভাল আছেন। তিনি বেশ সুখ ও শান্তিতে আছেন বলে জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমরা এ দোয়াই করি। ফরিয়াদ করি মহান আল্লাহ যেন তাঁর দরজাকে বুলন্দ করেন। এবং সমগ্র জীবনের দ্বীনি খিদমতের উত্তমরূপে প্রতিদান প্রদান করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) -এর অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ : লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাগ্মীতার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সম্মুখ মুনাযারার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : চরিত্র ও কারামাতের প্রভাব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আদর্শ ও সফল শিক্ষকতা, পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষানুরাগ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) এর অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার

বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আশিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.) ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বহুমাত্রিক অবদান রেখে গেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অনুপম চরিত্র, মার্জিত আচরণ আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী বাগ্মিতা, চৌকষ নেতৃত্ব গুণ, মানবিক সহায়তাবোধ, তীক্ষ্ণ মেধা, উন্নত ধীশক্তি, নৈতিক উৎকর্ষতা, জনহীতকর মনোবৃত্তি, অক্লান্ত সাধনা, গভীর অধ্যয়ন, যুক্তি-তর্কে অকুতভয় মানসিকতা, কুরআন-হাদীসের অগাধ জ্ঞান, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে ব্রতী ও তৎপরতা, শিক্ষকতায় মহত্ব এবং শিক্ষানুরাগী চিন্তাধারার প্রভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার তাঁর জন্য অতীব সহজ সাধ্য ছিল। তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় যেমন মানুষকে ইসলাম ও তাঁর নৈতিকতায় আগ্রহী করে তুলতেন, তেমনি তাঁর হাতে গড়া শিক্ষার্থীগণকে তিনি ইসলাম ও দ্বীনের প্রসারে আদর্শ ব্যক্তিত্বের নমুনায় গড়ে তুলতেন। তাঁর হাতে গড়া শত সহস্র শিক্ষার্থী অদ্যাবধি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আবদান রেখে চলেছেন। তাঁর বাগ্মী যশে দূর দূরান্ত হতে জনগণ এসে ওয়ায নসিহত শ্রবণসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে আগ্রহসহ শ্রবণে ব্রতী হতো। মানুষের মাঝে স্রষ্টা প্রদত্ত কোন দানের ভিত্তিতেই যেন তাঁর প্রতি মানুষ অনুগত ও অনুরক্ত ছিল, তাঁর স্নেহধন্য সাহচর্যে তাঁরই হস্তে গড়া শিক্ষার্থীগণ হতেন আদর্শ মানুষ। তাদের পরিবার-পরিজনও পিতা-মাতাগণ তাঁর আন্তরিকতার কথা অবগত হয়ে তাঁর প্রতি অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাতেন। সকলে ধীরে ধীরে হয়ে উঠতেন তাঁর প্রতি উদার ও আগ্রহশীল, ফলে তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান নিতে সক্ষম হতেন।

আরবী, উর্দু, ফার্সী, হিন্দী, ইংরেজি ভাষায় সুদক্ষ আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদানে ছিলেন অতীব পারদর্শী, তাঁর সকল আলোচনা ছিল মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ। তাঁর ভাষা চয়ন, প্রজ্ঞা, আলোচনা কৌশল ইত্যাদি ছিল বাস্তবিকপক্ষে মানুষের হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক। তাঁর বক্তব্যে প্রবাদ উপস্থাপন, বিভিন্ন আকর্ষণীয় উদাহরণরাজি, উপমার সাঠিক ও যথাযথ ব্যবহারে তিনি তাঁর আলোচনা, বক্তব্য ইত্যাদিকে মনোমুগ্ধ করে তুলতেন। মানুষের তা শুনার প্রতি বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হতো। ১৯৫৬ইং সালে শিক্ষকতার মহান পেশার মাধ্যমে কর্মজীবন আরম্ভ করার মধ্য দিয়ে তিনি মূলতঃ আমৃত্যু একই পেশায় ব্রতী ছিলেন।

এমনকি শিক্ষকতার মহান পেশায় সাধনা করে তিনি ইনতিকাল পূর্ব সময়ে 'শায়খুল হাদীস' উপাধি লাভে সক্ষম হন। একজন আদর্শ শিক্ষকরূপে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। তিনি শ্রেণি কক্ষে প্রবেশের সাথে সাথে শ্রেণিতে বিরাজ করতো পিন পতন নিরবতা, শিক্ষার্থীবৃন্দ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট থাকতেন, তাঁর ব্যক্তিত্বে সকলেই অভিভূত হতেন। প্রতিটি শিক্ষার্থী তন্ময় চিত্তে তাদের মহান শিক্ষকের চেহারার পানে চেয়ে থাকতেন তীর্থের কাকের ন্যায়। মনে হচ্ছে যে, যেন নতুন কিছু তারা পাচ্ছেন। পাঠের শিরোনাম আলোচনার প্রারম্ভে পাঠের মূল বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করে তিনি শিক্ষার্থীদের খোঁজ খবর নিয়ে মৌলিক পাঠদান আরম্ভ করতেন।

শিক্ষার্থী বান্ধব এমন একজন নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মনীষীর এহেন আচরণ ও তৎপরতায় শিক্ষার্থীদেরকে তাদের এ মহান শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত করেছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের নয়ন মনি। তাঁর দুঃখে সকলে হতেন দুঃখী আর তাঁর সুখে সকলেই হতেন।

শিক্ষকতার মহান পেশার পাশাপাশি তিনি লেখনীর ক্ষেত্রে খুবই ক্ষুরধার তৎপরতায় ব্রতী ছিলেন। দেশের জাতীয় কোন সমস্যা বা আন্তর্জাতিক কোন বিষয় যখন বিতর্কের সূত্রপাত ঘটাতো, তখন তিনি স্বেচ্ছায়-নিজগুনে স্ব উদ্যোগে ঐ বিতর্কিত বিষয়ের উপর বুকলেট, চিঠি, হ্যান্ডবিল, সাময়িকী দুটি কথা, সাম্প্রতিক বিতর্কের সমাধান নামে কুরআন, হাদীস, ইজমা, ক্বিয়াসের ভিত্তিতে ইসলামের বাণীসহ বিতর্কের অবসান কল্পে সমাধান উপস্থাপন করে জাতিকে একটি সঠিক ও যথার্থ ধারায় পরিচালিত হওয়ার দিক-নির্দেশনা দিতেন। তার দিক-নির্দেশনার আলোকে তার সমসাময়িক সরকার ওলামায়ে কিরাম যাবতীয় বিভ্রান্তিমুক্ত থাকতেন। বিশেষতঃ উলামায়ে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাত অত্যন্ত নিরাপদে অবস্থান করে সকলেই যেকোন বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর সমাধানের অপেক্ষা করতেন এবং তার হস্তক্ষেপে প্রাপ্ত সমাধান তারা সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করতেন।

আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) ইসলামের মৌলিক বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। স্বীয় জীবনের পুরো অংশই তিনি ইসলামী জ্ঞান সাধনায় অতিবাহিত করেন। তাঁর সমসাময়িক কালে তিনি তৎকালীণ বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লক্ষ্মীপুর জেলার টুমচর ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসায় অবৈতনিক শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।

পরবর্তীতে ভোলা আলীয়া মাদরাসা, পটুয়াখালী পাঙ্গাসিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম জামেয়া আহম্মদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদরাসা, কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসা ও ঢাকাস্থ কাদেরীয়া তৈয়্যেবিয়া আলীয়া মাদরাসাসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি অধ্যাপনা করেন। শিক্ষকতায় তিনি অত্যন্ত সফল ও উচ্চমানের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিল অতীব উন্নত স্তরের।

অধ্যপানার মহান পেশার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। যা পাঠক সমাজে বিশেষত সুন্নী আক্বীদা সম্পন্ন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে, মাদরাসা, মসজিদ, মক্তবসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী ও স্কলারদেরকেও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন।

সর্বোপরি ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় তিনি অজস্র মানুষকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদির প্রতি মানবতার দৃষ্টি আকর্ষনে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। দেশের চট্টগ্রাম হতে সুদুর সাতক্ষীরা পর্যন্ত খুঁজে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ১৩ (তের)টি গ্রন্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এগুলো হলো:

১. তাকারীরে সহীহ বুখারী- ১ম খণ্ড
২. তাকারীরে সহীহ বুখারী- ২য় খণ্ড
৩. জশনে-জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছালাতু ছালাম
৪. কালেমাতে কুফর (কর্মে ও কথায় আহলে কেবলাও কাফের হয়)
৫. ২৯৯ নামে ছালাতু ছালাম
৬. ফেরেশতাগণের ইতিহাস (জন্ম, মৃত্যু-কর্মজীবন)
৭. আদর্শ চরিত্র ও দাম্পত্য জীবন
৮. সহীহ আকায়েদ ও ভ্রান্ত মতবাদসমূহের তালিকা
৯. লন্ডনস্থ হেজাজ কনফারেন্স
১০. বাতিল কারা তাদের পরিচয়
১১. বদরপুরের বাহাস
১২. ইলিয়াছী ধর্ম থানবীর আক্বিদা মওদূদী মতবাদ
১৩. মওদূদীর মৃত্যু ও মৃত্যুর প্রকারভেদ

এ ছাড়াও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মাঝে আলওক্বাফ আলাল কাশ্‌শাফ, তাকারীরে সুনানে সালাছাহ, শীয়া ধর্ম ও দুটি বাতিল দল গ্রন্থাবলী বহু খোঁজাখুঁজির পরও হস্তগত করা সম্ভব হয়নি। তবে, সেগুলো যে কোন সময় হস্তগত হলে তা সংযোজন করা হবে।

হস্তগত হওয়া ১৩ টি গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে নিম্নে পর্যালোচনাসহ উপস্থাপিত হলো–

تقارير صحيح بخارى

جلد اول

مؤلف: علامة جناب مولانا محمد فضل الكريم
صاحب فقشبندى مجددى

سابق شيخ الحديث كرامتية عالية مدرسة, نواخالى

سابق فرنسيفل كوملا عالية مدرسة

ناشر- فردوسية لائبر يرى

بوست اسكول رود- كوملا

মহান আল্লাহ তায়ালার অমীয় বাণী মহাগ্রন্থ আল-কু'আনের পর পরই সহীহ ও বিশুদ্ধ ছয়খানা গ্রন্থের অন্যতম ও তালিকায় সর্বপ্রথম হলো 'সহীহ বুখারী'র নাম। আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) কুমিল্লাস্থ চকবাজার আলীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ থাকাকালীণ উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁরই পরামর্শ ও সহযোগিতায় পরিচালিত কুমিল্লা শহরস্থ স্কুল রোডের ফেরদৌসিয়া লাইব্রেরীর অধীনে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। যদিও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থটির মাঝে প্রকাশনার কোন সময় উল্লেখ নেই। তবুও একথা বলা যায় এ প্রকাশনা সম্ভবত তাঁর কুমিল্লা আলীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে অধ্যাপনাকালীন ১৯৬৩-৭৩ সালের মধ্যেই হবে। কেননা, কুমিল্লা জেলা স্কুল রোডে তখন তাঁর বড় জামাতা মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে ফেরদৌসিয়া লাইব্রেরী পরিচালিত হতো। সে সময়ই তিনি এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[১]

গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা

আশিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) ইমাম বোখারী (রহ.) কে বার বার স্বপ্নে দেখেছেন। এমন কি তাঁর মৃত্যুর পূর্বেও স্বপ্নে দেখেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর জন্য শরবতের পেয়ালা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এ সকল কারণে তিনি আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতেই ইমাম বুখারী (রহ.) প্রণীত সহীহ বুখারী শরীফের উর্দু

১. মুহাম্মদ মোদ্দাচ্ছের হোসেন, অফিস সহকারী, সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সরাসরি কথা, তারিখ : ২২/০৫/২০১৬ খ্রি.

তাকরীর লিপিবদ্ধ করেন।[২] তাঁর উক্ত তাকরীর তৎকালীন সর্বশ্রেণির শিক্ষার্থীর নিকট সমাদৃত হয়। সকলেই তাঁর উক্ত উর্দু বই পড়ে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ভাল ফলাফল পেতে শুরু করেন। সে মুহূর্তে এমন একটি সময় ছিল যে, বৃটিশ আমলের শেষে পূর্ব পাকিস্তানে সহীহ বুখারীসহ হাদীস ও তাফসীরের সুন্দর সাজানো কোন প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক বই পরিলক্ষিত হতো না। ফলে, তিনি যখন উক্ত গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেন, তখন সর্ব শ্রেণির নিকট তা সমাদৃত ও গৃহীত হয়।

তাক্বারীরে সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্য

তাক্বারীরে সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড গ্রন্থখানি তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মাঝে অন্যতম ও প্রসিদ্ধ। উক্ত গ্রন্থের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হল :

১. গ্রন্থখানি সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল উর্দু ভাষায় প্রণীত।
২. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক আলোচনা প্রণয়ন।
৩. প্রারম্ভ হতে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিটি জটিল বিষয়ে ফায়েদা উল্লেখ করে তার সহজতর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।
৪. পূর্ব বাংলায় তৎকালীন প্রণীত সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় বুখারী শরীফের তাকরীর যা ইতোপূর্বে হয়নি।
৫. সময় ও যুগের চাহিদার আলোকে তীক্ষ্ণ মেধাবী ও তুলনামূলক কম মেধাবী সকলের হৃদয়ঙ্গমোপযুক্ত করে প্রণয়ন করা হয়েছে।
৬. বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যার পরিবর্তে ফায়েদা কথাটি ব্যবহার করেছেন।
৭. প্রতিটি বিষয় পয়েন্ট আকারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের দলীলের ভিত্তিতে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।
৮. কিতাব ও বাব গুলো আলাদা ভাবে উপস্থাপন করে তারপর প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন করেছেন।
৯. কোন কোন বিষয়ে ইমামগণের মতামতের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত فتوى ও পেশ করেছেন।
১০. সর্বোপরি মতভেদপূর্ণ মাসয়ালা মাসায়েলের ক্ষেত্রে সকলের মতামত উল্লেখ সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পূর্ণ মতামত যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
১১. সুন্দর সাবলীল , হৃদয়গ্রাহী ও সহজে উপলব্ধি করা যায় এমন ভাষায় গ্রন্থটি প্রণয়ন করে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) তাঁর জ্ঞানের গভীরতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

---

২. শাহজাদা ফেরদাউস কারীম দরবেশ, প্রাগুক্ত, তারিখ : ২৯/০৫/২০১৬ খ্রি.

تقارير صحيح بخارى

جلد دوم- بترجم دوم

مؤلف

شيخ الحديث علامة محمد فضل الكريم نقشبندى مجددى

سابق شيخ الحديث والتفسير كرامتية عالية مدرسة نواكهالى

سابق صدر المحدثين، جامعة احمدية سنية عالية مدرسة، جاتغام

ناشر

فردوسية لائبررى- جامعة سنية رود- داك خانة- امين جوت ميل

محافظة جاتغام- بنغلاديش- ١٩٩٩ ع

جملة حقوق محفوظ

আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মাঝে তাকারীরে সহীহ বুখারী দ্বিতীয় খণ্ডটি চট্টগ্রাম জামেয়া আহম্মদিয়া সুন্নিয়ায় প্রধান মুহাদ্দিসরূপে যোগদানের পর প্রকাশ করেন। তিনি কুমিল্লা হতে চট্টগ্রাম স্থানান্তরকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ফেরদৌসিয়া লাইব্রেরীটি ও চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়। তিনি বাস্তব সমাজের চাহিদা ও শিক্ষার্থীগণের দাবীর আলোকে ইতোপূর্বে প্রথম খণ্ড প্রণয়নের পর ব্যাপক সাড়া পেয়েই দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে আগ্রহী হন।

উক্ত ২য় খণ্ডের বৈশিষ্ট্য

১. একটি সুন্দর সূচীপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
২. পবিত্র কাবা শরীফ ও মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ পরিবেষ্টিত করে গ্রন্থখানার প্রচ্ছদ তৈরী হয়েছে।
৩. বিভিন্ন কিছু **تحقيق** করে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।
৪. সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থখানা প্রণয়ন করা হয়েছে।
৫. প্রতিটি বিষয়েই যৌক্তিকভাবে কুরআন হাদীসের দলীল তুলে ধরা হয়েছে।
৬. প্রয়োজনে ফাতাওয়া দেয়া হয়েছে।

জশনে জুলুছে ঈদে-মিলাদুন্নবী
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও সালাতু-সালাম
লেখক
শায়খুল হাদীস, আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী সা.
রচনাকাল: ১৯৭৭ খ্রি.
প্রকাশক : পরিচালক, ইসলামী রিসার্চ সেন্টার
পশ্চিম নন্দপুর (করিমনগর)
পো. দালাল বাজার, জিলা- লক্ষ্মীপুর
ছাপাখানা : শওকত প্রেস, ৪১ কাটাপাহাড় লেইন, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম
বিশেষ সহযোগী : আলহাজ্ব জনাব মৌ. মুসলিম ভূইয়া ছা.
রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালী)
প্রকাশকাল : ১৯৭৮ খ্রি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬
মূল্য : ৩.০০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : ফেরদাউছিয়া লাইব্রেরী
জামেয়া ছুন্নিয়া রোড
পোষ্ট : আমিন জুট মিল, চট্টগ্রাম

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের পঞ্চম বছরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের মৌলিক বিষয়কে এড়িয়ে যেমন- আযান, ইকামাত, সালাত-সালাম, ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ নবীজী সাহাবীগণের শান-মান ইত্যাদি বিষয়ে অকারণে কটাক্ষ থাকে। ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) তাঁর সে লেখনীর মাধ্যমে নবীজীর প্রতি সালাত-সালামের গুরুত্ব তুলে ধরেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে যাবতীয় যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেন।

এ গ্রন্থখানা অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আরো ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।

বই খানার সর্বশেষ 'পরিশেষ' অংশে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিশ্বে আগমনের সংবাদে আবু লাহাব কর্তৃক তার দাসী ছুয়াইবাকে আযাদ করণ এবং আবু তালেব কর্তৃক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লালন পালনের ঘটনা বইটিকে গুণে ও মানে আরো অনেক বেশী সমৃদ্ধ করেছে। কেননা, উক্ত

ঘটনা পরম্পরা দ্বয়ের মাধ্যমে রাসূল আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মহত্ব আরো অধিক পরিমাণে বেড়েছে।

কলেমাতে কুফর
(কর্মে ও কথায় আহলে কেবলাও কাফের হয়)
রচনাকাল : তারিখ বিহীন
প্রকাশক : পরিচালক, ইসলামী রিসার্চ সেন্টার
করিম নগর (পশ্চিম নন্দনপুর)
পো. দালাল বাজার, জিলা- লক্ষ্মীপুর
প্রকাশকাল : তারিখ বিহীন
কৃত : বিশ্ব বরেণ্য আলেম, আলেমকুল শিরোমনি,
১০ সহস্রাধিক ওলামা ও মুদাররেস মোহাদ্দেসগণের যোগ্য ওস্তাদ,
পীরে তরীকত, শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)
সাইজ
পৃষ্ঠা সংখ্য : ১৪
মূল্য : ৩.০০ টাকা

আলোচ্য বইখানা আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়ে এক অনবদ্য সংগ্রহ, এ মহান ওলী সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীনগণসহ অদ্যাবধী কারা সঠিক আক্বীদার ধারক-বাহক এবং কারা এর বিপরীত তা অনায়াসেই নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করেছেন।

সাম্প্রতিককালে নবীজীর সমালোচনা করে কারা কুফরী করেছেন? এবং কারা নিকট অতীতে কাফের হয়েছেন এবং কারা ভবিষ্যৎকালে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী অগ্রাহ্য করে কি কি কারণে এ সকল আহলে কিবলা কাফের হবেন, তার বর্ণনা তিনি আলাদা আলাদাভাবে পয়েন্ট ভিত্তিক উপস্থাপন করেছেন। সর্বমোট ৬৭টি কারণে আহলে কিবলা কুফুরীতে লিপ্ত হয় বলে তিনি দাবী করেছেন।

সাথে সাথে ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোনা জেলার মাওলানা আলী আকবার আলী রেজভী (রহ.) এর একটি হুশিয়ারী সংকেত নামা উক্ত গ্রন্থের সাথে যুক্ত করে গ্রন্থখানিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। উক্ত গ্রন্থটি ঈমান আক্বীদা সুদৃঢ় করণে রেখেছে বিশেষ ভূমিকা।

মুহতারাম আলী আকবর রিজভী সাহেবের চ্যালেঞ্জে তিনি তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সকল মুসলমান ভাইগণের নিকট সুবিচার প্রার্থী হওয়ার মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী মুসলিম সমাজের ঈমান-আক্বীদা সুদৃঢ় করণে ভূমিকা রাখেন।

সেখানে সীরাতুন্নবী (সা.) সংকলন নামে জনৈক লেখক কর্তৃক রচিত বইয়ের অভ্যন্তরে যে সকল ঈমান নাশক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে তার জবাব প্রদান ও যুক্তিভিত্তিক উহা খণ্ড করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পয়েন্ট ভিত্তিক সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, সীরাতুন্নবী (স.) অনুসারীগণের ঈমান আক্বীদা ও বিশ্বাসের মাঝে এবং রাসূল (স.) কে প্রকৃত মুহব্বতকারীও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীগণের ঈমান আক্বীদার মাঝে বিশেষ ব্যবধান বিদ্যমান।

প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডনে সীরাতুন্নবী গ্রন্থের ত্রুটিযুক্ত পৃষ্ঠাসমূহের নম্বর উল্লেখ করে করে তিনি প্রতিটি ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেগুলোর সংশোধনী ও সঠিক উত্তর উপস্থাপন করে দিয়েছেন। আর প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, নবী প্রেমীগণ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান-আকীদা বিশ্বাসই ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক ও যথাযথ বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই কেবল একজন মুমিনকে দুনিয়া আখিরাতের মুক্তি দিতে পারে।

নবীয়ে রহমতের (দ:) ২৯৯ নামে সালাতু-সালাম
রচনাকাল : তারিখ বিহীন
প্রকাশক : পরিচালক, ইসলামী রিসার্চ সেন্টার
করিম নগর (পশ্চিম নন্দনপুর)
পো. দালাল বাজার, জিলা- লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালী)
প্রকাশকাল : তারিখ বিহীন
কৃত : শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী ছাহেব
প্রধান, হাদিস বিভাগ, জামেয়া আহমদিয়া ছুন্নিয়া আলিয়া, পো. আমিন জুট মিলস, চট্টগ্রাম
সাইজ : পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬
মূল্য অনুল্লেখিত
প্রাপ্তিস্থান : ফেরদাউছিয়া লাইব্রেরী
জামেয়া ছুন্নিয়া রোড
পো: আমিন জুট মিল, চট্টগ্রাম

উক্ত গ্রন্থে তিনি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে প্রদত্ত দুইশত নিরানব্বই নামে সালাত ও সালাম প্রদানের পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। এবং দুইশত নিরানব্বই নামে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি সালাম প্রদান করেছেন।

পুস্তকটির প্রারম্ভেই তিনি ভুল সংশোধনী উল্লেখ করে পাঠকগণকে উক্ত বই শুদ্ধভাবে সঠিক পন্থায় পাঠের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। সর্বমোট ১৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইয়ের

মাঝে ২১টি ভুলকে চিহ্নিত করে তিনি সেগুলোর শুদ্ধ ও সঠিক উচ্চারণ উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার লাইন নম্বর উল্লেখ করে তিনি যথাযথ উচ্চারণ পেশ করেন।

ফেরেশতাগণের ইতিহাস
(জন্ম-মৃত্যু ও কর্মজীবন)
রচনাকাল : তারিখ বিহীন
প্রকাশক : পরিচালক, ইসলামী রিসার্চ পাবলিকেশন, নাজির পাড়া, পো. আমিন জুট মিল্‌স, চট্টগ্রাম
প্রকাশকাল : অনুল্লেখিত
কৃত : শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী প্রধান মোহাদ্দেস, জামেয়া আহমদিয়া ছুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম
সহ-সভাপতি : আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাত, বাংলাদেশ।
সাইজ : পৃষ্ঠা সংখ্যা : ০৮
শুভেচ্ছা বিনিময় : ১.০০
প্রাপ্তিস্থান : ফেরদাউছিয়া লাইব্রেরী
জামেয়া ছুন্নিয়া রোড
পো. আমিন জুট মিল, চট্টগ্রাম

আলোচ্য পুস্তিকাখানি অতীব ক্ষুদ্র আট পৃষ্ঠার হলেও এতে ফেরেশতাগণের জন্ম, মৃত্যু, ফেরেশতাগণের কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন দিক ও বিভাগ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে তিনি উপস্থাপন করেছেন।

পুস্তকটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হতে পঞ্চম পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফেরেশতাগণের জন্মের এগারটি মতবাদ ভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করেছেন। প্রত্যেকটি দলীলেই সলফে সালেহীন, আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন, সাহাবা কিরাম ও মুহাদ্দিসগণের সুস্পষ্ট মতামত তুলে ধরেন।

অতঃপর পঞ্চম পৃষ্ঠা হতে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৃষ্ঠাদ্বয়ে তাদের মৃত্যু সংক্রান্ত যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। উক্ত আলোচনায় তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফেরেশতাগণের মৃত্যুর বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

পুস্তকখানার ষষ্ঠ পৃষ্ঠা হতে অষ্টম পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফেরেশতাগণের কাজ নিয়ে তিনি বেশ যুক্তিপূর্ণ ও যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন, ফেরেশতাগণের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশায় বিভক্ত ও নিয়োজিত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আর তাদের সংখ্যা কেবলমাত্র আল্লাহর হাবীব ও মহান আল্লাহই অবহিত। এ ব্যতীত কোন শক্তিরই সে বিষয়ে জ্ঞান নাই।

এরপর সর্বশেষ পয়েন্টে এসে নবীয়ে রহমাত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দুরুদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে যে ফেরেশতাগণের সৃষ্টি হয় তাও তিনি উপস্থাপন করেছেন। এবং সে দুরুদ শরীফ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অতীব মোহাব্বতের সাথেই পাঠ করতে হয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে হুজুরে পাক হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
আদর্শ চরিত্র
ও
দাম্পত্য জীবন
রচনাকাল : তারিখ বিহীন
প্রকাশক : পরিচালক, আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদীয়া ছুন্নিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম
প্রকাশকাল : তারিখ বিহীন
কৃত : আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী
শায়খুল হাদীস, জামেয়া আহমদিয়া ছুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম
সাইজ : পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩১
শুভেচ্ছা বিনিময় : ৫.০০
মুদ্রণে : কোহিনুর ইলেক্ট্রিক প্রেস, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
প্রাপ্তিস্থান : ফেরদাউছিয়া লাইব্রেরী
জামেয়া ছুন্নিয়া রোড
পো. আমিন জুট মিল, চট্টগ্রাম

প্রেক্ষাপট : আলোচ্য পুস্তককানি লিখনের প্রধান ও ঐতিহাসিক একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। যে প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) আলোচিত গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করেছেন।

তৎকালীন নাস্তিক, খোদাদ্রোহী, পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও নবীজীর চরম ও চিরশত্রু, কপট কুখ্যাত যালিম, মুমিনের দুশমন আহসান উল্যা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক আ.র.ম. এনামুল হক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রে কালিমা লেপনের উদ্দেশ্যে তাঁর বৈবাহিক ও দাম্পত্য জীবন নিয়ে কটাক্ষ করে। তারই প্রতিবাদে আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী (রহ.) গ্রন্থখানা রচনা করেন।

জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা যে মহান ওলীয়ে কামিলের নামের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরই স্মরণে উক্ত পুস্তকখানি উৎসর্গ করেন। তিনি হলেন শাহ সুফী হাফেজ মাওলানা ছৈয়দ আহমদ শ্রীকোটি (রহ.)।

ত্রিশ পৃষ্ঠা সম্বলিত উক্ত বইটিতে উনিশটি পয়েন্টে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিষয়ে বিভিন্ন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মনীষীর মতামতসমূহ তুলে ধরে অতঃপর নবীজীর শান ও মানকে অক্ষুণ্ন রেখে অতীব সুন্দর সাবলীল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তকখানি উপস্থাপন করেছেন।

বইখানির অভ্যন্তরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও মনীষিগণের বক্তব্যসহ উম্মুল মোমেনীন, সাহাবা আযমাইন (রা.) রাসূল প্রেম ও মহব্বত-ভালবাসার নমুনা উদাহরণসহ তুলে ধরা হয়েছে। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একাধিক বিবাহের উদ্দেশ্য, রহস্য এবং বিভিন্ন স্ত্রীগণের মাঝে হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিবাহের বিশেষ ঘটনা এতে সবিশেষ স্থান পায়।

গ্রন্থখানি সমাপ্তির কিছুটা পূর্বলগ্নে একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে জানিয়েছেন যে, পৃথিবীতে একমাত্র ব্যক্তিত্ব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যিনি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয় লিখে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

আর সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের যাবতীয় দিক ও বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে হাদীস শরীফে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর নবীজীর এ নির্দেশনার কারণ ছিল এ যে, তিনি জানতেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন হবে বিশ্ব মানবতার জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় এক মহান আদর্শ যার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তা সকলেই অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

পরিশেষে উপসংহারের মাধ্যমে ইসলামে দাস প্রথার উচ্ছেদের বিষয়টি সুন্দর-সমীচীন পন্থায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নেতৃত্বে সম্পন্ন করার বর্ণনাটি উপস্থাপিত হয়।

এ বিষয়ে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কৌশলগত অবস্থান নিয়ে ধীরে ধীরে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় উক্ত প্রথাটি উচ্ছেদ করায় বর্তমান সমাজে প্রতিটি মানুষ আজ স্বাধীন-সার্বভৌম জীবন যাপনে ব্রতী হয়েছেন। যা কেবল ইসলামী জীবন-বিধানের অধীনেই সম্ভব হয়েছে।

ছহী আকায়েদ
ও
ভ্রান্ত মতবাসমূহের তালিকা
রচনাকাল : অনুল্লেখিত
প্রকাশক : পরিচালক, ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, পশ্চিম নন্দনপুর, দালালবাজার, লক্ষ্মীপুর
প্রকাশকাল : অনুল্লেখিত
কৃত : বিশ্ব বরেণ্য আলেম, আলেমকুল শিরোমণি, দশ সহস্রাধিক আলিম, মুদাররিস ও মুহাদ্দিসগণের যোগ্য ওস্তাদ পীরে তরিকত শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)
সাইজ : পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪
শুভেচ্ছা বিনিময় : ২.০০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : ফেরদাউছিয়া লাইব্রেরী
জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া রোড
ষোলশহর, চট্টগ্রাম

অতীব সংক্ষিপ্ত মাত্র চব্বিশ পৃষ্ঠা সম্পন্ন বইয়ের প্রারম্ভে আরজ শিরোনামে লেখক একটি ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন, যাতে উক্ত বইয়ের বিষয়গুলো গ্রন্থাবদ্ধ করণের কারণ ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূলত সাহাবা আজমাইন, সালফে সালেহীনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা বিশ্বাস ও তাদের আক্বীদার নীতিসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উক্ত গ্রন্থে পেশ করা হয়। এর মাধ্যমে যাতে উম্মাতে মুসলিমা তাদের সঠিক ও যথাযথ পথ প্রাপ্ত হতে পারে।

পুস্তকখানার তৃতীয় পৃষ্ঠা হতে একাদশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আটাশটি আক্বীদা কুরআন, সুন্নাহ, ফিক্হ ও ফাতওয়ার আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে।

অপরদিকে পুস্তক খানার দ্বাদশ পৃষ্ঠা হতে একবিংশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদার আটাশটি সূত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি পয়েন্ট ও সূত্রে সে সকল মতবাদের অনুসারীগণের লিখিত বইয়ের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তা আহলে সুন্নাতের আক্বীদার আলোকে খণ্ডন করা হয়েছে।

এ সকল আলোচনা শেষে একটি সুন্দর উপসংহার প্রণীত হয়েছে। তাতে এ সকল মতবাদীদের বিভিন্ন আক্বীদার সমালোচনা করা হয়েছে। উম্মাতে মোহম্মদীর মাঝে ফাটল ধরানোর তাদের যে অপকৌশল তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যে আল্লাহ ও তাঁর পেয়ারা হাবীব নবী মুহাম্মদ মোস্তফা ও আহমদ মোস্তফা

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নীতি আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার ওপর অটল অবিচল থাকার জন্য বিশ্ব স্রষ্টার নিকট তাওফীক কামনা করা হয়েছে।

আর এ সকল আক্বীদা ও ইসলামের ভিতর ফাটল সৃষ্টিকারী মতবাদের দরুন পাক-ভারত উপমহাদেশের ৩০১ জন আলেম ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাদেরকে ফতোয়া দিয়ে তা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ছেপে যুগের পর যুগ ছড়িয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এসকল ফাতওয়া, যুক্তি ও দলীলসমূহের প্রতিবাদ করার কোন ভাষা ও সাহস তারা অদ্যাবধি পাচ্ছেন না। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পূর্ণ আক্বীদা অনুসরণই আমাদের কর্তব্য।

পরিশেষে প্রতিপক্ষের বিভিন্ন মতবাদের অনুসারী বাতিল দলের ঘোষণাপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত ঘোষণাপত্রে সাতটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে এবং সাতটি শর্ত উপস্থাপন শেষে কুমিল্লা ও ঢাকার তিনজন মৌলভীর রাজিনামাসহ স্বাক্ষর সম্বলিত নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশ উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের মুখোশ উম্মোচন করা হয়েছে। তাদের যাবতীয় অনিয়মতান্ত্রিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সকলকে আবারও সম্মক অবহিত করা হয়েছে।

লন্ডনস্থ হেজাজ কনফারেন্স
রচনাকাল : ১৯৮৫ ইং
প্রকাশক : পরিচালক, ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, করিম নগর, লক্ষ্মীপুর
প্রকাশকাল : ৫ মে, ১৯৮৫ ইং
সংগ্রাহক : শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী
সদস্য, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন, লন্ডন
সহ-সভাপতি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, বাংলাদেশ
প্রধান (হাদীস বিভাগ)
জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদরাসা
পো. আমিন জুট মিলস, চট্টগ্রাম
সাইজ : পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬
শুভেচ্ছা বিনিময় : ৩.০০ টাকা

শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী (রহ.) ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ১৯৮৫ সনের ৫ই মে লন্ডনস্থ দ্বিম্‌ব্‌লে কনফারেন্স সেন্টারে (Thembly Conferance Centre) তৎকালীন ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন, লন্ডন কর্তৃক আয়োজিত হেজাজ কনফারেন্সে একজন আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন।

বিশ্ব প্রসিদ্ধ ও বরেণ্য দরবার-দরবারে গাউছে পাক বাগদাদ শরীফের তৎকালীন গদ্দীনশীণ ছাইয়েদ আলা উদ্দীন জিলানী (রহ.) ও বিশ্বখ্যাত দরবার-দরবারে খাজা মাঈন উদ্দীন চিশতী আজমিরী (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দরবারের গদ্দীনশীন ছাইয়েদ খান দেওয়ান হোসাইন (রহ.) উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

দুইটি বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন উক্ত সম্মেলনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা ভিত্তিক আলোচনা সমস্যা, সম্ভাবনা ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উক্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পরিশেষে আমন্ত্রিত অতিথিগণের মাঝে আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদীর (রহ.) উপর দায়িত্ব আসে তাবলীগ জামাত সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য। তাতে তিনি অতীব সাবলীল ভাষায় খুবই সংক্ষেপে তাবলীগ জামাতের স্বরূপ উম্মোচনে সক্ষম হন। সেখানে তিনি এদের এরূপ তাবলীগী আক্বিদাকে বাতিল আক্বীদা ও বাতিল দলরূপে আখ্যায়িত করে তাদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য বিশ্ববাসীকে আহবান জানান।

অত্র প্রতিবেদনে তিনি ছয় উসুলের সমালোচনা করে তার একটি সুন্দর ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করেন। তাবলীগপন্থীগণ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতের চেয়ে নফল কাজকে বেশী গুরুত্ব দিতে চায় তা তিনি প্রমাণ করেছেন।

এছাড়া তিনি নফরুন ফি সাবিলিল্লাহ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিক ব্যাখা দিয়ে তিনি খারেজী মতবাদের সাথে তাদের মিলের বর্ণনা করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তারা যে কাফের হিসেবে মুফতিগণের ফাতওয়ার মাধ্যমে পাক-ভারত-উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় তা ভাষান্তর করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তারও বর্ণনা তিনি নির্বিঘ্নে উপস্থাপন করেছেন।

বাতিল কারা?
তাদের পরিচয়!
রচনাকাল : তারিখ বিহীন
প্রকাশক : মাওলানা একরামুল হক
গ্রাম- দোঘই, পো. মুদ্রা, জিং- কুমিল্লা
প্রকাশকাল : তারিখ বিহীন
কৃত : বিশ্ব বরেণ্য আলেম, পীরে তরীকত, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস
শায়খুল হাদীছ আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী।
প্রধান (হাদীস বিভাগ)
জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদরাসা
পো. আমিন জুট মিলস, চট্টগ্রাম
সাইজ : পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪০
শুভেচ্ছা বিনিময় : ৭.০০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : ফেরদাউছিয়া লাইব্রেরী
জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া রোড
ষোলশহর, চট্টগ্রাম

আলোচ্য পুস্তিকাখানায় বিশ্ব বরেণ্য আলিমে দ্বীন ওলীয়ে কামিল, শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) বাতিল দলের ও মতের অনুসারী বাংলাদেশী কয়েকজন ব্যক্তির আলোচনা, তাফসীর, বয়ান ইত্যাদির উদ্ধৃতি উল্লেখ করে সেগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কুরআন ও হাদীসের আলোচক প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন যে, বাংলার বুকে ইসলামের ব্যবহার করে বাতিল মতাদর্শের দর্শন কারা অনুসরণ করছে? এবং কারা সে মতাদর্শ লালন করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার অপ প্রচেষ্টায় কালাতিপাত করছে?

আল্লামা নক্সবন্দী অত্যন্ত সুন্দর সাবলীল ভাষায় আলোচনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, বিশ্ব সমাজের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ব্যতীত ইসলামের নামে নতুন নতুন নাম ও নামের বাহার জুড়ে দিয়ে ইসলাম ধর্মের মাঝে কেবলমাত্র নব নব দলই আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রকৃতরূপ অনুসারীদল হিসাবে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) পুর্ণ অনুসরণকারী কেবল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতই সঠিক। এর বাইরের নামধারীগণ যুগে যুগে ছিলেন থাকবেন। কিন্তু তারা পরিশেষে নিজেদেরকে বাতিল ফিরকার তালিকায়ই স্থান করে নিতে সক্ষম হবেন। কেননা, কেবল পার্থিব চাকচিক্য বা জৌলুষ ও অর্থবল জনবলই সফলতা ও সঠিকতার মাপকাঠি নয়। কাল

ক্বিয়ামতের সে ভয়াবহ জবাবদেহীর মাধ্যমেই কেবল এরূপ বিতর্কাবসান ও সমস্যার সমাধান হবে।

উল্লেখিত সকল শিরোনামের মাধ্যমে তিনি প্রতিপক্ষ শক্তির একটি সুন্দর ও যথাযথ স্বরূপ উম্মোচনে সক্ষম হয়েছেন। সক্ষম হয়েছেন দেশ-জাতি নির্বিশেষে সকলকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে।

বদরপুরের বাহাস
কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত চান্দিনা থানার বদরপুর বাজারে বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ সমর্থক দেওবন্দীদের সাথে
-ঃ বাহাস ঃ-
রচনাকাল : ১৪/০৪/১৯৭৭
প্রকাশক : মো. মনিরুল হক
চেয়ারম্যান
৮নং মাইঝখার ইউনিয়ন পরিষদ
থানা- চান্দিনা, জেলা- কুমিল্লা
প্রকাশকাল : ১৪/০৪/৭৭ খ্রি.
কৃত : মাওলানা ফজলুল করিম নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী (রহ.)
ও
মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সাইজ : পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬
শুভেচ্ছা বিনিময় : ২.০০ টাকা
বহসস্থল : বদরপুর বাজার মাদরাসা প্রাঙ্গন
থানা : চান্দিনা, জিলা : কুমিল্লা
মুদ্রণকারী : অনুল্লেখিত
প্রাপ্তিস্থান : ফেরদাউছিয়া লাইব্রেরি
চকবাজার, কুমিল্লা

আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে প্রচলিত তাবলীগ জামাতের আক্বীদা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদার পক্ষে বিপক্ষে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার বদরপুর গ্রামের বাজারস্থ মাদরাসায় এক ঐতিহাসিক বাহাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বাহাসে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) ও আলী আকবর রিজভী (রহ.) বক্তব্য পেশ করেন। আর তাবলীগ জামাতের পক্ষ অবলম্বন করেন মাওলানা আশ্রাফ উদ্দীন, মৌলভী শামছুল হক, মাওলানা সোলায়মান, হাসান আলী বি.এ.বি.টি ও তাদের দল।

উক্ত বাহাসে মধ্যস্থতাকারী সালিসদার হিসেবে ৪ জন থানা পর্যায়ের অফিসার উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন, (১) মো. সাইদ উল্লাহ মজুমদার, সার্কেল অফিসার, চান্দিনা, (২) মো. কেনু মিঞা চৌধুরী, থানা শিক্ষা অফিসার, চান্দিনা, (৩) মোহাম্মদ আব্দুর রহিম,

প্রজেক্ট অফিসার, চান্দিনা এবং (৪) মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ, এডভোকেট, সাং- হারিপাড়া, চান্দিনা, জেলা- কুমিল্লা।

বাহাসের প্রারম্ভেই তাবলীগ জামাতের পক্ষীয় হাসান আলী বি.এ.বি.টি সাহেব বাহাসের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহবান জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁরই প্রস্তাবনায় উক্ত বাহাসের সভাপতি হিসেবে মাইজখার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যন জনাব মনিরুল হক সাহেবের নাম সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বাহাসের মূল আলোচনায় উভয় পক্ষীয় যুক্তি তর্ক এবং কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াস ভিত্তিক পরস্পর দলীল প্রদান ও দলীল খন্ডনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষও তাদের দল পরাজিত হন।

ঐ বাহাসের বিজ্ঞ সভাপতি জনাব মনিরুল হক সাহেব জনসম্মুখে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেন যে, পরবর্তী মাসের পাঁচ তারিখে তথা ৫/৫/১৯৭৭ইং তারিখে জনসভার মাধ্যমে উক্ত বাহাসের ফলাফল ঘোষণা করবেন। তার ভাষায় "বাহাছে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ সমর্থনকারী আলেমগণ লা-জওয়াব ও পরাজিত। কাজেই পুনরায় ৫/৫/১৯৭৭ইং তারিখ সভা করিয়া জন সমুদ্রে আমি জানাইয়া দিতেছি যে, প্রতিপক্ষ পরাজিত।" উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে সর্বশেষে তাবলীগ পক্ষের মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহম্মদ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে ও তাবলীগের বিপক্ষে মাও. আকবর আলী রেজভী ছুন্নী আল-ক্বাদেরী স্বাক্ষর করেন।

ইলিয়াসী ধর্ম
থানবীর আকিদা মওদূদী মতবাদ
রচনাকাল : তারিখ বিহীন
প্রকাশক : পরিচালক, ইসলামী রিচার্স সেন্টার
করিম নগর (পশ্চিম নন্দনপুর) দালাল বাজার
জিলা- লক্ষ্মীপুর।
প্রকাশকাল :
প্রণেতা : মরহুম শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী (রহ.)
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৮
শুভেচ্ছা বিনিময় : ৫.০০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : ফেরদাউছিয়া লাইব্রেরী
মোহাম্মদপুর, দালাল বাজার, জিলা- লক্ষ্মীপুর

এ পুস্তিকাখানায় আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) তাবলীগ জামাত, মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রহ.), আবুল আলা মওদূদী (র.) এদের প্রবর্তিত মতাদর্শ ও তাঁদের লিখিত পুস্তকরাজির বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তার সমালোচনা করেন।

পুস্তক খানার ১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতিপক্ষের মতামত ও বক্তব্যসমূহ উপস্থাপন করে এর সুস্পষ্ট ও যথার্থ কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক দলীল উপস্থাপনে সক্ষম হন। এমনকি দলীলগুলো অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বেশ জ্ঞানগর্ভ ধরনের।

এরপর তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা ভিত্তিক চব্বিশটি বিষয়ের আলোকে একটি উপসংহার উপস্থাপন করেন। সেখানেও তিনি বিশেষভাব প্রত্যেকটি বিষয়ের বিপরীতে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক অতীব সুদৃঢ় প্রমাণাদি পেশ করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। তাঁর এহেন যুক্তিপূর্ণ দলীলের বিপরীতে অদ্যাবধি বিরোধীপক্ষের কোন জবাব বা প্রতি উত্তর পরিলক্ষিত হয়নি।

এছাড়া বইটির সর্বশেষ সপ্তবিংশ পৃষ্ঠায় প্রণীত শিরোনাম "পবিত্র ইসলামের কর্ণধার কাহারা?" শীর্ষক বর্ণনায় তিনি কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক ও যথাযথ জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত বিশেষত ইসলামী জ্ঞানের বিশটি বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন ও কুরআন-সুন্নাহর আশি প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিগণকেই সত্যিকারের ইসলামের ধারক ও বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মওদূদীর মৃত্যু
ও
মৃত্যুর প্রকারভেদ
রচনাকাল : তারিখ বিহীন
প্রকাশক : পরিচালক, ইসলামী রিচার্স সেন্টার
করিম নগর (পশ্চিম নন্দনপুর) দালাল বাজার
লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী।
প্রণেতা : আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী।
মোহাম্মদপুর, লক্ষ্মীপর, নোয়াখালী
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৫
শুভেচ্ছা বিনিময় : ১.০০ টাকা
মুদ্রণে : তকদীর প্রেস, নিউ মার্কেট, কুমিল্লা
প্রাপ্তিস্থান : ফেরদাউছিয়া লাইব্রেরী
স্কুল রোড, কুমিল্লা

উল্লেখিত পুস্তকখানায় আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) ১৯৭৯ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত মাওলানা মুওদূদী (র.)-এর মৃত্যু সংবাদের তথ্যকে

উদ্ধৃত করে তার শরীরে আস্ত্রোপাচার, চিকিৎসার সার্বিক অবস্থা উপস্থাপন করেন। পুস্তকখানার দশম পৃষ্ঠা হতে চতুর্দশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মাওলানা মওদূদী সাহেবের ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধমে নিজ প্রচেষ্টায় কুরআন-হাদীস বুঝতে যাওয়ার সমালোচনা করা হয়।

পরিশেষে পুস্তকখানার পঞ্চদশ পৃষ্ঠায় নয়শত নিরানব্বইজন আলেমের একটি বিশেষ ফাতওয়া বা ইসলামী সিদ্ধান্ত পেশ করেন।

উনিশশত উনাশি সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদী পত্রিকায় উক্ত উলামায়ে কিরামের ফতোয়াখানি প্রকাশিত হয়। নিখিল পাকিস্তানের ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মাওলানা শেখ মোহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ ইবন সাঈদ জালালাবাদী (রহ.) সাহেবের নেতৃত্বে উক্ত ফাতওয়াখানি প্রণীত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাগ্মীতার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার

শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) একজন বাগ্মী পুরুষ ছিলেন। তিনি বাংলার রূপসা থেকে পাথুরিয়া এবং টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত চষে বেড়াতেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে ওয়ায নসিহতের মাহফিলের নিমন্ত্রণ নিয়ে শত সহস্র মানুষ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি স্বীয় ডায়েরী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বত্র ওয়ায মাহফিলের তারিখ ও সময় গ্রহণ করতেন। তাঁর বাগ্মীতার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনহিদায়াত, জনহিত ও জনগণের মাঝে আল্লাহর রাসূলগণের ধারাবাহিকতায় আল্লাহর ওলীগণের প্রতি মহব্বত, আনুগত্য, শ্রদ্ধা-সম্মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা ও মানব অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকরণ।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, বি-বাড়িয়া, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, রাজশাহী, যশোহর, রংপুর, দিনাজপুর, সাতক্ষীরাসহ সারাদেশে তিনি দ্বীনি দাওয়াত ও নবী-ওলীগণের শান-মান উর্ধ্বে তুলে ধরে মানবতাকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাতেন।

আল্লামা নক্সবন্দীর (রহ.) সুমিষ্ট, সুকণ্ঠ ও সুবক্তব্য মানুষকে অতীব সহজ, স্বাভাবিক ও সাবলীল পন্থায় ইসলামী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতো। তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী একজন সুবক্তা ছিলেন। তাঁর জ্ঞান গভীরতা, ভাষার সাবলীলতা, যুক্তি তর্কের দৃঢ়তা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ বয়ান শ্রোতাকুলকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করতো। মানুষকে নবী প্রেম ও দ্বীনি জযবায় উজ্জীবিত করে তুলতো।[৩]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হিসেবে তিনি দেশী-বিদেশীসহ সকল জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুন্নতের গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং বাংলায় সুন্নাত কায়েমের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ওয়ায-নসীহত করে বেড়াতেন। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা সুন্নীপন্থীগণ যে কোন প্রশ্ন, মুনাযারা, মুকাবালাসহ ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলেই তিনি এ পথের একজন অগ্রসেনা রূপে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হলেও অকুতোভয় সৈনিকতুল্য ভূমিকা নিয়ে চষে বেড়াতেন। মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করতেন সুন্নিয়তের মহান আদর্শের পানে।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) স্বীয় বাগ্মিতাকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর একাডেমিক জীবন সমাপ্তি লগ্নে ভারতের ইউ.পি. প্রদেশের রামপুরস্থ দরবারে নক্সবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া হতে স্বীয় পীরের অনুমতি নিয়ে দেশব্যাপী মানুষ

---

৩. হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আব্দুল আলীম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

হিদায়াতের লক্ষ্যে ওয়ায-নসিহতে বেরিয়ে পড়েন। শিক্ষকতার মহান পেশার পাশাপাশি মাঠে-ময়দানে অব্যাহতভাবে আমৃত্যু ওয়ায নসিহত, ইসলামী জালসা, তাফসীর মাহফিল ইত্যাদি করে বেড়াতেন। প্রতিমাসে তিনি নিয়মিত ১০/১২ দিন ঘরে ঘুমাতে পারতেন না। শীতকালে তো একটি দিনের জন্যও ঘরে ঘুমাতে সক্ষম হতেন না। বাংলা, আরবী, উর্দু, ফার্সী ইত্যাদি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে সক্ষম ছিলেন আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.)। আলোচনায় তিনি কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি ও বিভিন্ন ভাষায় কবিতার রচনাবলী উপস্থাপন করতেন। ওলী আওলীয়াগণের জীবনী আলোচনা করে স্বীয় আলোচনা ও ওয়ায মাহফিলকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতেন। অত্যন্ত সুচিন্তিত যুক্তি ও কুরআন-হাদীসের পাণ্ডিত্যপূর্ণ দালিলিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্বীয় বক্তব্য মানব হৃদয়গ্রাহী করে তুলতেন। সকল আঞ্চলিকতামুক্ত সুন্দর ও সুস্পষ্ট বাংলায় উচ্চারণের মাধ্যমে প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। কখনো মানুষকে বেশ আবেগী বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহমুখী করা এবং পাশাপাশি সুন্দরগল্পের উপস্থাপনা করে পুনরায় মনোতৃপ্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করতেন।

তাঁর নসিহত ছিল বিশেষত হৃদয়গ্রাহী ও মনোলোপা। মসজিদের তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ খতিব ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের আধার একজন মুফাস্সির, ময়দানে একজন অনলবর্ষী বক্তা ও ওয়ায়েয। সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসীম জ্ঞানের অধিকারী আলোচক ছিলেন।

তাঁর আলোচনা, বক্তৃতা ও নসিহতে বিশেষ দ্বীনি জ্ঞানের গভীরতা ছিল। প্রতিটি কথা কুরআন সুন্নাহর আলোকে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করতেন। বক্তব্যের প্রতিটি পয়েন্টে এমনভাবে কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করতেন মনে হয় যেন তিনি কুরআন, হাদীস মাত্রই চষে বেড়াচ্ছেন। কুরআন সুন্নাহভিত্তিক এ জাতীয় উপস্থাপনা অবলোকনে অনেকেই মহান আল্লাহর প্রতি বিশেষ শুকরিয়া আদায় করতেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে বিনয়াবনত হতেন।[৪]

শত সহস্র আলিমকুলের উস্তাদ আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) নিজেকে অতীব সাধাসিধা জীবনের অনুসারী করে রেখেছিলেন। তিনি চাল-চলন, বলন-কথন ইত্যাদিতে নিজেকে অত্যন্ত বিনম্রভাবে অতীব ব্যক্তিত্বসম্পন্নরূপে উপস্থাপন করতেন। সুবিন্যস্ত, দৃঢ়চেতা ও মনোমুগ্ধকর আলোচনার মাধ্যমে দর্শক সমাজকে খুবই তীক্ষ্ণভাবে আকৃষ্ট করেই কেবলমাত্র তাঁর ওয়ায-নসিহত সমাপ্ত করতেন।

তাঁর বয়ানে মানুষ অতীব মুগ্ধ হতেন এবং যে কোন ঐতিহাসিক বিষয়ের এবং নবী-ওলীগণের জন্ম মৃত্যু, ঘটনাবলী ও ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়, সন, তারিখ ও দিনের নামসহ তিনি বর্ণনা করতে সক্ষম ছিলেন। অনেক অনেক বিজ্ঞোচিত ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে

৪. শাহজাদা মুহাম্মদ জহীরুল করিম ফারুক, প্রাগুক্ত।

আল্লামা নক্সবন্দী এমন রেফারেন্স দিতেন যে, গবেষকগণ বহু গ্রন্থাবলী খুঁজেও তা সহজে পেতেন না, ফলে তাঁর এ জাতীয় স্মৃতিশক্তি, ধী-ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও ব্যাপক পঠন-পাঠন অধ্যয়নকে কিংবদন্তীতুল্যরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে।[৫]

প্রকৃতপক্ষে তিনি এমন একজন মহান দক্ষ আলোচক ছিলেন যাঁর আলোচনায় দার্শনিক তথ্য, তথ্যসমাহার ও প্রামাণিক তথ্যাবলী ব্যাপক ছিল। পাশাপাশি তা ছিল হৃদয়গ্রাহী, মনোলোপা, মনোমুগ্ধকর ও শ্রোতা সম্মোহনী ক্ষমতায় ভরপুর। তাঁর দীর্ঘ ভাষণ শুনতে শ্রোতাসমাজের কোনরূপ ক্লান্তি আসতো না। তিনি স্বীয় বাগ্মিতার মাধ্যমেই কেবল সারাজীবন দ্বীনি খিদমতে ব্রতী ছিলেন। বক্তৃতা-বিবৃতি, আলোচনা ইত্যাদির পাশাপাশি সুন্নীয়তের আমলেও তিনি ছিলেন অকুতোভয় সৈনিক। ফলে, তিনি পরপারে যাত্রাকালীন মহানবী (সা.) পেয়ালা নিয়ে অপেক্ষমান দেখতে দেখতে পাড়ি জমান।[৬] তাঁর এ যাত্রাকালীণ পরিবেশ প্রমাণ করে তিনি প্রকৃতপক্ষেই একজন ইসলামের পূর্ণ অনুসারী, নবী প্রেমিক, ওলী আল্লাহ ভক্ত ও ইলমে দ্বীনের একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক খাদিম ছিলেন।

---

৫. সাক্ষাৎকার, শাহজাদা আব্দুল কাদের জিলানী, প্রাগুক্ত।

৬. সাক্ষাৎকার, শাহজাদা ফেরদাউস করিম দরবেশ, প্রাগুক্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্মুখ মুনাযারার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার

শায়খুল হাদীস আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) তার সমসাময়িক কালে একজন অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুনাযির ছিলেন। তৎকালীন সময়ে তিনি একজন তর্কবাগীশ হিসেবে বাংলার আনাচে-কানাচে পরিচিত ছিলেন। বহু মুনাযারা বাহাছ এমন বিদ্যমান যে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) আজাকের এ বাহাছে হাজির থাকবেন সংবাদ শ্রবণে বিরোধী পক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতো। তাতে তিনি ও তাঁর দল কোনরূপ মুকাবিলা ব্যতীতই বিজয় লাভ করে ফিরে আসতেন। অতীব বিরল এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) প্রতিপক্ষের সাথে তাঁর প্রায়শই বাহাস-মুনাযারা ও সম্মুখ বিতর্কে অংশ নিতেন। তিনি সম্পূর্ণ অকুতোভয় বীরের ন্যায় নবীজীর ওলীগণের পক্ষের সৈনিক হিসেবে মুনাযারায় উপস্থিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত-পরাভূত করেই কেবল ক্ষ্যান্ত হতেন।

তাঁর জীবনের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সম্মুখ মুনাজারা, বাহাছ, বিতর্ক ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে তিনি বিরোধী শক্তিকে কুরআন-সুন্নাহর ডকুমেন্ট উপস্থাপন করে অবশ্যই পর্যদুস্থ ও পরাভূত করতে ত্রুটি করতেন না। দেশের বিভিন্ন জেলার প্রতিপক্ষ আলেমগণের সাথে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শত-সহস্র বাহাছ-মুনাজারা করেছেন। সকল মুনাজারায় তিনি বিশাল ব্যক্তিত্ব, কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল উপসস্থাপন, যুক্তি তর্কের প্রখরতা ইত্যাদির সম্মুখে তারা মোটেই দাড়াতে সক্ষম হয়নি। বরং কখনো পরাজিত-পর্যদুস্থ, কখনো আত্মসমর্পন, কখনো নতি স্বীকার এমনকি কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।[৭]

তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের সম্মুখে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক যুক্তি নিয়ে তা উপস্থাপনে সক্ষম হবে না মনে করে অনেক সময় তারা পূর্বে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাহাছ মুনাজারা বা তর্ক অনুষ্ঠানে হাযির হতে সাহস পেত না। ফলে, উপস্থিত বিচারকমণ্ডলী ও আপামর জনতার শুভেচ্ছা ও দোয়া নিয়ে তিনি একজন সঠিক পন্থী ও বিজয়ীরূপে সললতার সাথে ফিরতেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মাঝে বাঁশখালীর বাঁশবাগানের বাহাছ, বদরপুরের বাহাছ, চৌদ্দগ্রামের বাহাছ ইত্যাদি তিনি গ্রন্থাবদ্ধ করে জন সমাজে উপস্থাপন করেন। এ সকল বাহাছের মাঝে কি ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং কি পরিবেশে তিনি কিরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং কেমন যুক্তিপূর্ণ দলীল-আদিল্লা উপস্থাপন করে

---

৭. হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আব্দুল আলীম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

তিনি তাঁর তর্ক বাহাছে বিজয় লাভ করেছেন তার বিশদ বর্ণনা এ সকল গ্রন্থাবলীতে রয়েছে।

অবশ্য গ্রন্থাবদ্ধ করে উপস্থাপন ব্যতীতও বাংলার আনাচে-কানাচে যেমন সিলেট, খুলনা, চাঁদপুর, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনাসহ দেশের প্রতিটি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে হলে তিনি কোন সময়ই কোন মুনাযারা, বাহাছ, বিতর্ক, অনুষ্ঠান হতে দুরে থাকতেন না। কেবলমাত্র অসুস্থতা জনিত কারণে পূর্বেই কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তারিখ পরিবর্তন করে নিতেন। কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠার পর পরই তিনি পুনরায় স্বীয় বিতর্কের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যথাস্থানে হাযির হয়ে নিজেকে আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও সালফে সালেহীনগণের পক্ষীয় একজন অকুতোভয় সিপাহসালার প্রমাণ করতে।

মুনাযারায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লামা নক্সবন্দীর (রহ.) আরেকটি দলীল পাওয়া যায় ১৯৭৯ সালে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ থানার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নস্থ রামনগর উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানের ঘটনায়। তিনি মাহফিলের নিমন্ত্রণ নিয়ে অত্র বিদ্যালয় সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, সেখানে পূর্ব হতেই মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন এম.পি., মাওলানা মুহাদ্দিছ আব্দুল হক এবং মাওলানা আব্দুস ছাত্তারসহ ৫০ জনের অধিক আলেম ৫০ টি ভ্যান কিতাব নিয়ে তাঁর সাথে মুনাযারা করার জন্য প্রস্তুত। সেখানে দীর্ঘক্ষণ প্রায় ৫/৭ ঘন্টা মুনাযারা মুবাহাছার পর আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) বিজয় লাভ করেন। পরিশেষে, মাওলানা আজিজুল হক সাহেব বলেন, "আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) সাহেব আজকের মাহফিলে আসবেন জানলে আমি আসতাম না।"[৮]

অনুরূপভাবে ময়মনসিংহ বিভাগের কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানার অন্তর্গত চাতলপাড় বাজারে প্রতিপক্ষীয় নেতা মাওলানা তাজুল ইসলামের সাথে নবীজীর নূরাণী সত্ত্বা, তাঁর হাজির-নাজির, মিলাদ-ক্বিয়াম ইত্যাদি নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত তারিখ দিয়ে সে মাহফিলে মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব অনুপস্থিত থাকেন। ঐ বাজারে তিনি দীর্ঘ প্রায় আট ঘণ্টা বয়ান করেন। এতে উক্ত এলাকার সকল মানুষ হিদায়াতের আলোতে আলোকিত হয় এবং আল্লামা নক্সবন্দীর বয়ানে মুগ্ধ হয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হয়ে যান।[৯]

একই ধারাবাহিকতায় আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) ১৯৭৭ইং সনে চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে মীলাদুন্নবী (স.) এর উপর একখানা মাহফিলে বয়ান করার জন্য হাজির হন। সেখানে সুন্নী আলিম মাওলানা আবিদ শাহ (রহ.) নবীজীর শানে একখানা খালি চেয়ার রেখে দেওয়ার দাবী জানালে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) তাঁর সাথে মুনাযারায়

৮. শাহাজাদা জহিরুল করিম ফারুক, প্রাগুক্ত, ৩০ জুন, ২০১৬

৯. প্রাগুক্ত।

লিপ্ত হন এবং বাহাছে অবতীর্ণ হয়ে কুরআন সুন্নাহর আলোকে জনাব আবিদ শাহ (রহ.) কে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হন যে, এ ধরনের আবেগী কাজ বিদআত। তখন আবিদ শাহ (রহ.) উক্ত কাজ হতে বিরত হন। অর্থাৎ আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তাঁর মতানুসারী সুন্নী আলিমের সাথেও কুরআন-সুন্নাহর যুক্তিতে বিজয় লাভে সক্ষম হন।[১০]

এরূপ অসংখ্য বাহাছ-মুনাযারায় আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) তাঁর সময়ে নিজেকে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলিম রূপে প্রমাণে সক্ষম হন।

১০. প্রাগুক্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাঁর চরিত্র ও কারামাতের প্রভাব

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.) আধ্যাত্মিক জগতের একজন অকুতভয় সৈনিক ছিলেন। গভীর রাত অবধি অধ্যয়ন সাধনায় ব্যস্ত থাকতেন আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.)। গভীর ও ঐকান্তিক অধ্যয়ন সাধনায় তিনি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন।

তাঁর চরিত্র মাধুর্যপূর্ণ ও অনুপম গুণের অধিকারী। তিনি অতি সহজে মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হতেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও শালীনতা মানুষকে আকর্ষণ করতো। তারা সকলে তাঁর গুণমুগ্ধ চরিত্রে বিমোহিত হয়ে পড়তেন। চারিত্রিক মাধুর্যে সাথে পারিবারিক আতিথেয়তায় তিনি ছিলেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ঘটনা জনমুখে আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে যে, তাঁর প্রথম সংসারের বড় মেয়ে ফেরদৌছী বেগমের (মাকনুন) বিবাহ উপলক্ষে তাকে দেখার জন্য বরপক্ষ চাদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানা হতে আসেন। প্রায় পঞ্চাশজন লোক তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ফেরদৌছী বেগম মাকনূনকে দেখতে এলে রমজানের দিনে তিনি বরপক্ষের প্রতিটি সদস্যকে ২৭ (সাতাশ) পদের খাবার ও পানীয় দিয়ে ইফতার করান, তাঁর ইফতারির পদ-প্রকার দেখে বরপক্ষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে খুবই তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিবাহকার্য সম্পন্নের সিদ্ধান্ত নেন[১১], ফলে, পরবর্তী দিনেই তারা বিবাহ সম্পন্ন করে নক্সবন্দীর মেয়েকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বরের বাড়ি নিয়ে যান। এরূপ হৃদয়গ্রাহী, মনোমুগ্ধকর ও সন্তুষ্টিপূর্ণ আতিথেয়তা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক।

অতি সহজে কারো মনোকষ্ট তিনি দিতেন না। যে কোন বিতর্কিত মাসয়ালা জনিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অতীব গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে স্বীয় পক্ষ সমর্থনের লক্ষ্যে সময় নিতেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এক একটি করে যুক্তি উপস্থাপন করে নিজের পক্ষের দলীলসমূহ উল্লেখ করতেন। অতঃপর প্রতিপক্ষের বক্তব্য যুক্তি সমূহ শ্রবণ করে তাদের যুক্তি সমূহের দাতভাঙ্গা জবাব প্রদান করে আরো সময় নিয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উপস্থিত সকলকে ওয়াজ-নসিহত ও উপদেশ প্রদান করে প্রতিটি উপস্থিত সব্যের হৃদয়ে স্বীয় মতামত বুঝিয়ে দিতেন। এমতাবস্থায় উপস্থিত সকলের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমর্থন গ্রহণ করেই কেবলমাত্র তিনি ক্ষ্যান্ত হতেন। বাহাছ-মজলিশের সম্পূর্ণ পরিবেশই তাঁর পক্ষ মনোভাবেরই হয়ে যেত।

তাঁর চরিত্র ও কারামাতের প্রভাব ছিল অতীব ব্যাপক। কারামাতের প্রভাবে বহু মানুষ হিদায়াত লাভ করেছেন। নিম্নে তাঁর কারামাতের কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হল–

---

১১. শাহজাদা ফেরদৌস করিম দরবেশ, প্রাগুক্ত।

প্রতি বছর আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) রমজান মাসে লক্ষ্মীপুর সদর থানার ২নং দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়নের নন্দনপুর নিজ গ্রামের নন্দনপুর ঈদগাহ জামে মসজিদে বাদ জোহর হতে আছর পর্যন্ত তাফসীরুল কুরআন মাহফিল করতেন। প্রতিদিন ৬০০ হতে ১০০০ লোক পর্যন্ত উক্ত মাহফিলে দূর-দূরান্ত হতে এসে হাজির হতেন। ১৯৮৬ সনের রমজান মাসে তাফসীরকালীণ আকাশে কালো মেঘ জমাট হয়ে বিদ্যুৎ চমকানো ও বজ্রপাতের সৃষ্টি করে। এ পরিবেশে লোকজন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দিক-বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি মাইকে ঘোষণা করেন যে, কোন সমস্যা থাকবে না সকলে বসে পড়ুন। ঘোষণা মাত্রই তিনি কি যেন দোয়া পাঠ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন, মুহূর্তের মধ্যেই সকল মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। সকলে স্বচ্ছন্দে ও স্বানন্দে নিরাপদ পরিবেশে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল শ্রবণ করে সালাতুল আছর সমাপনান্তে ঈদগাহ ময়দান ত্যাগ করেন।[১২]

তাঁর নিজ আবাসস্থল নন্দনপুর গ্রামের সকল অধিবাসী তাঁর প্রতি এমন ভক্ত অনুরক্ত ছিল যে, সকলে বিশ্বাস রাখতেন যে, হাঁস-মুরগির প্রথম ডিম-বাচ্চা, গরু-মহিষের প্রথম দোহন করা দুধ, পেপে, নারিকেল, কাঠাল, জাম, জামরুল, আতাফল, কদবেল ইত্যাদি গাছের প্রথম ফল হুজুরকে হাদিয়া দিলে অবশ্যই তার পশু-পাখির বাচ্চা প্রসবে ও দুধে এবং গাছের ফলে বরকত হবে। বাস্তবেও ছিল তাই। তাঁকে প্রদত্ত হাদিয়া প্রদানের পর এমন ফল, দুধ, ও বাচ্চা গজাতো যে, মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি আরো বেড়ে যেত।[১৩]

তাঁর বাড়ির প্রাঙ্গণে কবর সংলগ্ন জামে মসজিদের পার্শ্বে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মহাদেবপুর এনায়েতিয়া দাখিল মাদরাসা ময়দানে প্রতি বছর ৩/৫/৭দিন ব্যাপী ওয়ায মাহফিল করতেন। ১৯৮২ সনে উক্ত ময়দানে মাহফিল চলাকালীন হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি এসে মাহফিলের লোকজনকে ভিজিয়ে সিক্ত করে ফেলে। সকলে ছুটাছুটি আরম্ভ করলে তিনি সকলকে শান্ত হয়ে মাহফিলে বসার নির্দেশ দিয়েই মাটির তিনটি টুকরা হাতে নেন। ঐ টুকরাগুলোতে দোয়া পড়ে ফুঁক দিয়ে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। সকলে নিরাপদে-নিশ্চুপে মাহফিললে বসে পড়েন। গভীর রাত পর্যন্ত মাহফিল শ্রবণ করে সবাই নিরাপদ পরিবেশে বাড়ি ফিরেন।[১৪]

বর্ণাঢ্য শিক্ষকতা জীবনে তিনি ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ কাদেরীয়া তৈয়্যেবিয়া মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ থাকাকালীন একদা গভীর রাত পর্যন্ত এলাকায় মাহফিল করে সকালে মোটর বাইকে করে মাদরাসার শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ নেয়ার জন্য রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে দাউদকান্দি গোমতি নদীর উপরস্থ ফেরী পার ওয়ার জন্য দ্রুত বাইক চালিয়ে আসেন।

---

১২. হাফেজ মোহাম্মদ সেলমি, মুয়াজ্জিন, নন্দনপুর ঈদাগাহ জামে মসজিদ, দক্ষিন হামছাদি, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষীপুর, সরাসরি কথা, তারিখ : ০২/০৬/২০১৬খ্রি.

১৩. শাহজাদা জহিরুল করিম ফারুক, প্রাগুক্ত।

১৪. শাহজাদা ফেরদৌস করিম দরবে, প্রাগুক্ত।

তার বাইক খানা ফেরিতে না উঠতেই ফেরী ছেড়ে দেয়। কিন্তু, আল্লাহর অশেষ কৃপায় মোটর বাইকের চলন বন্ধ হয়ে যায়। তিনি নিশ্চিত মৃত্যু হতে প্রাণে রক্ষা পান। মানুষ তাঁকে বলতে থাকে 'আপনি তো এখন মারা যেতেন, তিনি উত্তরে বললেন, "আমার আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন"।[১৫]

তাঁর প্রথম স্ত্রীর ঘরের জ্যেষ্ঠ কন্যা শাহজাদী ফেরদৌসী বেগমের (মাকনুন) শারিরীক বর্ণ ছিল কালো। তাঁর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন সুদূর ফরিদগঞ্জ হতে মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান ও তার আত্মীয়-স্বজন। প্রায় ৫০ জন লোককে তৎকালীন রমজানের দিনে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) সাতাশ পদের খাবার দিয়ে ইফতার করান। কিন্তু, তাঁরা পাত্রী দেখে অপছন্দ করে এলাকায় ফিরে যেতে চায়, সন্ধ্যারাত ও ভোর-রাতের খাবার খেয়ে শয়নকালে মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁকে স্বপ্নে বলা হয়, "মোস্তাফিজ এসেছ বিবাহ করে যাও, তোমার ভবিষ্যৎ কল্যাণকর হবে।" অবশেষে সকালে ঘুম হতে উঠে সকলের সাথে পরামর্শ করে মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব বিবাহকার্য সম্পন্ন করেই এলাকায় ফিরেন।[১৬]

খুলনার শহীদ হাদীস পার্কে আল্লামা নক্সবন্দীর (রহ.) মাহফিল চলাকালে মিলাদ শরীফ পাঠকালীন উপস্থিত সকলকে নিয়ে بلغ العلى بكماله الخ পড়তে আরম্ভ করলে কোন এক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উচ্চস্বরে বলতে থাকে, "রাখেন! আপনার বালাগাল উলা", মিলাদ শেষে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) ঐ প্রধান শিক্ষককে মুরতাদ ও কাফির ঘোষণা করে আসেন। পরিশেষে ৫/৬ মাস পর উক্ত প্রধান শিক্ষক মাথা বিকৃত হয়ে পাগল হয়ে যান। এবং সে আমৃত্যু ঐ পাগল অবস্থাতেই জীবন-যাপন করেন।[১৭]

সিলেট জেলার চুনারুঘাট থানায় এক মাহফিলে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) প্রতিপক্ষকে ভীষণভাবে নিন্দা ও কটাক্ষ করে বক্তব্য দেন। এতে প্রতিপক্ষের লোকজন ক্ষীপ্ত হয়ে দু দলে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম পক্ষ তাঁর লঞ্চে আক্রমণের চেষ্টা করলে তিনি তাদেরকে এমভাবে ধমক দেন যে, প্রতিপক্ষের সকল লোক সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। লঞ্চ থেকে নেমে সিলেট পৌঁছার পথে পুনরায় তারা গাড়ী চেক করতে থকে। কিন্তু, প্রতিপক্ষের সম্মুখ দিয়ে গাড়ী চলে এলেও তারা তাকে দেখতে পায়নি। তিনি নিরাপদে সিলেট শহরে পৌঁছান।[১৮]

আশির দশকের শেষলগ্নে তিনি রায়পুর থানার নতুন বাজার এলাকার খানকা-ই-মোজাদ্দেদীয়ায় এক ওয়ায মাহফিলে ওয়ায-নসিহত কালে প্রতিপক্ষের আক্বীদা-বিশ্বাস

---

১৫. শাহজাদা ফেরদাউস করিম দরবেশ, প্রাগুক্ত।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. প্রত্যক্ষদর্শী, শাহজাদা মাও. আব্দুল কাদের জিলানী, প্রাগুক্ত।

১৮. প্রাগুক্ত।

সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষভাবে সমালোচনা ও নিন্দা করেন। মাহফিল শেষে তিনি বাড়ী ফেরার পথে রায়পুর আলিয়া মাদরাসা সম্মুখে প্রতিপক্ষের ৫০/৬০ জনের একটি সশস্ত্র বাহিনী তাঁকে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু, তিনি তাদের সকলের সম্মুখ দিয়ে মটর সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরেন। প্রতিপক্ষ কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই তিনি বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার খবর পেয়ে তারা পরবর্তীতে আফসোস করেন।[১৯]

একবার সিলেটে একটি মাহফিলে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) প্রধান মেহমান হিসেবে আমন্ত্রিত হন। মাহফিলের স্টেজে উপস্থিত হলে (স্থানীয় পীর ও মাহফিলের সভাপতি যিনি তাঁর চেয়ে আরো বয়োবৃদ্ধ এবং পাকা দাড়ির অধিকারী ছিলেন) সাথে সাথে সভাপতি সাহেব তাঁর সাথে করমর্দন ও কদমবুচি করলে উপস্থিত জনতার ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি আরো বেড়ে যায়।[২০]

১৯৮২ সালে লক্ষ্মীপুর সদর থানার ১৭ নং ভবানিগঞ্জ ইউনিয়নের সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান ভবানীগঞ্জ কারামতিয়া সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাসা প্রাঙ্গনে তিনি মেহমান হিসিবে আমন্ত্রিত হন। বিরোধী পক্ষ উক্ত মাহফিল বন্ধের পাঁয়তারা করে। কিছুটা উত্তেজনা থাকায় মাগরিবের পর ৫/৬ জন ঈশার সালাতের পর ৫০/৬০ জন লোক হাযির হয়। ঈশার নামাযের এক ঘণ্টা পর আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) ওয়ায শুরু করলে কয়েক হাজার লোকে মাদরাসা মাঠ ভরে যায়। রাত ১১ টা হতে সাড়ে ১১ টার মাঝে অপতৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ হামলা চালালে মাহফিলে উপস্থিত লোকজনের প্রতিরোধে তা প্রতিহত হয় এবং উক্ত মাহফিল রাত ২.৩০ টা পর্যন্ত চলে, মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার প্রথম জনপ্রিয় ও জননন্দিত উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব নিজাম উদ্দীনের পিতা এবং বর্তমান ১৭ নং ভবানীগঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল ইসলাম রণির দাদা জনাব মৌলভী আজিজুর রহমান। গভীর রাতে সভাপতি সাহেব আল্লামা নক্সবন্দীসহ আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দকে রাতের খাবার খাইয়ে বিদায় দেন।[২১]

প্রতি রমযান মাসে তিনি নন্দনপুর জামে মসজিদে তাফসীর পেশ করতেন। মৌসুমী ফল নারিকেল, সুপারি, পেঁপে কলা ইত্যাদি তিনি তখন হাদিয়া পেতেন। এ সময় ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে তিনি মানুষের যথেষ্ট উপকার সাধন করতেন। কিন্তু, কোন বিনিময় নিতেন না।[২২]

১৯৭৬-১৯৭৭ইং সালের দিকে বৈশাখ মাসে নন্দনপুরের জনাব ঈসমাইল মিস্ত্রীসহ ৩/৪জন কাঠ মিস্ত্রী তাঁর ঘরের কাজ করছিলেন। তিনি ঘরের ভিতর হতে জানালা দিয়ে

---

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. প্রাগুক্ত।

২১. মাওলানা আবুল কাশেম। ৩১/০৫/২০১৬, নিজ বাসভবন, পশ্চিম নন্দনপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর, মাওলানা নক্সবন্দী (রহ.)-এর উক্ত মাহফিলের সফরসঙ্গী ও উক্ত মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র।

২২. ডা.আমিন উল্যা, এলোপ্যাথিক ফার্মেসী, নন্দনপুর বাজার, সরাসরি কথা, ০২/০৬/২০১৬ খ্রি. নন্দনপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর।

তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈসমাইল! সমগ্র আকাশ কালো মেঘে ঢেকেছে কিনা?' উত্তরে বললাম, হ্যাঁ, তিনি জানালা দিয়ে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, চিন্তা করো না, সব চলে যাবে। কিছুক্ষণ পর দেখি আকাশ পরিষ্কার। আমরা নিরাপদে কাজ করে বিকাল বেলা বাড়ি ফিরলাম।[২৩]

১৯৭৮ইং সনে সিলেটের মৌলভী বাজার জেলায় কোন এক মাহফিলে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে হাজির হন। জনৈক আলোচক আলোচনা করতে গিয়ে বলে ফেললেন যে, "আমরা বিবি ফাতেমাকে বিবাহ করতে পারবো।" এ কথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি খাবারের প্লেট থেকে হাত ধুয়ে দ্রুত অবসর হয়ে মঞ্চে গিয়ে সভাপতি সাহেবকে অনুরোধ করে উক্ত বক্তার আলোচনা বন্ধ করান। অতঃপর তিনি বক্তব্য শুরু করেন এবং পূর্ববর্তী বক্তার ভ্রান্ত বক্তব্য খণ্ডন করে ছয় ঘণ্টা আলোচনা করে কুরআন-হাদীস দিয়ে প্রমাণ করেন এরূপ বক্তব্য হারাম।[২৪]

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার সংকরকাঠি গ্রামে এক বিশাল সুন্নী সম্মেলনে প্রায় ৫০/৬০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে তিনি প্রধান মেহমান ছিলেন। বিকেল বেলা আকাশে কালো মেঘ ধরে গর্জন শুরু হলে মানুষ এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। সভাপতি সাহেবের অনুমতিক্রমে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) ঘোষণা করেন, "কেউ উঠবেন না, মাহফিলে কোন বৃষ্টি হবে না।" ঠিক কিছুক্ষণ পর পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক ঘন্টা বৃষ্টি হলেও মাহফিল স্থলে কোন বৃষ্টি হয়নি। সকলে মাহফিলের আলোচনা শ্রবণ শেষ করে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছান।[২৫]

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁর মেঝভাই জনাব হাফেজ সাইফুল্লাহ সাহেবের বড় মেয়ে জনাবা গুলজারা বেগমের জ্যেষ্ঠ কণ্যা রুমানা বেগমের বিবাহ পড়ানোর আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হন। জনাবা গুলজারা বেগমের স্বামী ঢাকার বনানীস্থ নৌবাহিনীর আবাসিক দালান "স্বর্ণলতা" এ জনৈক নৌ-অফিসারের বাসায় ভাড়া থাকতেন। গুলজারা বেগমের কন্যা রুমানার বিবাহ ঠিক হয় ব্যাংকে কর্মরত জনৈক অফিসারের সাথে। নির্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) বিবাহ মঞ্চে বিবাহ পড়ানোর জন্য হাযির হন। বিবাহ পড়ানো সম্পন্ন হতেই জনাবা গুলজারা বেগমের জামাতা তাঁর সম্মুখে হাযির হয়ে সালাম দিয়ে বললেন, "চাচা মিঞা মানুষ দাওয়াত দিয়েছি ৬০০ জন, এখন যা উপস্থিত হয়েছে, তাতে আমরা আত্মীয়-স্বজনরা বর পক্ষের মেহমান খাওয়ায়ে বাহির হতে খাবার এনে খেতে হবে।" আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) বললেন ঠিক আছে চলো তোমার পাকঘরে আমি

---

২৩. জনাব ইসমাইল মিস্ত্রী, ২নং ওয়ার্ড, নন্দনপুর, ২নং দক্ষিণ হামদাদি ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর-৩৭০০; সরাসরি কথা, তারিখ : ০৩/০৬/২০১৬ খ্রি.

২৪. শাহাজাদা জহিরুল করিম ফারুক, প্রাগুক্ত।

২৫. প্রাগুক্ত।

যাব। পাক ঘরে পৌঁছে তিনি প্রতিটি পাতিলের ঢাকনা উঠিয়ে চক্ষু বন্ধ করে ফুঁ দিলেন, অতঃপর উপস্থিত সকলকে নিয়ে খাবারের বরকত হওয়ার জন্য দোয়া করলেন। একটু পরে গুলজারা বেগমের স্বামীকে বললেন, "বাবা তোমার যা খাবার আছে তা উপস্থিত লোকজন খেয়ে শেষ করতে পারবে না"। ঠিকই উভয় পক্ষের প্রায় একহাজার জন খাওয়ার পরও ৪/৫ ডিস খাবার তাদের বাসায় ফিরিয়ে নিতে হয়। অতঃপর তা ঢাকাস্থ আত্মীয় স্বজনের বাসায় বাসায় বণ্টন করে দিয়ে সকলকে সন্তুষ্ট করা হয়।[২৬]

এরূপ একজন পরিচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) যা কখনো বাহ্যিক সমাজে বুঝা যেত না। কিন্তু অভ্যন্তরীন ও আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁর সাথে গভীরভাবে মিশলে ও চললে কেবল তাঁকে বুঝা যেত। তাঁর এরূপ চরিত্রের প্রভাবে যথেষ্ট মানুষ হিদায়াত ও সঠিক পথের দিশা পেতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তাঁর এরূপ কারামতের মাধ্যমে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানেই বিশ্ব মানবতাকে আহবান জানিয়েছেন। জাহিলিয়তের তিমির হতে দিশা দিয়ে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন ধর্ম-বর্ণ ও স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষকে।

পছন্দের খাবার

নাস্তা ও খাবারের ক্ষেত্রে তিনি বেশীরভাগ গরুর পায়া পছন্দ করতেন। পায়ার সাথে নানরুটি তাঁর বিশেষ পছন্দের অন্যতম। তিনি দুধযুক্ত ও চিনিবিহীণ চা পানে অভ্যস্থ ছিলেন। দৈনিক অন্তত ৩০/৪০ কাপ চা তিনি পান করতেন। যত রোগই হোক না কেন তিনি নিয়মিত মিষ্টি খেতেন। বিশেষত ছানা মিষ্টি বেশী পছন্দ করতেন। চট্টগ্রাম জামেয়া সুন্নিয়ার নিকটস্থ বিবির হাটের ছুফিয়া হোটেল হতে তাঁর মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরকে পাঠিয়ে নিয়মিত ছানা মিষ্টি ক্রয় করিয়ে এনে খেতেন। তাঁর ডায়াবেটিস রোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি মিষ্টি পরিত্যাগ করতেন না।[২৭]

পরিধানের সৌখিনতা

পরিধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সৌখিন ছিলেন। সুন্নাতের পূর্ণপাবন্দ যে কোন জামা-পায়জামা পছন্দ হলেই তা ক্রয় করতেন। অনেক সময় কোন কোন পরিধেয় ১ বারের বেশী পরিধান করতেন না। একবার পরিধানের পরই পুনরায় তা ধুয়ে মিসকিনকে দান করতেন। তাঁর ইনতিকালের পর ওয়ারড্রবে ৬০/৭০টি জামা ও ৫০শের অধিক পায়জামা পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি নিয়মিত ভাবে আতর, সুরমাসহ যাবতীয় সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

---

২৬. প্রাগুক্ত।

২৭. মাওলানা আতাউল করিম মুজাহিদ, প্রাগুক্ত।

চরিত্র মাধুর্য

আচরণিক ক্ষেত্রে সর্বদা ছিলেন স্বাধীনচেতা, যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে অতি তুচ্ছ বিষয়ে দ্বিমত হলেই সেখান হতে চাকুরি ছেড়ে চলে আসতেন। কেননা, অতীব মেধাবী, যোগ্য ও জ্ঞান পিপাসু মুহাদ্দিস হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে তাঁর বেশ চাহিদাও ছিল। তিনি যে কোন কর্মক্ষেত্র ছেড়ে এলেই অন্যত্র তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হতো। তাতে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদার আলোকে মান সম্মত দেখে যে কোনটিতে স্বীয় পছন্দমত যোগদান করতেন।

গভীর রাত পর্যন্ত অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকতেন, বিশেষত: চট্টগ্রাম জামেয়া আহম্মদীয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসায় প্রতি বছর ভারত, পাকিস্তান, কুয়েত, সৌদি আরব, মিশর ইত্যাদি দেশসমূহ হতে আগত নবনব গ্রন্থাবলী তিনি নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করে সমাপ্ত করতেন। তাঁর অধ্যয়নের স্বভাব ও একাগ্রতা দেখে অনেকেই আশ্চার্যান্বিত হতেন। আর এভাবেই তিনি নিজেকে একজন দক্ষ, যুক্তিবিদ ও তর্কবাগিশ রূপে কিতাবের হওয়ালা প্রদানে সক্ষমরূপে গড়ে তোলেন।[২৮]

২৮. প্রাগুক্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আদর্শ ও সফল শিক্ষকতা, পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষানুরাগের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী (রহ.) সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনে ছিলেন একজন আদর্শবান ও সফলতাপূর্ণ শিক্ষাগুরু। উন্নতমানের পাঠদান, সুস্পষ্ট ও সাবলীলভাবে তিনি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ফেক্হী মাসআলা-মাসায়েলসমূহ তাঁর শিক্ষার্থীবৃন্দের মাঝে উপস্থাপন করতেন। তাঁর পাঠদান অতীব সহজে শিক্ষার্থীগণ হৃদয়াঙ্গম করতে সামর্থ হতেন। সারা জীবন সত্যিকারের দ্বীনি আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহ গঠনে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।[২৯]

বিভিন্ন শ্রেণিতে পাঠদানকালে আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) শিক্ষার্থীদের পূর্ব দিবসের পাঠ প্রদানে ব্যর্থ হলে তিনি তাদেরকে কখনো ধমক, কখনো মৃদু প্রহার করতেন, ঐ সকল ধমক ও মৃদু প্রহারের বিনিময়ে সে সকল শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে মেধার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হতো। তাঁর হাতে প্রহৃত শিক্ষার্থীগণের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অতীব সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালনকালীন মৃদু প্রহারের মাধ্যমে যে সকল শিক্ষার্থী পরবর্তী জীবনে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের মাঝে অন্যতম হলেন, হবিগঞ্জের মাওলানা আব্দুল ক্বাদের, সাতক্ষীরার মাওলানা আবু বকর, মাদারটেক জামে মসজিদের খতিব মুফতি হাবেসুর রহমান আনোয়ারী প্রমুখ, এছাড়াও তিনি হোস্টেল পরিদর্শনকালীন সময়ে গভীর রাতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে পাঠ ভিন্ন অন্যকোন কাজে ব্যস্ত দেখলে অথবা কোন আড্ডা বাজিতে মত্ত দেখলে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে পাঠমুখী করে তুলতেন।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে এবং তাদের অভিভাবকগণকে ডেকে শিক্ষার্থীর পাঠোন্নয়ন ও ভাল ফলাফল অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। শিক্ষার্থীগণও তাদের অভিভাবকবৃন্দ তাঁর সুপরামর্শ অনুসরণে তাদের পাঠোন্নতি সাধন করে পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম সুখ্যাতি অর্জনে সক্ষম হতেন।

তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী হিসেবে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর হাতে গড়া শিক্ষার্থীগণ বহু মাদরাসা মসজিদ গড়ে তোলেন। এমনকি তিনি নিজ হাতে তাঁর গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার সদর থানার ৩নং দালাল বাজার ইউনিয়নের মহাদেবপুর গ্রামে স্বীয় পীরের নামানুসারে "এনায়েতিয়া দাখিল

---

২৯. স্মারক *আসলাফ-ই-জামেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

মাদরাসা" প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে তাঁর শিক্ষানুরাগীরূপে যথেষ্ট অবদান বিদ্যমান।

তাঁর প্রতিবেশী মাওলনা আবুল কাশেম সাহেবের পিতার ইচ্ছা ছিল তিনি ফাযিল পাশ করে অতঃপর পি.টি.আই পাশ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন। কিন্তু, আল্লামা নক্সবন্দীর (রহ.) পরামর্শে তিনি নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়ায় কামিল শ্রেণিতে ভর্তি হন। এবং সেখান হতে অত্যন্ত সুনামের সাথে ভাল ফলাফলের মাধ্যমে পাশ করে আসেন আর তিনি এখন কেবলমাত্র তাঁর উৎসাহেই নিজেকে মাওলানা রূপে পরিচয় দিতে সক্ষম হচ্ছেন।

এছাড়া তাঁর প্রতিবেশী মাওলানা ছফি উল্যা ফকির সাহেব, মাওলানা আবু সাইদ, মাওলানা আলী আকবর রেজভী, তাঁর বাড়ির মাওলানা ছফি উল্যাহ সাহেবেসহ উলামায়ে কিরামের সাথে তিনি গভীর সম্পর্ক রেখে চলতেন।[৩০]

৩০. মাওলানা আবুল কাশেম, প্রাগুক্ত।

আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) কোরআন সুন্নাহর একজন একনিষ্ঠ পাবন্দ রূপেখ্যাত ছিলেন। ফলে, তিনি নবীজীর জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ অনুকরণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। সততা, সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মানুষকে অনুপ্রানিত করত। তিনি সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রসংশনীয় চরিত্রের কিছু দিক নিম্নে তুলে ধরা হল:

সততা

বাস্তব বা প্রকৃত ঘটনার যথাযথবাবে উপস্থাপনের নাম সত্যবাদিতা। এ মহৎগুণের অধিকারীকে সাদিক (صادق) বা সত্যবাদী বলে। সত্যবাদিগণ ইহলৌকিক জীবনের যেমন সম্মান ও ইজ্জতের অধিকারী হয় তেমনি পারলৌকিক জীবনেও তাঁরা পরম সুখ-শান্তিতে জীবনাতিবাহিত করবেন। এমনকি বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'লা কোরআন মাজীদে ঘোষণা করেন:

هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

অর্থ : এসে দিন- যে দিন সত্যবাদীগণের জন্য তাদের সততা উপকার করবে, তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে, যার পদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত তাঁরা তথায় চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।[৩১]

আমাদের প্রিয় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশু কাল থেকেই সকলের নিকট সত্যবাদী এবং বিশ্বাসী বলে খ্যাত ছিলেন। তাই সর্বশ্রেণির সকল মানুষ তাঁকে আল-আমিন বলে আহবান করত এবং সম্মান করত। সত্যবাদিতার উপকারিতা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

فان الصدق طمانية وإن الكذب ريبة

হলো প্রশান্তি এবং মিথ্যা হলো সংশয়।[৩২]

আমানতের বিশেষ একটি গুরুত্ব বিদ্যমান। আখলাকে হামিদার অন্যতম চরিত্র হলো আমানত। আমানত রক্ষা করা মহান আল্লাহর নির্দেশ। পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'লা ইরশাদ ফরমান-

---

৩১. আল কুরআন, ৫ : ১১৯

৩২. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, *আল-জামে আত-তিরমিযী*, কিতাবুল মুয়াশিরাত, বাবু মা যায়া বিস ছিদকি, হাদীস নং- ১১

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে আমানতসমূহ যথার্থ মালিকদের নিকট প্রত্যার্পণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এবং তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার- ফায়সালা করবে তখন ন্যায় নীতির সহিত তা সম্পন্ন করবে।[৩৩]

এ আমানত রক্ষা করা প্রকৃত মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক, কেননা মুমিন ব্যক্তি মাত্রই আমানত রক্ষাকারী হতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান-

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ

অর্থ: যাঁর মধ্যে আমানতদারী নেই তাঁর ঈমান নেই।[৩৪]

আমানত বিনষ্ট করা বা খিয়ানত করা মুনাফিকের চরিত্র, ইহা ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তাঁর শত্রুরাও আমানতদার জানত। এবং তাঁর নিকট তাদের যাবতীয় মূল্যবান সম্পদ আমানত রাখত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমানতের খিয়ানতকে মুনাফিকের চরিত্রের অন্যতম নিদর্শন বলে আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন,

إِيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ أَذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থ : মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোন কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয়, তা খিয়ানত করে।[৩৫]

ইসলামী আদর্শে আমানতের খিয়ানত করা সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'লা স্বয়ং খিয়ানতকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট। কোরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহতা'লা খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।"[৩৬]

খিয়ানতের কারণে পার্থিব জীবনেও বিপযর্য়ের গ্লানি নেমে আসে। রাসূল আকরাম (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন-

اَلاَمَانَةُ يَصِيْبُ إِلَى الْغِنَى وَالْخِيَانَةُ يَصِيْبُ إِلَى الْفَقْر

---

৩৩. আল কুরআন, ৪ ঃ ৫

৩৪. ইমাম আহমদ আল্‌খোযায়ী, *মুসনাদ*, কিতাবুল ঈমান, বাবু আহমিয়্যাতিল ঈমান, হাদীস নং-৭৩

৩৫. *আস- সাহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমান, বাবুন নিফাক, হাদীস নং-০৭

৩৬. আল কুরআন, ৮ : ৫৮

অর্থ : আমানত স্বচ্ছলতা এবং খিয়ানত দারিদ্র ডেকে আনে।[৩৭] যে কোন খিয়ানতকারী- সর্বদা মানুষের আস্থা- বিশ্বাস ভঙ্গ করে- সামাজিকভাবে একজন চরিত্রহীন মানুষে পরিণত হয়। তাই তার সাথে কোন প্রকারের ব্যবসা, বাণিজ্য, লেন-দেন ইত্যাদি সম্পন্ন করতে মানুষ আগ্রহী হয় না, বরং তার প্রতি সর্বদা মানুষের ঘৃনাভাব বিদ্যমান থাকে। ফলে আর্থিকভাবেও সে বিপর্যয়ের মাঝে পড়ে।

আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) একজন অতীব আমানতদার ছিলেন। তাঁর আশপাশের প্রতিবেশীগন তাঁর নিকট বিভিন্ন জিনসপত্র আমানত রাখতেন। আল্লামা নক্সাবন্দী (রহঃ) তাঁদের আমানতসমূহ যথাসময়ে ফেরত দিতেন। এভাবে তিনি সমাজের একজন সত্যিকারের আমানতদার ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসার হোস্টেল সুপার থাকাকালীন সময়ে বহু শিক্ষার্থী তাদের টাকা-পয়সাসহ, বিভিন্ন জিনিসপত্র তাঁর নিকট আমানত রাখতেন, তিনি সেগুলো যথা সময়ে তাদের নিকট ফেরত দিতেন। তিনি কখনো কোন আমানতের খিয়ানত করেছেন বলে অদ্যাবধি কোন তথ্য শ্রুত হয়নি।

ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা

সকল মানুষের সাথে ভাই ভাই হিসেবে নিজের অনুভূতিকে ধারণ করা মানে সর্ব শ্রেণির মানুষের প্রতি দরদ নিয়ে ভ্রাতৃত্ব সুলভ চেতনা প্রকাশের নাম ভ্রাতৃত্ব। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভাইয়ের ন্যায় মনে করে স্বীয় আচার- আচরণে ভ্রাতৃত্ব সুলভ বাস্তব কর্মকান্ড উপস্থাপন করাই ভ্রাতৃত্ব।

স্বভাবত আমরা সহোদর ভাইয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করি, তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করি, স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করি, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসি, তাদের বিপদ- আপদকে নিজের বিপদ মনে করে সার্বিক সহায়তার চেষ্টা করি। অনুরূপভাবে বিপদ মনে করে সর্বাধিক সহায়তার চেষ্টা করি, অনুরূপভাবে দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি এরূপ মনোভাব পোষণ, লালন ও বাস্তব কর্মের মাধমে তা প্রকাশ ও প্রমাণ প্রদর্শনের নাম ভ্রাতৃত্ববোধ।

পাশাপাশি সর্বশ্রেণির মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সম্পর্ক- সম্প্রীতি বজায় রেখে চলার মাধ্যমে জাতি, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের সাথে মিলে মিশে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ চলার নাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ভ্রাতৃত্ব ও ভালবসাার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরস্পরের পরিপূরক।

সকল নীতিবাদ ও মানবতাবাদী মানুষ ভ্রাতৃত্ববোধ সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি ও ভালবাসাকে স্বীয় জীবনে অনুশীলন করে থাকেন।

ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা ব্যতিত কোন জাতি উন্নতি সাধন করতে সক্ষম নয়। ভ্রাতৃত্ব-ভালবাসা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ব্যতিত কোন দেশের শান্তি- শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা,

---

৩৭. *মুসনাদ,* প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, বাবু আহমিয়্যাতিল ঈমান, হাদীস নং-১৭

সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি রক্ষা করা শুধু কঠিন নয়, তা হুমকির সম্মুখীনও হয়ে থাকে। তাছাড়া ভ্রাতৃত্ববোধই মানুষকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জিবীত করে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা সহায়তা সহ যাবতীয় সৎ মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। পাক্ষান্তরে সমাজ হতে অন্যান্য, জুলম, অত্যাচার, নির্যাতন, অকল্যাণ, অপরাধ ইত্যাদি চিরততরেই তিরহিত হয়।

ইসলামী জীবনে ভ্রাতৃত্ব ভালবাসা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে সমাজের অন্যতম ভিত্তিরূপে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম) স্বয়ং সৌভ্রাতৃত্বের ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাস্তব নজীরসমূহ প্রদর্শন করে গিয়েছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সমাজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে তা কিরূপ কার্যকর।

ভ্রাতৃত্ব রক্ষার নিমিত্তে মানবতার নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাইহ ওয়সাল্লামের) উপর অবতীর্ণ আল- কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে সংশোধন কর এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।[৩৮]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থঃ হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝের সর্বোচ্চ তাকওয়াবান ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত।[৩৯]

বিশ্ব মানবতার মুক্তির সর্ব শ্রেষ্ঠ দিশারী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

---

৩৮. আল কুরআন, ৪৯ : ১০

৩৯. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمُ

অর্থঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।[৪০]

অন্য হাদীছে বলা হয়েছে-

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مألف ولاخير فيمن لا يألف ولا يولف

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম) ফরমায়েছেন, মুমিন ভ্রাতৃত্ব, ভাল বাসা ও দয়ার আধার। ঐ ব্যক্তির মাঝে কোন কল্যাণ নেই যে কারো সাথে ভালবাসা ও সম্প্রীতি রাখে না এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রাপ্ত হয়না।[৪১]

অপর হাদীছে উদ্বৃত্ত হয়েছে-

عن نعمان بن بشير رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

অর্থ : হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, তোমরা মুমিনদেরকে পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর এবং নিদ্রাহীনতাসহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে।[৪২]

অপর একটি হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে-

عن ابن عباس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع الى جنبه

৪০. *আস-সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৫২

৪১. প্রাগুপ্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২৩

৪২. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৯

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পটে পুরে খায়, অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার যাতনায় ভুগে।[৪৩]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন,

الناس بنو ادم وادم من تراب او طين

অর্থ : সকল মানুষই আদম (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরঃ আর আদম (আঃ) মাটির তৈরি।[৪৪]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন,

الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من أحسن الى عياله

অর্থ : সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন, সুতরাং, আল্লাহর পরিজনের সাথে উত্তম আচরণ ও অনুগ্রহকারী তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।[৪৫]

আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সাবন্দি মুজাদ্দেদী (রহঃ) সমাজের ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার এক অনন্য উদাহরণ ছিলেন। স্বীয় পরিবার- পরিজনসহ সমাজের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণির মানুষের সাথে তিনি ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়েই মিলিত হতেন। তাঁর পরিবারের সহোদর ভাইগণের সাথে তাঁর কখনো কোন বিষয়ে ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্ভাদ হয়নি। এমনকি স্থাবর- অস্থাবর সম্পদ এরূপ বিবাদ বিস্তারের কারণ হতে পারে দেখে তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য কোন জায়গা জমি রেখে যাননি। শুধুমাত্র তাঁদের জন্য বাড়ি ঘর তৈরি করে দিয়ে বলেছেন, "স্থাবর কোন সম্পদ আমি রাখব না, যা নিয়ে সন্তানদের মাঝে দ্বন্দ্ব- বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে, বরং আমি সকলের জন্য দোয়া করে গেলাম, সকলে ইনশাল্লাহ সুখে- শান্তিতে জীবন যাপন করবে।[৪৬]

এভাবে তিনি সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে শুধু নিজের জীবনে নন, সন্তান সন্ততির জীবনের প্রতিও সুদৃষ্টি রেখে গিয়েছেন। এমনকি নিজের পূর্বপুরুষগণের প্রদেয় স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়কৃত টাকা দিয়ে জনকল্যাণে বিভিন্ন বই ছাপিয়ে মানুষের জন্য রেখে গিয়েছেন। যে সকল বই পুস্তক অদ্যাবধি মানব কল্যাণে উলামায়ে হাক্কানীগণের কাজে প্রতিনিয়ত সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

---

৪৩. আহমদ ইবনে হোসাইন আল বায়হাকী, *বায়হাকী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২১১

৪৪. *তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং-২৮

৪৫. *বায়হাকী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং-৩৯

৪৬. কামরুন নাহার, আল্লামা নক্সবন্দীর (রহ.) দ্বিতীয় পরিবারের তৃতীয় কন্যা, উত্তরা, ঢাকা। তারিখ : ১৭-০৮-২০১৬ খ্রি.

পরহীতকারী

মানুষ সামাজিকভাবে বসবাস করতে হলে পস্পরের সহায়তাও সহযোগিতা করতে হয়। এরূপ অপরের উপকারে নিজেকে কাজে লাগানোর নামই পরহীত বা পরোপকার।

পরহীতকরণের- আরবী প্রতিশব্দ ইহসান (إحسان) বা অন্যের উপকার করা, সৃষ্টি কর্তার যাবতীয় সৃষ্টির প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে উত্তম ও যথাযথবাবে পালনের নামই পরহীত।

এর মাধ্যমে সৃষ্টি কর্তৃক স্রষ্টার ভালবাসা প্রাপ্তি সম্ভব ও সহজ হয় এবং সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'লা বলেন-

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থঃ তোমরা সৎকর্ম ও পরোপকার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীল ও পরোপকারীদেরকে ভালবাসেন।[৪৭]

ইহসানের মাধ্যমে শত্রু মিত্রে পরিণত হয় এবং মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভে বান্দা সক্ষম হয়। এবং পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা দারুনভাবে সৃষ্টি হয়। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন-

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থঃ মন্দের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তোমার মাঝে এবং তোমার শত্রুর মাঝে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব রূপ লাভ করবে।[৪৮]

রাসূল আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ফরমায়েছেন-

إرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء

অর্থঃ তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।[৪৯]

আল্লামা নক্সবন্দী (রহঃ) ছিলেন, পরহীতকরণের অনন্য প্রতীক। যে কোন মানুষ বিপদ-আপদে তাঁর নিকট থেকে ফিরে আসেনি। শারীরিক অসুস্থতা, লেন- দেন, যাতায়াত-যোগাযোগ, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ইত্যাদি যে কোন মানুষের

---

৪৭. আল কুরআন, ২ : ১৯৫

৪৮. আল কুরআন, ৪১ : ৩৪

৪৯. *তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, বাবু মা যায়া বির রিফক্কি, হাদীস নং-১৬

সমস্যা সমাধানে তিনি কায়িক, আর্থিক ও আন্তরিক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন। তাঁর নিকট কোন মানুষ বিমুখ হতেন না। তাঁর প্রতিবেশী ইসমাঈল মিস্ত্রী বলেন, "টাকা-পয়সা, বিপদ- আপদ, নিজের বা পরিবারের কোন অসুস্থতায় কোন দিন হুজুরের কাছে গিয়ে খালি হাতে ফিরি নাই।"[৫০]

শালীনতাবোধ

আরবী (التهذيب) (আত তাহযীব) শব্দের অর্থ শারীনতা, ভদ্রতা, নম্রতা ও লজ্জাশীলতা। মানুষের আচার- আচরণ, চাল- চলন, কথা- বার্তা, বেশ ভূষায় মার্জিত ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নামই শালীনতা।

এর মাধ্যমে মানুষ অন্যায়, অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে। এ চরিত্রের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অনুগত হয়। চাল- চলন, আচার- আচরণে শালীন ব্যক্তিকে সমাজে সকল শ্রেণির মানুষ পছন্দ করে। এর অভাবে মানুষ মানুষের বিরাগ ভাজন হয় এবং অশ্লীলতার অনুকরণকারী লোককে সমাজ পরিত্যাগ করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

اشر الناس من يهجره جاره بوائقة

অর্থ : মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।[৫১]

অশ্লীল ও অশালীন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'লা পছন্দ করেন না। বরং অশালীন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'লা ঘৃণা করেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম) বলেন,

إن الله يبغض الفاحش البندى

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'লা অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃনা করেন।[৫২]

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'লা ঘোষণা করেন-

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ○ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ○

৫০. ইসমাঈল মিস্ত্রী, প্রাগুক্ত।

৫১. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাবুশ শাফকাতি ওয়ার রাহমাতি আলাল খালকি, হাদিস নং- ১৬, পৃ. ৪২২

৫২. *তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, বাবু মা যা'য়া বিল ফাওয়াহিশি, হাদীছ নং-৪

অর্থ : অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না, পৃথিবীতে ঔদ্বতভাবে চলো না, কারণ আল্লাহ কোন ঔদ্ধত অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, তুমি পদচারণ কর সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বর সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। [৫৩]

শালীনতার এক মুর্ত প্রতীক ছিলেন আল্লামা নক্সবন্দী। চলন, বলন, আচার- আচরণ, সকল ক্ষেত্রে তিনি শালীনতা রক্ষা করে চলতেন। তাঁর শালীন আচরণে মুগ্ধ হয়ে মানুষ বিভিন্ন সময়ে তাঁর জন্যে বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকন নিয়ে আসতেন, মানুষ তাঁর প্রতি সদা সন্তুষ্ট চিত্তে আন্তরিক পরিবেশে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনিও সকলের জন্যে দোয়া করতেন।[৫৪]

সৃষ্টির সেবাকারী

আরবী খিদমাতুল খালকের (خدمة الخلق) বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টির সেবা, মহান আল্লাহ তালার প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হয়ে আদর- যত্ন করার নামই হলো সৃষ্টির সেবা। সৃষ্টি কুলের সবকিছু আল্লাহ তালা মানব কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। এদের প্রতি যত্নশীল ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সহানুভূতিশীল হওয়া সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে ও সুন্দর আচরণ করলে স্রষ্টা খুশী হন, আর সৃষ্টিকুলের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি মূলক দায়িত্ব পালনের নামই সৃষ্টির সেবা।

রাসুল আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান,

الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من أحسن إلى عياله

অর্থঃ সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর পরিবার, আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি প্রিয়, যে তাঁর পরিবারের প্রতি বেশী অনুগ্রহ করেন।[৫৫]

মানুষের ন্যায় হাঁস- মুরগি, গরু-ছাগল, কুকুর- বিড়াল, গাছপালা ইত্যাদি সকল প্রাণীর ক্ষুধা পিঁপাসা বিদ্যমান। এদেরকে খেতে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব ও সৃষ্টির সেবার অন্তর্ভুক্ত।

সমাজে কোন ব্যক্তি পীড়িত হলে তার সেবা করা, ঋণ গ্রস্থের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির বিপদ উদ্ধার করা, দুর্দশায় পতিত ব্যক্তিকে দুর্দশা মুক্ত করা ইত্যাদি সবই সৃষ্টির সেবার অর্ন্তভুক্ত।

---

৫৩. আল- কুরআন, ৩১ : ১৮-১৯

৫৪. মারজান বেগম, প্রাগুক্ত।

৫৫. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, বাবু হুসনুল খুলুকি, হাদীস নং-৪

সৃষ্টির সেবা করণে আল্লামা নক্সবন্দী (রহঃ) ছিলেন এক জলন্ত উদাহরণ। তিনি যে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা করতেন, নিজ হাতে ঔষধ তৈরি করে ফি সাবিলিল্লাহ মানুষকে দিতেন। যে কোন অসুখের সুস্থতার জন্য ঝাড়-ফুঁক দিতেন, তা ভাল হয়ে যেত। বিপদ- আপদ, দুর্দশাগ্রস্থ মানুষ, আত্মীয়- স্বজনকে সর্বদা সাহায্য সহায়তায় এগিয়ে আসতেন। মানবকতার কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন। সৃষ্টির সেবা ও স্রষ্টার ইবাদতের মত সৎ কর্মেই তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন।

শ্রমের মর্যাদা প্রদানকারী

মানুষের জীবন ধারণের জন্যে যে কাজ করে- তাহাই শ্রম নামে খ্যাত। মানবতার আত্ম ও সমাজ কল্যাণের নিমিত্তে এবং সৃষ্টি জীবের উপকার সাধনে মানুষের সম্পাদিত কাজই শ্রম। মানুষের উন্নতির চাবিকাঠি হলো শ্রম, যে জাতি যত বেশী পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশী উন্নত। মানুষকে শ্রমে উৎসাহিত করতে পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'লা ঘোষণা করেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অর্থঃ অতঃপর যখন নামায শেষ হবে তখন তোমরা যমিনের বুকে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষন করবে।[৫৬]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

অর্থঃ তিনিতো তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর দিক দিগন্তে বিচরন কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিকি হতে আহার করো। আর তোমরা তার প্রতি অনুগত হও।[৫৭]

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম উৎকৃষ্ট খাদ্য বলে আখ্যা দেয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ প্রসঙ্গে বলেন:

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

অর্থঃ হালাল রুজি উপার্জনের চেষ্টা করা ফরয ইবাদতের পর আরেকটি ফরয ইবাদত।[৫৮]

---

৫৬. আল কুরআন, ৬২ : ১০

৫৭. আল কুরআন, ৬৭ : ১৫

৫৮. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুইয়ূ, বাবুল কাসবি ও তালাবিল হালালি, হাদিস নং- ০১, পৃ. ২৪২

অন্য হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেন:

الكاسب حبيب الله

অর্থঃ পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু।[৫৯]

শ্রমজীবীদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেছেন,

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অর্থঃ আর এমন বহু লোক আছে যারা যমিনে ভ্রমন করে বেড়ায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ খোঁজে।[৬০]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়াসল্লাম) এ প্রসঙ্গ বলেন:

ما افضل شئ ما اكتسب بنفسه وكان داود اكتسب بيده

অর্থঃ নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আঃ) স্বহস্তে উপার্জন করে খেতেন।[৬১]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন:

أعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

অর্থ : মজুরের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী আদায় করে দেবে।[৬২]

আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) শ্রমের মর্যাদা প্রদানে এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি নিজেও শিক্ষকতার মহান পেশা, লেখনী এবং ব্যবসায় কাজে জড়িত হয়ে স্বীয় শারীরিক শ্রমে ব্যস্ত থাকতেন এবং শ্রমিকদের মজুরী প্রদানে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তাঁর নতুন বাড়ি ঘর তৈরীর কাজে জড়িত ছিলেন- পূর্ব নন্দনপুর গ্রামের জনাব ইসমাইল মিস্ত্রী। তাঁর ভাষায় "প্রতি বাজারের দিনে হুজুর আমাদের মিস্ত্রী কাজের পাওনা টাকা পরিশোধ করতেন, কোন দিন টাকা চাইতে হয়নি।"[৬৩] এছাড়া তাঁর বাড়ির পার্শ্ববর্তী যে সকল লোকজন তাঁর কাজকর্ম করতেন, সকলেই দিনের শেষে তাঁর থেকে পাওনা টাকা নিয়েই বাড়ি ফিরতেন। কখনও কারো পাওনা তিনি ধরে রাখতেন না, বা

---

৫৯. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ০১, পৃ. ২৪২

৬০. আল কুরআন, ৭৩ : ২০

৬১. *বুখারী*, প্রাগুক্ত, বাবুজ যারয়ি আলাল আরদি, হাদীস নং-১৭

৬২. *বায়হাকী*, প্রাগুক্ত, বাবুল মুয়ামিলাতি, হাদিস নং- ৩১

৬৩. ইসমাঈল মিস্ত্রী, প্রাগুক্ত।

ঘুরাতেন না। এরূপ এক অনন্য শ্রমও শ্রমিকের মর্যাদা প্রদানকারী মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন ছিলেন আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.)।

ক্ষমাশীল ব্যক্তি

আরবী (عفو) (আফ্উন) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ক্ষমা করা, মাফ করা, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। ইসলামী পরিভাষায় যে কোন ভুল- ত্রুটি, অন্যায়- অপরাধ, অত্যাচার- জুলুম ইত্যাদির বিপরীতে প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ হতে বিরত থাকার নাম ক্ষমা করা।

বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীন পরম করুণাময় মহিয়ান, গরিয়ান, সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষকে সুখ-শান্তির যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু, এত বিশাল অনুগ্রহ প্রদানের পরও মানুষ তাঁর নিয়ম-নীতির কথা, অনুগ্রহ উত্যাদি ভুলে গিয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়। কিন্তু, অবশেষে স্বীয় ত্রুটি বিচ্যুতি উপলব্ধি করে বিশ্ব স্রষ্টার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। কুরআনুল কারীমে তিনি বলেন,

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

অর্থঃ আর তিনি সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন, আর তারা যা করেন সে ব্যাপারে তিনি অবহিত আছেন।[৬৪]

সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি মানুষকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম) কে ক্ষমার নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করে বলেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থঃ আপুনি ক্ষমা করুন, সৎ কাজের আদশে দিন এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলুন।[৬৫]

আল্লাহ তা'লা আরো বলেন:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

অর্থঃ অতএব, আপুনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে পরমার্শ করুন।[৬৬]

---

৬৪. আল কুরআন, ৪২ : ২৫

৬৫. আল কুরআন, ৭ : ১৯৯

৬৬. আর কুরআন, ৩ : ১৫৯

আর মানুষের ভুল- ত্রুটি, ইত্যাদি ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং এ প্রসঙ্গে বলেন:

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ আর যদি তুমি তাদের মার্জনা কর এবং দোষ- ত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদেকে ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৬৭]

বিশ্বের ইতিহাসে ক্ষমা প্রদর্শনের মুর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। ইহুদী নারী কর্তৃক রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দাওয়াত দিয়ে বিষ মিশ্রিত গোশত খেতে দিলেও নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ক্ষমা করে দেন। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ও ইসলামের শত্রুদের ক্ষমা করে দেন। তিনি ঘোষণা করেন:

لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء

অর্থঃ আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।"[৬৮] পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ক্ষমার উদাহরণ দ্বিতীয়টি নেই।

সে সময় তিনি ইসলামের চরম শত্রু আবু সুফিয়ানসহ সকলকে হাতের নাগালে পেয়েও যেভাবে ক্ষমা করেছিলেন, মানবতার ইতিহাসে তা অত্যন্ত বিরল। ভুল বুঝতে পারার পর শত্রুরা অনুতপ্ত হলে আমরাও তাদের বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেব। কেননা, ক্ষমা একটি মহৎ গুণ।

আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ক্ষমা প্রদর্শনের এক অনন্য নযীর স্থাপনকারী ছিলেন। মানুষের বিভিন্ন দোষ- ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাদের কাজ কর্ম, চিকিৎসা, ইত্যাদি সার্বিক সহযোগিতা করতেন। পরিবারের সদসদের সাথে ও তিনি ক্ষমা সুন্দর আচরণ প্রদর্শন করতেন। শিক্ষার মহান পেশায় নিয়োজিত থাকা কালে তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদেরকে আদর স্নেহ করে পাশে নিয়ে অতিব যত্নসহকারে পাঠ দান করতেন।

স্বদেশ প্রেমী

স্বদেশপ্রেম মানে নিজ দেশের প্রতি ভালবাসা, প্রীতি ও বন্ধন। সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষ তার দেশের প্রতি মাটির প্রতি দেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক ও প্রীতিশীল হয়। মাতৃভূমি তথা দেশ ও দশের প্রতি এ প্রীতি ভালবাসা ও দরদের নামই স্বদেশ প্রেম।

---

৬৭. আল কুরআন, ৬৪ : ১৪

৬৮. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, বাবু ফাতহি মাক্কা, হাদীস নং- ৩৯

এ প্রেম একটি মহৎ গুণ। দেশপ্রেম মানেই দেশের ভু- খন্ডকে ভালবাসা, দেশের জনগণ, স্বাধীনতা, স্বকীয়তা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি- নীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, তাহজীব তামুদ্দন, কৃষ্টি- কালচার, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে গভীরভাবে ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান করা।

আজীবন মানুষের দেশের প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা অটুট থাকে, কোন কারণে দেশ ছেড়ে গেলেও দেশপ্রেমের অনুভূতি হ্রাস পায় না, স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা- সম্মান মানব মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। স্বদেশের প্রতি এরূপ আকর্ষণই স্বদেশপ্রেম।

একজন প্রকৃত মুমনি স্বদেশের প্রতি প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ আরবীতে বলা হয়-

حب الوطن من الايمان

অর্থঃ স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।[৬৯]

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনী থেকে স্বদেশ প্রেমের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। মক্কার কুফরী কায়েমী শক্তির অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে যখন তিনি মদীনায় হিজরত করছিলেন, তখন অশ্রু সজল নয়নে মক্কার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, "হে আমার স্বদেশ মক্কা! তুমি কতইনা সুন্দর। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমার নিজ গোত্রের লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করতো আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"[৭০]

দেশপ্রেম ও দেশসেবা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তা'লা দেশরক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে কিয়ামতের দিন বিরাট কল্যাণ প্রদান করবেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান-

رباط يوم وليلة لحماية الولاد افضل من صيام وصلاة شهر متعالى

অর্থঃ দেশ রক্ষায় একদিন এক রাতের প্রহরা ক্রমাগত এক মাসের রোযা ও সারা রাত ইবাদাতে কাটানো হতে উত্তম।[৭১]

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী দেশপ্রেমের একনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি ছিলেন। স্বদেশকে ভালবেসে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত থাকায় তিনি সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে

---

৬৯. আরবী প্রবাদ বাক্য

৭০. *বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, বাবুল হিজরাতি, হাদীস নং- ৩

৭১. ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফজলি হুব্বিল ওয়াতান, হাদীস নং-০৭

অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর শত সহস্র শিক্ষার্থীকে তিনি স্বদেম প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে সেদিন দেশ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়েছিলেন।

পরমতসহিষ্ণুতা

পরমত মানে অপরের মতামত। তা ব্যক্তিগত, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপরের মতামত বা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধই পরমত সহিষ্ণুতা।

অপর ব্যক্তি বা পক্ষের যে কোন মতামতের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষান করার নামই পরমত সহিষ্ণুতা।

ইহা এমন একটি গুণ যার দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে। সকল শ্রেণির মানুষ তথা প্রাণী শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ তথা সর্বত্র সদ্ভাব বজায় থাকে। সৌহার্দ ও সম্প্রীতির অনন্য নযীর সৃষ্টি হয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরমত সহিষ্ণুতার এক বাস্তব নযীর ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি, নেতা, নেত্রী বা পরিবারের সদস্যের বক্তব্য তিনি প্রথমে শ্রবন করতেন, অতঃপর ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে তার উত্তর দিতেন। এমনকি নবীজী (স.) প্রতিটি কথাকে বুঝিয়ে বলার জন্য তিন তিনবার উল্লেখ করতেন। হাদীস শরীফে বলা হয়ছে:

يعيد الكلام ثلاث مرات

অর্থ : তিনি তাঁর বাণীকে তিনবার উদৃত্ত করতেন। যাতে অপরাপর ব্যক্তিবর্গ বুঝে নিতে সক্ষম হয়।[৭২]

বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) নবীজীর চরিত্রের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি শ্রেণি কক্ষে পাঠদান কালে কোন শিক্ষার্থীর কোন প্রশ্ন বা মতামত থাকলে তা অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে প্রথমে শ্রবন করতেন, অতঃপর শিক্ষার্থীকে কুরআন- সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন।

অনুরূপভাবে তিনি যে কোন বাহাছ মুনাযারায় অংশ গ্রহণ করলে সর্বদা প্রতিপক্ষের বক্তব্য প্রারম্ভে শ্রবন করতেন এবং নোট করতেন। প্রতি পক্ষের সকল কথা শ্রবনান্তে তাদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও স্নেহবোধ রেখে কুরআন- সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসসহ বিভিন্ন ফতোয়া ও কিতাবের উদৃত্তি তুলে ধরে এবং মুসলিম মনিষীগণের রিওয়ায়াত বা বর্ণনা সমূহ বিবৃত

---

৭২. *তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল খুৎবা, বাবু মা যায়া বিখুৎবাতিন্নাবীয়ে (সা.), হাদীস নং- ১৩

করতেন। অত্যন্ত ক্ষুরধার, যুক্তি- তর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাতের দলীলকে সবোর্ধের যুক্তিপূর্ণ ও সঠিক প্রমাণ করে গণ মানুষের প্রীতি ও ভালবাসা নিয়ে বিজয়ীর ভেসে প্রস্থান করতেন। কিন্তু, কারো প্রতি অশ্রদ্ধা, অসম্মান ইত্যাদি প্রদর্শন করতেন না।

অন্যের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা

অন্যের প্রতি বলতে সাধারণত ৩ শ্রেণির মানুষকে বুঝায়। (১) মাতা- পিতা, (২) আত্মীয়- স্বজন, (৩) প্রতিবেশী। স্বীয় মা- বাবা, আত্মীয়- স্বজন, পাড়া- প্রতিবেশীর প্রতি আন্তরিক হয়ে তাদের পাওনা প্রদান ও তাদের সাথে উত্তম আচরণ, লেনদেন ইত্যাদি অতীব আন্তরিক ও কল্যাণকামী পরিবেশে সম্পন্ন করার নামই অন্যের প্রতি কর্তব্য পরায়নতা।

পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুস্পষ্টভাবে এ সকল ব্যাপারে উত্তম ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থঃ তোমাদের প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি পিতা মাতার একজন অথবা উভয়ে তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাঁদের প্রতি তুমি বিরক্তি সূচক শব্দ, 'উহ' উচ্চারণ করো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিওনা। তাঁদের সাথে সম্মানজনক ভাষায় কথা বলো।[৭৩]

সূরা বাক্বরায় আল্লাহ বলেন:

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

অর্থঃ বলুন, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের পিতা- মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবে।[৭৪]

এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন:

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى

৭৩. আল কুরআন, ১৭ : ২৩

৭৪. আল কুরআন, ২ : ২১৫

অর্থঃ আল্লাহর ভালবাসা লাভের জন্য নিকট আত্মীয়দের দান করে।[৭৫]

আরেকটি আয়াতে বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

অর্থঃ "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ন্যায়বিচার কায়েম করতে, পরস্পরের প্রতি ইহসান করতে এবং আত্মীয় স্বজনের অধিকার আদায় করতে নির্দেশনা দিচ্ছেন।[৭৬]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন এ ব্যাপারে অত্যন্ত অগ্রসেনা। তিনি উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে সঠিক ও যথার্থভাবে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করেছেন। তাঁর অনুসরণে যে কেউ এ সকল অধিকার আদায়ের চেষ্টা করলে অবশ্যই অনুকরণকারী ব্যক্তি সঠিকভাবে তাঁর কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে। এ ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে রাসূল (সা.) বলেন:

الجنة تحت اقدام الامهات

অর্থঃ মায়ের পদতলে সন্তানের বেহস্তে।[৭৭]

অন্য হাদীসে বলেন:

لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم

অর্থঃ "যে সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী লোক থাকে সে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না।[৭৮]

অন্যের সাথে সুন্দর আচরণ করতে নবীজী (স.) বলেন:

خير الجيران عند الله خيرهم لجاره

অর্থঃ আল্লাহর নিকট সে প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।[৭৯]

নবী কারীম (সাঃ) আরো ইরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করে।"[৮০]

---

৭৫. আল- কুরআন, ২ : ১৭৭

৭৬. আল কুরআন, ১৬ : ৯০

৭৭. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ্, হাদীস নং- ০১, পৃ. ৪১৮

৭৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ০৭, পৃ. ৪২০

৭৯. প্রাগুক্ত, বাবুশ শাফকাতি ওয়ার রাহমাতি আলাল খালকি, হাদীস নং- ৪১, পৃ. ৪২৪

রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন-

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة

অর্থ : সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ থকে নিরাপদ নয়।"[৮১]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চরিত্রের অনুকরণে আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর আত্মীয়- স্বজনদের ডেকে খোঁজ- খবর নিতেন। প্রতিবেশীদেরকে বিভিন্ন স্থানে চাকুরির ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের জন্য চাল, ডাল, তরিতরকারী ক্রয় করে স্বহস্তে পৌঁছে দিতেন।

অর্থাৎ নবীজীর সুন্নতের অনুসরণে তিনি তাঁর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করতেন।

হাদীছে এসছে- "হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, জিব্রাইল (আ.) একাধারে আমাকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য তাকিদ করেছেন। শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা হল যে, অচিরেই হয়ত এক প্রতিবেশীকে অপর প্রতিবেশীর উত্তরাধিকার বানিয়ে দেয়া হবে।"[৮২]

আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সকলের প্রতি তাদের অধিকার আদায়ে সযত্ন ছিলেন। পিতা-মাতার আদেশ নিষেধ তিনি পুংখানুপংখরূপে মেনে চলতেন। যে কোন দিকে যেতে মায়ের অনুমতি নিয়ে যেতেন। তাঁদের প্রতি অতীব কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধশীল ছিলেন। তাঁর মায়ের নির্দেশে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কারে বিপদের কথা শুনলেই সাথে সাথে দৌড়ে যেতেন। সকলের সমস্যা সমাধানে তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন।

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহবোধ সম্পন্ন

মানব চরিত্রের একটি প্রশংসনীয় আচরণ হলো বড়তের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা। একজন আদর্শ মানুষ বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করেন। প্রিয় নবী (স.) বড়দের সম্মান করতেন এবং ছোটদের আদর করতেন। তিনি সর্বদা ছোটদের আবদার রক্ষা করার চেষ্টা করতেন।

---

৮০. প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ০৮, পৃ. ৪১৯

৮১. প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাবুশ শাফকাতি ওয়ার রাহমাতি আলাল খালকি, হাদীস নং- ১৭, পৃ. ৪২২

৮২. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, বাবুল ওসিয়াতু ফি হুকুকিল আকরাবীন (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী) ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪, হাদীস নং- ৫৫৮০

বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করার গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখে এবং বড়রা ছোটদের স্নেহ করেন ও ভালোবাসেন। ফলে সমাজে এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মহানবী (স.) বলেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا○

অর্থ : সে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা-সম্মান করে না।[৮৩]

বড়দের সালাম প্রদান করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, সৌজন্য বজায় রেখে কথাবার্তা বলা, প্রয়োজনে বড়দের কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা করা, তাদের আদেশ উপদেশ মেনে চলা এবং বসা থাকলে উঠে তাদের বসার ব্যবস্থা করা ছোটদেরও মানবিক কর্তব্য।

বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পরকালে বিশেষ সাওয়াব অর্জিত হয় এবং জান্নাত লাভ সহজ হবে। ছোটদের আদর সোহাগ করা, তাদের ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করা বড়দের কর্তব্য। এতে ছোটদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

প্রিয় নবি (স.) বলেছেন:

مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ○

অর্থ : কোন বৃদ্ধকে যদি কোন যুবক বার্ধক্যের কারণে শ্রদ্ধা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ যুবকের জন্য বৃদ্ধ অবস্থায় এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে শ্রদ্ধা করবে।[৮৪]

"হযরত আবু যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের চাকর-চাকরাণী ও দাস-দাসীরা প্রকৃত পক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তা'লা তোমাদের অধিনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'লা যার ভাইকে তার অধিন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোন কাজ যেন না চাপায়। একান্ত যদি চাপানো হয় তবে তা সমাধান করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা উচিত।"[৮৫]

---

৮৩. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাবুশ শাফকাতি ওয়ার রাহমাতি আলাল খালকি, হাদীস নং- ২৪, পৃ. ৪২৩

৮৪. *তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, বাবু মা যাআ ফি ইকরামিশ শাইখি, হাদীস নং- ০৯

৮৫. আবুল হাসান নদভী, *এন্তেখাবে হাদীছ*, অনু. আব্দুস শহীদ নাসিম, চাকর-চাকারণীদের অধিকার অধ্যায়, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩খ্রি.), পৃ. ১৩৭

আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহের এক অনন্য নযীর স্থাপন কারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরই স্নেহে লালিত স্বীয় পরিবার-পরিজন, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সদা তাঁর স্নেহের কথা স্মরণ করেন। আর বয়োবৃদ্ধদের প্রতি তিনি অতীব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কখনো বড়দের সাথে কটুকথা বলতেন না বরং কোমল ভাষায় তাদেরকে সিক্ত করতেন।

সহপাঠী এবং সহকর্মীর সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তিত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বিভিন্ন লোকের সাথে মিলেমিশে কাজকর্ম করতে হয়। আমরা যে প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা বা বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত আছি সেখানো আমাদের আরো সহপাঠী বা সহকর্মী আছে। আমরা সবাই একই সাথে আমাদের নিজ নিজ কাজ করি। সহপাঠী বা সহকর্মীরা আমাদের ভাইবোনের মত। প্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে আমরা একে অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখি। আমাদের কেউ অসুস্থ হলে সেবা করা আমাদের কর্তব্য। প্রয়োজনে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন- বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, কারও না থাকলে তাকে দিয়ে সাহায্য করা উচিত। আমাদের মধ্য থেকে কারো মন খারাপ হলে, বিষণ্ন বা চিন্তিত হলে তার বিষণ্নতার ভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সহপাঠী বা সহকর্মীদের সাথে উত্তম আচরণ করা উচিত। তাদেরকে উত্তম শব্দে সম্বোধন করতে হবে।

কাউকে খাটো করে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে, একে অপরকে মর্যাদা দিতে হবে। সহপাঠীদের সাথে কটুবাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কারও মনে কষ্ট পেতে পারে এমন কোনো আচরণ থেকে বিরত থাকতে হয়। কেউ কোন বিপদে পতিত হলে বিপদ দূর করার চেষ্টা করতে হয়। কারো ব্যাথায় সান্ত্বনা দিতে হয়। কাউকে উপনামে ডাকা ঠিক নয়। কারো পেছনে লাগা বা কারো দোষ-ত্রুটি ধরে লজ্জা দেয়া উচিত নয়।

সকলের সুখে আমরা সুখী হই আবার কারো কোন দুঃসংবাদ শুনলে আমরা ব্যথিত হই। ধৈর্য ধারণের পরামর্শ প্রদান করি। কখনো কারো সুখবর পেলে আমরা তার আনন্দে শরিক হই।

বিশিষ্ট আলেম আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) সহপাঠী ও সহকর্মীদের প্রতি বিশেষ সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর সহপাঠী বা সহকর্মীগণ যে কেউ তাঁর নিকট এসে বিমূখ হতেন না। কারো সাথে তিনি কর্কষ বা রূঢ় আচরণ করতেন না, সকলকে মিষ্ট বচনে ও মার্জিত আচরণে আবদ্ধ করতেন। তাঁর সহপাঠীগণ সর্বদা তাঁর নিকট সহযোগিতাই পেতেন। আচরণ ব্যবহার ইত্যাদিতে সহপাঠীগণ খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। আচরনিক ক্ষেত্রে অতুলনীয় মানুষ রূপে সকলের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হব।

ওয়াদা পালন আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ওয়াদা পালন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। যে ব্যক্তি

ওয়াদা পালন করে তাকে সবাই ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে। ইসলামি জীবন দর্শনে ওয়াদা পালন করা আবশ্যক। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেণ। তিনি বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ○

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ!তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর"।[৮৬]

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ○

অর্থ : তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৮৭]

প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা পালন করা অত্যাবশ্যক। হাশরের ময়দানের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পুর্ণাঙ্গ মুমিন ও দীনদার হতে পারে না। আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে।

ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সৎ ও নৈতিক গুণাবলি অধিকারী ব্যক্তিগণ সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (স) বলেছেন-

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهُ ○

অর্থ : যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না তার দ্বীন নেই। [৮৮]

আমাদের প্রিয়নবি (স.) সর্বদাই ওয়াদা পালন করেছেন। সাহাবি এবং আউলিয়া কেরামের জীবনী পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা জীবনে কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। কেননা ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের নিদর্শন। মুনাফিকরা ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করে না। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের এরুপ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মুমিন মুসলমানের নিদর্শন হলো তারা ওয়াদা পালন করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

অর্থ : হে মুমিনগণ তোমরা যা পালন করো না এমন কথা কেন বলো ?[৮৯]

---

৮৬. আল-কুরআন, ৫ : ১

৮৭. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৪

৮৮. *মুসনাদে আহমদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আইমানি, হাদীস নং- ০৫

সুতরাং কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করলে বা চুক্তি সম্পাদন করলে তা পূর্ণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি- সফলতা লাভ করা যাবে।

কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিত্ব

আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম গুণ হলো কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষের সার্বিক উন্নতি ও সফলতার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। কর্তব্যপরায়ণতা হলো যথাযথভাবে কর্তব্য আদায় করা দায়িত্বসমূহ পালন করা ইত্যাদি।

মানুষ হিসেবে আমাদের উপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা সময়মতো সুন্দর ও সুচারুভাবে এগুলো পালন করা এবং এ ক্ষেত্রে কোনোরুপ অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ○

অর্থ : প্রত্যেকে যা করে তদানুসারে তার স্থান রয়েছে এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।[৯০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ○

অর্থ : যাঁরা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না, যে উত্তমরুপে কার্য সম্পাদন করে।[৯১]

মহান আল্লাহ আরও বলেন- প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না।[৯২]

অন্য আয়াতে রয়েছে-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ○

---

৮৯. আল-কুরআন, ৬১ : ২
৯০. আল-কুরআন, ৬ : ১৩২
৯১. আল-কুরআন, ১৮ : ৩০
৯২. আল-কুরআন, ৬ : ১৬৪

অর্থ : যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না, কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় -এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে।[৯৩]

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এসেছে-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ○

অর্থ : আল্লাহ কারও উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই।[৯৪]

কর্তব্যপরায়ণতা মানবজীবনে সফলতা লাভের প্রধানতম হাতিয়ার। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য। আমরা সবাই পরিবারের মধ্যে বসবাস করি। সুতরাং পরিবারের সদস্য যথা মাতা-পিতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সকলের প্রতি আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতিও আমাদের নানা কর্তব্য পালন করতে হয়। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আসলেও আমাদের পালন করতে হয়। এসব কর্তব্য সঠিক সময়ে যথাযথভাবে পালন করা উচিত। এগুলোর প্রতি সচেতন থাকা ও এগুলো সম্পাদনে সচেষ্ট হওয়াই কর্তব্যপরায়ণতা।

মানবজীবনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব অপরিসীম। যে ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ সকলেই তাঁকে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে সম্মান করে।

তিনি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেন। কর্তব্যপরায়ণতা মানুষকে সফলতা দান করে। ছাত্রজীবনে শিক্ষার্থীর কর্তব্য হলো শিক্ষকদের সম্মান করা। তাঁদের কথা মেনে চলা। ঠিকমতো লেখাপড়া করা বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। যে শিক্ষার্থী এসব কর্তব্য ভালোভাবে পালন করে সে সবার ভালোবাসা লাভ করে। শিক্ষকগণ তাকে পছন্দ করেন। সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। ভবিষ্যৎ জীবনেও সে সফলতা লাভ করে। অন্যদিকে যে শিক্ষার্থী কর্তব্যপরায়ণ নয়, তাকে কেউ পছন্দ করে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়।

কর্তব্যপরায়ণতা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি তাঁর সকল কর্তব্য সম্পাদন করেন। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার পাশাপাশি তিনি বাস্তবজীবনের সব দায়িত্ব কর্তব্যও পালন

---

৯৩. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬

৯৪. আল-কুরআন, ২ : ২৮৬

করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন -তারা কর্তব্য পালন করে এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিনের অনিষ্ট হবে ব্যাপক।[৯৫]

কর্তব্য কাজে অবহেলা করলে পরকালে সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে। একটি হাদিসে মহানবি (স) বলেছেন -

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ ○

অর্থ: তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।[৯৬]

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে আমাদের পরীক্ষা করার জন্য নানা দায়িত্ব কর্তব্য দিয়েছেন। পরকালে তিনি আমাদের সকলকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞানা করবেন। সেদিন কর্তব্যপরায়ণগণ সহজেই মুক্তি লাভ করবে। তাদের জন্য রয়েছে সফলতা ও জান্নাত। অন্যদিকে যারা দুনিয়াতে কর্তব্য কাজে অবহেলা করেছে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেনি তারা বিপদগ্রস্ত হবে। তারা শাস্তি ভোগ করবে। তাদের জন্য রয়েছে চিরশক্তি জাহান্নাম।

আমরা কর্তব্যপরায়ণ হতে সচেষ্ট হব। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করব। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করব।

আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.) ওয়াদা পালন ও কর্তব্যপালনে ছিলেন অত্যন্ত অগ্রসেনা। যেকোন ব্যক্তির সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি তিনি যথাযথভাবে সম্পাদন করতেন। তাঁর ওয়াদা পালনের পন্থাকে মনে হতো যে তিনি ওয়াদাকে একটা ঋণ মনে করতেন। ঋণ পরিশোধে মানুষ যেমন উদ্বিগ্ন থাকে, তেমনি তিনিও ওয়াদা পালনে সর্বদা আগ্রহী থাকতেন। যে কোন স্থানের মাহফিলের ওয়াদা ঋণ প্রদানের ওয়াদা, আলোচনার ওয়াদা, কোন তথ্য প্রদানের ওয়াদা, আলোচনার ওয়াদা, কোন তথ্য প্রদানের ওয়াদা ইত্যাদি যাবতীয় ওয়াদা পালনে তিনি খুবই অগ্রগামী ছিলেন। এমনকি তাঁর সকল কাজও তিনি স্বীয় কর্তব্য মনে করে সম্পন্ন করতেন। তিনি মেধায় যেমন ছিলেন অনুপম কর্তব্য পালনে ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। যে কোন কাজ তিনি ফেলে না রেখে তা যথাসময়ে সম্পন্ন করতেন।

পরিচ্ছন্নতার অধিকারী ব্যক্তি

পরিস্কার, সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে পরিচ্ছন্নতা বলে। শরীর, মন ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তুত সুন্দর ও পবিত্র রাখা, ময়লাআবর্জনা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত রাখাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। দুর্নীতিমুক্ত, ভেজালমুক্ত ও ঝামেলামুক্ত অবস্থাও পরিচ্ছন্নতার অন্যতম রুপ পরিচ্ছন্নতার আরবি প্রতিশব্দ হলো নাজাফাত। ইসলামি পরিভাষায় ,শরিয়ত

---

৯৫. আল-কুরআন, ৭৬ : ৭

৯৬. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আতইমা, বাবুদ দিয়াফাহ, হাদীস নং- ০১, পৃ. ৩৬৮

নির্দেশিত পদ্ধতিতে দেহ, মন, পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান ও পরিবেশ পরিস্কার ও নির্মল রাখাকে তাহারাত বলা হয়।

মানবজীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিচ্ছন্ন থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। নোংরা ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকা ইমানদারগণের স্বভাব নয়। বরং মুমিনগণ সদা সর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র থাকেন। রাসুলুল্লাহ (স) বলেন-

الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ○

অর্থ:পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[৯৭]

প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার জন্য পবিত্র থাকা অপরিহার্য। কেননা, পবিত্রতা ব্যতীত কোনো ইবাদত কবুল হয় না। সালাত আদায়ের জন্য মানুষের শরীর, পোশাক ও সালাতের স্থান পরিষ্কার ও পবিত্র হতে হয়। এগুলো নাপাক থাকলে সালাত শুদ্ধ হয় না। তেমনি আল কুরআন তিলাওয়াতের জন্যও পাক-পবিত্র হতে হয়। অপবিত্র অবস্থায় আল কুরআন স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ○

অর্থ :আর এটা (আল-কুরআন) পবিত্রগণ ব্যতীত আর কেউ স্পর্শ করবে না।[৯৮]

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সবাই ভালোবাসে। আল্লাহ তায়ালাও তাদের ভালোবাসেন পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ○

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন। [৯৯]

ইসলামি শরিয়তে পরিষ্কার-পবিত্র থাকার জন্য ওযু, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান করা হয়েছে। দৈনিক পাঁচবার সালাতের পূর্বে ওযু করার দ্বারা মানুষের সকল অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা দূরীভূত হয়।

পরিচ্ছন্নতাপূর্ণ জীবন

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা হলো হাত, পা,মুখ,দাঁত ও গোটা শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। কারও হাত, পা, মুখ, দাঁত তথা

---

৯৭. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাহারতি, হাদীস নং- ০১, পৃ. ৩৮

৯৮. আল-কুরআন, ৫৬ : ৭৯

৯৯. আল-কুরআন, ০২ : ২২২

গোটা শরীর অপরিষ্কার ও ময়লা দুর্গন্ধ থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। কেননা অপরিচ্ছন্ন মানুষকে সকলে ঘৃণা করে। গোসল করার দ্বারা আমরা নিজেদের শরীর পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি। শরীরের ময়লা ও দুর্গন্ধ দূর করতে পারি।

রাতের বেলা ঘুমানোর পর সকালে আমাদের মুখমন্ডল পরিচ্ছন্ন সতেজ ও নির্মল থাকে না। চোখে পিঁচুটি লেগে থাকে দাঁত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। খাদ্য গ্রহণ করলেও আমাদের দাঁতে ময়লা লাগে। সুতরাং দাঁত, মুখ, সদা-সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হয়। রাসুলুল্লাহ(স.)দাঁত পরিষ্কারের জন্য মিসওয়াক করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন আমার উম্মতের কষ্টের আশঙ্কা না করলে, আমি তাদের প্রত্যেক সালাতের আগে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।[১০০]

আমাদের অনেকে চুল ও নখ বড় রাখে। এতে দেখতে খারাপ লাগে। নখ হলে এতে ময়লা জমে। অতএব নখ কেটে ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে। চুল পরিপাটি করে রাখতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান। মহানবি (স.) একবার এলোমেলো চুলের এক লোককে দেখে বললেন এ ব্যক্তি কি চুল ঠিক করার কিছূ পেল না?

প্রস্রাব পায়খানা করে ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়াও ইসলামের বিধান। এজন্য প্রথমে ঢিলা কুলূপ ব্যবহার করতে হবে। এখন সহজলভ্য টিস্যু ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। অতঃপর পানি ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে। মহানবি (স.) বলেছেন- নিশ্চয় প্রস্রাবই বেশির ভাগ কবর আযাবের কারণ হয়ে থাকে।[১০১]

অপর একটি হাদিসে এসেছে- তোমরা প্রস্রাবের ছিটা-ফোঁটা থেকে বেঁচে থাক। কারণ কবরের বেশিরভাগ আযাব প্রস্রাবের ছিটা-ফোঁটা থেকে বেঁচে না থাকার কারণে হবে।[১০২]

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব সীমাহীন। সুতরাং আমরা প্রতিদিন গোসল করব। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে ভালোভাবে ওযু করব। আমাদের হাত পা নখ চুল দাঁত চোখ সবকিছূ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

পোশাকের পরিচ্ছন্নতা

দৈহিক পরিচ্ছন্নতার মতো পোশাকের পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার থাকলে দেহ মন ভালো থাকে কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ○

অর্থ: আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন।[১০৩]

---

১০০. *মিশতাকুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক, হাদীস নং- ০১, পৃ. ৪৪

১০১. প্রাগুক্ত, বাবু আদাবিল খালাই, হাদীস নং- ৩৬, পৃ. ৪৪

১০২. প্রাগুক্ত, বাবু আদাবিল খালাই, হাদীস নং- ০৩, পৃ. ৪২

আমাদের প্রিয়নবি (স.) সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতেন। কাপড়-চোপড় অল্প মূল্যের হতে পারে, ছেঁড়া ফাটা হতে পারে কিন্তু তা পরিষ্কার হওয়া উচিত। এজন্য সবসময় কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।

পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা

আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছ সবকিছূ নিয়েই আমাদের পরিবেশ্। ঘর-বাড়ি,গাছ-পালা, হাট-বাজার, স্কুল, মাদ্রাসা, দোকানপাট, রাস্তাঘাট, এসবই আমাদের পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত। এগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের কর্তব্য। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকলে নির্মল জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়।

যেখানে সেখানে কফ থুথু মলমুত্র ফেললে পরিবেশ নোংরা হয়। বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট ময়লা আবর্জনা, রাসায়নিক বর্জ্য, ডাস্টবিনে না ফেলে রাস্তাঘাটে ফেলা উচিত নয়। এতে রাস্তাঘাট ময়লা হয়। নোংরা-আবর্জনা আমাদের শরীরে পোশাকে লাগে। নানা রকম রোগজীবাণূ জন্মে। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

পানি ও বায়ূ পরিবেশের অন্যতম উপাদান। এ দুটো মানবজাজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পানি পান করি, পানিতে গোসল করি, কাপড় চোপড় পরিষ্কার করি। সুতরাং পানি ও বায়ু সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। পানিতে ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না। অনেকে পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করে। এটা ঠিক নয়। আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় মলত্যাগ করব। ফলে আমাদের বায়ুও দুর্গন্ধযুক্ত হবে না।

পরিবেশ আমাদের। এ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। সুতরাং আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক হব। আমাদের ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখব। সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাব। যানবাহন, বাসস্টেশন, ফেরিঘাট খেলার মাঠ, হাট-বাজারও পরিস্কার রাখা দরকার। আমরা এ ব্যাপারেও সচেষ্ট হব। এলাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সাহায্য করব।

আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববান ছিলেন। তাঁর জামা কাপড় ছিলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও ইস্ত্রী করা। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদের কোন কমতি ছিল না। তিনি পছন্দসই যেকোনো পোষাকই ক্রয় করতেন। তবে তা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো। সবসময় তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তাঁর শারিরীক সুগন্ধিতে অন্যরাও উৎসাহিত হতেন। জামা-কাপড়ে কোন রকম তিলাও তিনি পড়তে দিতেন না। সুতরাং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় তিনি অত্যন্ত তৎপর ব্যক্তিরূপে সকলের নিকট খ্যাতি অর্জন করেন।

---

১০৩. আল-কুরআন, ৭৪ : ০৪

আত্মশুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব

আত্মশূদ্ধি অর্থ হলো নিজের সংশোধন। নিজেকে খাটি করা, পরিশুদ্ধ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার স্মরণ আনুগত্য ও ইবাদত অন্য সমস্ত কিছূ থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাকেও আত্মশূদ্ধি বলা হয়।

আত্মশূদ্ধির আরবি পরিভাষা হলো তাযকিয়াতুন নাফস। একে সংক্ষেপে তাযকিয়াহও বলা হয়। স্বীয় আত্মাকে সবধরনের পাপ-পংকিলতা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রাখাই তাযকিয়াহ-এর উদ্দেশ্য।

প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুত দেহ ও অন্তরের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। দেহ হলো মানুষের হাত, পা, মাথা, বুক ইত্যাদি নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। আর অন্তর হলো আত্মা বা কল্‌ব। এদুটোর মধ্যে কাল্বের ভুমিকাই প্রধান। মানুষের অন্তর যেরুপ নির্দেশনা প্রদান করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তদ্রুপই কাজ করে থাকে। সুতরাং মানুষের কাজকর্মের শুদ্ধতার জন্য প্রথমেই কাল্বের সংশোধন প্রয়োজন। আর কাল্বের সংশোধনই হলো আত্মশূদ্ধি। কাল্‌ব যদি সৎ ও ভালো কাজের নির্দেশ দেয় তবে দেহও ভালো কাজ করে। একটি হাদিসে মহানবি (স) সুন্দরভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- জেনে রেখো শরীরের মধ্যে একটি গোশতপিন্ড রয়েছে। যদি তা সংশোধিত হয়ে যায়, তবে গোটা শরীরই সংশোধিত হয়। আর যদি তা কলুষিত হয় তবে গোটা শরীরই কলুষিত হয়ে যায়। মনে রেখো তা হলো কাল্‌ব বা অন্তর।[১০৪]

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র। তিনি পবিত্রতা ব্যতীত কোনো জিনিসই কবুল করেন না। সুতরাং ইবাদতের জন্যও দেহ মন পবিত্র হওয়া আবশ্যক। দৈহিক পবিত্রতা লাভ করলেই হবে না বরং অন্তরকেও পবিত্র করতে হবে। অন্য সবকিছূ থেকে মনকে পবিত্র রেখে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত হবে। আর অন্তর-আত্মার পবিত্রতা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

মানুষের আত্মিক প্রশান্তি, উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্যও আত্মশূদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মশূদ্ধি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। সদা সর্বদা ভালো চিন্তা ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। আত্মশূদ্ধি মানুষের চরিত্রে প্রশংসনীয় গুণাবলির চর্চার সুযোগ করে দেয়। পক্ষান্তরে যার আত্মা কলুসিত- সে নানাবিধ পাপ চিন্তা ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত

---

১০৪. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৫০

থাকে। সে অন্যায়-অত্যাচার, সন্ত্রাস-নির্যাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না। ফলে সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা ও বিকাশের জন্য আত্মশূদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

আত্মশুদ্ধি মানুষকে বিকশিত করে সফলতা দান করে। ইহজীবনে আত্মশুদ্ধি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে। এরুপ মানুষ সবধরণের কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে, সকল পাপাচার ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে সে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে।

বস্তুত আত্মশুদ্ধি হলো সফলতা লাভের মাধ্যম। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে ব্যর্থ সে দুর্ভাগা। সে কখনোই সফলতা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○

অর্থ : নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখবে সেই সফলকাম হবে আর সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে।[১০৫]

পরকালীন জীবনের সফলতা এবং মুক্তিও আত্মশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে, নিজ আত্মাকে পবিত্র রাখবে পরকালে সেই মুক্তি লাভ করবে। তার জন্য পুরষ্কার হবে জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ○ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ○

অর্থ: সেদিন ধনসম্পদ কোনো কাজে আসবে না, আর না কাজে আসবে সন্তান-সন্ততি। বরং সেদিন সে ব্যক্তিই মুক্তি পাবে যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে আসবে।[১০৬]

মূলত ইহ ও পরকালীন সফলতা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। এজন্যই ইসলামে আত্মশুদ্ধির প্রতি অত্যধিক গুরুতরোপ করা হয়েছে।

আত্মশুদ্ধির উপায়

মানুষের অন্তর হলো স্বচ্ছ কাঁচের মতো। যখনই মানুষ খারাপ কাজ করে তখনই তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। এরূপ বারবার পাপ করতে করতে এক সময় তাদের অন্তর কলুষিত হয়ে যায় এবং একদা তাদের অন্তরে পুরোপুরি কলুষিত হয়ে যায়। আল্লঅহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেছেন-

كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

১০৫. আল-কুরআন, ৯১ : ৯-১০

১০৬. আল-কুরআন, ২৬ : ৮৮-৮৯

অর্থ : কখনোই নয় বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে।[১০৭]

মানুষের কাজের কারণেই মানুষের অন্তর কলুষিত হয়। সুতরাং আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায় হলো খারাপ কাজ ত্যাগ করা এবং কুচিন্তা কুঅভ্যাস বর্জন করা। সদাসর্বদা সৎচিন্তা নৈতিক ও মানবিক আদর্শে নিজ চরিত্র গড়ে তোলার দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

মহানবি (স.) বলেছেন- প্রত্যেক বস্তুরই পরিশোধিক যন্ত্র রয়েছে। আর অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র হলো আল্লাহর যিকির।[১০৮]

বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের কালো দাগ ও মরিচা দূর করা যায়। যিকিরের মাধ্যমে আত্মা প্রশান্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। এ ছাড়া তওবা ইস্তিগফার তাওয়াক্কুল, যুহুদ, ইখলাস, সবর, শোকর, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ইত্যাদির মাধ্যমেও আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

আত্মশুদ্ধির এক জলন্ত প্রতিভা ছিলেন আল্লামা নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)। তাঁর মাঝে কোন প্রকার হিংসা, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, গর্ব ইত্যাদি বর্জনীয় চরিত্রসমূহ পরিলক্ষিত হতো না। বরং তিনি বিনয়, নম্রতা, নমনীয়তা, কোমলতা, সামাজিকতা, ন্যায়নীতি, মাধুর্য ইত্যাদি সচ্চরিত্রাবলী অর্জন করেছেন। এমনকি স্বীয় আত্মশুদ্ধির ফলেই নবী কারীম (সা.) কে বার বার পেয়েছেন।

নারীর প্রতি সম্মানবোধ

নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহর অন্যতম। এটি একটি মহৎগুণ। নারীর প্রতি সম্মানবোধ ব্যাপক অর্ধবোধক। সাধারণ অর্থে নারীকে সম্মান প্রদর্শনের অনুভূতি বা মনোভাবকে বুঝিয়ে থাকে। আর ব্যাপকার্থে নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো নারী জাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব। যেমন সৃষ্টির বিচারে নর ও নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদান, নারী বলে কাউকে ছোট মনে না করা, নারী হিসেবে কাউকে ঠাট্টা বিদ্রুপ না করা। বরং যথাযথভাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা। তাদের কাজ করার সুযোগ প্রদান করা, তাদের মাল-সম্পদ ইজ্জত সম্মানের সংরক্ষণ করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের প্রকৃত উদাহরণ।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

---

১০৭. আল-কুরআন, ৮৩ : ১৪

১০৮. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দাওয়াতি, বাবু যিকরিল্লাহি ‘আযযা ও জাল্লা ওয়াত তাকাররুবি ইলাইহি, হাদীস নং- ২৪, পৃ. ১৯৯

ইসলামে নারীদের প্রভূত সম্মান দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বজগৎ বিশেষ করে আরব সমাজ অজ্ঞতা ও বর্বরতা অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সে সময় নারীদের কোনো মান মর্যাদা ছিল না। তাদের কোনোরূপ অধিকার ছিল না। সেসময় নারীদের দ্রব্যসামগ্রী মনে করা হতো। তাদের ক্রীতদাসী হিসেবে বাজারে কেনাবেচা করা হতো। তারা ছিল ভোগ্যপণ্য, আনন্দদায়ক প্রেমদায়িনী, সকল ভাঙনের উৎস, নরকের দরজা, অনিবায পাপ ইত্যাদি নামে খ্যাত। এমনকি কোনো কোনো সভ্যতায় তাদের বিষধর সাপের সাথে তুলনা করা হতো। অনেক সময় নারীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তৎকালীন আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অপমানজনক মনে করত ও কণ্যা শিশূকে জীবন্ত করব দিত। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ হীন কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।"[১০৯]

ইসলাম নারীদের এহেন অপমানকর অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদের অধিকার ও মর্যাদার ঘোষণা দান করেছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীদের অবদান ও ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মানুষকে নারীর প্রতি সম্মানবোধের আদেশ করেছে। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান

সৃষ্টিগতভাবে ইসলামে নর নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং মানুষ হিসেবে তারা উভয়ই সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা নর নারী উভয়ের মাধ্যমেই মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এতে কারও একার কৃতিত্ব নেই। বরং উভয়েই সমান মর্যাদা ও কৃতিত্বের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ أُنْثَى ○

অর্থ : হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও নারী থেকে।[১১০]

ধর্মীয় স্বাধীনতা মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছে। ধর্মীয় কর্তব্য পালন ও ফল লাভের ক্ষেত্রে নর নারীতে কোনোরুপ পার্থক্য করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ঈমান গ্রহণ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যেই সৎকর্ম করবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ ব্যাপারে কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।

---

১০৯. আল-কুরআন, ১৬ : ৫৮

১১০. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও ইসলাম নারীদের মর্যাদা ও সম্মানের ঘোষণা প্রদান করেছেন। মা হিসেবে নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছে। রাসুলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেছেন -

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ ○

অর্থ : মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।[১১১]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, একদা জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন,আমার সদ্বব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন,তোমার মাতা,ঐ সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর কোন ব্যক্তি ? রাসুল (স.) বললেন তোমার মাতা। এভাবে পরপর তিনবার এরুপ প্রশ্ন করলে রাসুল(স.)একই উত্তর দিলেন। চতুর্থবারে রাসুলুল্লাহ বললেন তোমার পিতা। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের উপর পিতার চাইতেও মাতার অধিকার তিন গুণ বেশি। এটি মা হিসেবে নারীরর অনন্য মর্যাদার পরিচায়ক।

কন্যা হিসেবেও নারীর মর্যাদা অপরিসীম। ইসলাম কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হারাম করেছে। তাদের ভালোভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে। স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান অনুরূপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন -

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ○

অর্থ : নারীদের তেমনই ন্যায়সংগত অধিকার আছে ,যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।[১১২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ○

অর্থ : তারা (নারীগণ) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ।[১১৩]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে। নারীগণ স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হিসেবেও তারা সম্পদ লাভ করবে। তাদের সম্পত্তিতে শূধূ তাদেরই কতৃত্ব থাকবে। তারা তাদের

---

১১১. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ০২, পৃ. ৪২১

১১২. আল-কুরআন, ২ : ২২৮

১১৩. আল-কুরআন, ২ : ১৮৭

ধন সম্পদ স্বাধীনতাভাবে ব্যয় করতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।[১১৪]

এভাবে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা ঘোষণা করেছে। ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নারীদের এ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে।

নারীর প্রতি সম্মানবোধের উপায়

নারীর প্রতি সম্মানবোধ মানুষের উত্তম মন-মানসিকতার পরিচায়ক। শুধু অন্তর দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা দেখালেই চলবে না বরং নিজ কাজ-কর্ম ও আচার ব্যবহার দ্বারা এর প্রমাণ দিতে হবে। আমাদের পরিবারে ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যেমন- মা, মেয়ে, বোন, স্ত্রী, দাদি, ফূফূ, খালা রয়েছেন তেমনি শিক্ষিকা, সহপাঠী ও নারী সহকর্মী রয়েছেন। এদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা যথাযথ শ্রদ্ধা-সম্মান ও মায়া-মমতা প্রদর্শন জীবন ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রদান করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের নিদর্শন। আল-কুরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে নানা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন-

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ ○

অর্থ: "তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে।"[১১৫] অর্থাৎ তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না, যথাযথভাবে তাদের হক আদায় করবে। বিদায় হজের ভাষণেও মহানবি (স.) নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

স্ত্রীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ○

অর্থ : তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবনযাপন করবে।[১১৬]

রাসুলুল্লাহ (স) স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহারকারীদের উত্তম উম্মত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ○

---

১১৪. আল-কুরআন, ০৪ : ৩২

১১৫. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহি, বাবু ই'লামিন নিকাহি ওয়াল খুতবাতি ওয়াশ শারতি, হাদীস নং- ০১, পৃ. ২৭২

১১৬. আল-কুরআন, ০৪ : ১৯

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।[১১৭]

অন্য একটি হাদিসে রাসুলূল্লাহ (স.) বলেছেন নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী ঐ মুমিন ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও নিজ পরিবারের প্রতি অধিক সদয়।[১১৮]

বস্তুত নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা মুমিনের নিদর্শন। নারীর প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে ঈমান পূর্ণ হয় না।

আমাদের প্রিয়নবি (স) নারীদের শ্রদ্ধা করতেন এবং স্ত্রী ও মেয়েদের ভালোবাসতেন। একদা তিনি সাহাবিগণকে নিয়ে বসা ছিলেন। এ সময় হালিমা (রা.) তাঁর নিকট আসলেন। হযরত হালিমা ছিলেন মহানবি (স.) এর দুধমাতা। নবি করিম (স.) তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজ চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। এভাবে প্রিয়নবি (স) তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখালেন।

কন্যা সন্তান প্রসঙ্গে নবি করিম (স.)বলেছেন যে ব্যক্তির কোনো কন্যা সন্তান থাকে, আর সে তাকে জীবন্ত কবর দেয় না, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না, অন্য সন্তান অর্থাৎ ছেলে সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয় না সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১১৯]

অন্য একটি হাদিসে একদা জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স:) কে জিজ্ঞাসা করলেন- আমাদের উপর স্ত্রীদের কী অধিকার রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন তুমি যা খাবে তাদেরও তা-ই খাওয়াবে, যা পরিধান করবে, তাদেরও তাই পরিধান করাবে, তাদের মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, তাদের গালিগালাজ করবে না, আর গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তাদের বিচ্ছিন্ন রেখো না।[১২০]

নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহর অন্যতম। পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের জন্য এ গুণ থাকা আবশ্যক। অন্তর থেকে নারীদের সম্মান করতে হবে। মায়া-মমতা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং স্ত্রী ও মেয়েদের ভালোবাসতে হবে। পাশাপাশি নিজ আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারাও এর প্রমাণ দিতে হবে। নারীদের কোনোরূপ অত্যাচার করা যাবে না, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না, ইভটিজিং করা যাবে না, তারা মনে কষ্ট পায় বা তাদের সম্মানহানি হয় এরূপ কোনো কাজ করা যাবে না। বরং সদাসর্বদা তাদের প্রাপ্য ও অধিকার আদায় করতে হবে। প্রয়োজনমতো তাদের উৎসাহিত ও

---

১১৭. *তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, বাবু মা যায়া বির রিফক্বি, হাদীস নং- ১২

১১৮. *তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, বাবু মা যায়া ফি খুলুক্বিল হাসানি, হাদীস নং- ০৬

১১৯. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাবুশ শাফকাতি ওয়ার রাহমাতি আলাল খালক্বি, হাদীস নং- ০৯, পৃ. ৪২১

১২০. প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ইশরাতুন নিসাই ওমা লিকুল্লি ওয়াহিদিম মিনাল হুক্কুক্বি, হাদীস নং- ০৮, পৃ. ২৮১

অনুপ্রাণিত করতে হবে। এভাবে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়। এতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারব।

নারীর প্রতি সম্মানবোধের ক্ষেত্রে এক প্রথিতযশা মহত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল্লামা ফজলুল করীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.)। তিনি তাঁর মায়ের নির্দেশে ও পরামর্শে প্রথম স্ত্রীর অসুস্থতার দরুন দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কিন্তু, কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালনকালীন তাঁরই মাদরাসার বয়োবৃদ্ধ পিয়ন খুবই শ্রদ্ধাভরে আবেগের তাড়নায় তার একটি কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের জন্য বিনীত আবেদন করলে অধ্যক্ষ হয়েও নারীর প্রতি সম্মানবোধের জন্যেই তিনি তা নিষেধ করতে পারেননি। বরং অতীব স্নেহের সাথে তিনি স্বীয় পিয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করে তার মেয়েকে তৃতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অতীব সৌন্দর্য্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেন, এমনকি তাঁর স্ত্রীগণ কখনো একে অপরের সাথে কোনরূপ ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার কোন নজীর নেই এবং তিনি কোন স্ত্রীর প্রতি কখনো বিমাতাসুলভ আচরণও করেননি। যেকোন বস্তু সমভাবে তিন পরিবারের জন্যই গ্রহণ করতেন। কখনো কাউকে ঠকিয়ে অপর পরিবারকে অগ্রাধিকার প্রদানের নূন্যতম মানসিকতা পোষণ করেননি। সকলের প্রতি সমতার নীতি গ্রহণ করে সবাইকে সুন্দর মনোরম পরিবেশে পরিচালনা করেন।

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

স্বাধীন বাংলাদেশের এক যশস্বী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসা। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গবেষণা, চরিত্র-মাধুর্য ইত্যাদি জগতে এ মাদরাসা শত-সহস্র আলেম উপহার দিয়েছে। আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) তাঁদের মাঝে অন্যতম কীর্তিমান ও প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। তাঁর ইহধামে আগমনকালীন সময়ে উপমহাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বড় ধরনের কুসংস্কার প্রভাবিত সংকটে নিপতিত হয়। এ সময় ধর্মীয় দিক যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও দারুন সংকটে পতিত হয়। বিশেষত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল ও ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট রকমের ভুল বুঝাবুঝি পরিলক্ষিত হয়। আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.)-এর সচেতন-দূরদর্শী ধর্মীয় বক্তব্য, বিবৃতি ও তাৎক্ষণিক চিঠি মানুষকে সর্বদা বাস্তবতা ও সঠিকতার প্রতি উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। স্বীয় প্রত্যয়, সংকল্পে দৃঢ়তার কারণে তিনি বহু তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হতেন। বিভিন্ন মাজলিসে, মুনাযারা, বাহাছে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা সর্বজনবিদিত। আর নিয়মিত অধ্যয়ন, গভীর রাত অবধি বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর নিগুঢ় তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাই তাঁকে এরূপ যোগ্যতা সৃষ্টিতে সক্ষম করে তোলে।

তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলিম জাতিকে নির্ভেজাল ও নিখুঁত সুন্নাতের তালীমে আবদ্ধ করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং তাদের ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক নাজাতের পথের ভীত রচনা করা। এ মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনেই কেবল অধ্যাপনা, লেখনী, গ্রন্থ প্রণয়ন, ওয়ায-মাহফিল, বাহাছ-মুনাযারা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সম্পাদনে তিনি যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছেন। এ জাতীয় ঝুঁকি নিয়ে তিনি সুন্নতের আলোকে এক শিক্ষা বিপ্লব সৃষ্টিতে সক্ষম হন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত করেন শত-সহস্র নিজের গড়া শিক্ষার্থীকে। যাঁরা ছিলেন দ্বীনি ইলমে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী আলিমেদ্বীন।

তিনি শুধু নিজের কথা ভাবতেন না। তিনি ছিলেন জাতির একজন পুরোধা। জাতির কল্যাণে যে কোন জাতীয় সংকটে তিনি ভূমিকা রাখতেন।

আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী একজন অভিজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, পারঙ্গম ও আমল-আখলাকধারী আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর মহান জীবন ও অবদান ব্যাপকভাবে ও সঠিকভাবে তুলে ধরা আমার ন্যায় অতি নগণ্য জ্ঞানচর্চাকারীর পক্ষে সুকঠিন। তবুও নিরলস প্রচেষ্টা, অদম্য স্পৃহা এবং লেখনী ও অনুসন্ধান জগতে ক্রমশ লেগে থাকার ব্যাপক প্রচেষ্টায় মহান রব্বুল আলামীন হয়ত রহমতের আধার দিয়ে কৃপা করেছেন বিধায় এ দুরূহ কাজকে আয়ত্ব করা সম্ভব হয়েছে। আমি মনে করি এ আলোচনা উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠক তাঁকে যেমন জানবেন, তেমনি শিক্ষা-দীক্ষা আদর্শ ও সুন্নাতের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি অনুপ্রাণিতও হবেন। তাঁর জীবনীর এ অধ্যায়গুলো হয়ত পাঠক সমাজকে আগামী দিনে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক পথ সন্ধানে দিশা দিতে সক্ষম হবে।

আধুনিক বাংলায় সুন্নতের যে আলোকবর্তিকা ও অবস্থানটুকু পরিলক্ষিত তা আল্লামা ফজলুল কারীম নক্সবন্দী (রহ.) সহ অসংখ্য ওলামা-মাশায়েখে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবদানেরই ফল। আল্লামা নক্সবন্দী (রহ.)-এর সম্পাদনায় বের হওয়া মাসিক তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ছিল যাবতীয় শিরক, বিদয়াত, সন্ত্রাস, অপরাধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার এক ক্ষেপনাস্ত্রতুল্য প্রকাশনা, যা আজো মানব মনকে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ অনুসন্ধানে তৎপর করে তোলে।

আল্লামা নক্সবন্দীর (রহ.) জীবনপঞ্জী সংক্রান্ত অভিসন্দর্ভখানি অধ্যয়নে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকসহ জীবন পরিচালনার আবশ্যকীয় শাখা-প্রশাখায় বিশেষ শিক্ষা লাভের যথেষ্ট অবকাশ বিদ্যমান। তাঁর প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণের ফলে পাঠক সৎসঙ্গ লাভেরও বিশেষ প্রয়াস পাবেন।

যে কোনো ব্যক্তি মাত্রই সৎসঙ্গ লাভে সক্ষম হলে তার জীবনধারায় স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তনের লক্ষণ সূচিত হয়। প্রবাদের ভাষায় প্রমাণিত হয় যে, "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস"। বাস্তবিকই সৎ ও সত্যের সন্ধান পেলেই কেবল মানুষ তার গন্তব্যে যথাযথভাবে পৌঁছতে পারে। পায় সঠিক পথের দিশা।

তাঁর জীবনের বিভিন্ন ধারা ও সময়গুলোর প্রতি আলোকপাত করলে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহ, তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও উক্ত পথের পথিকগণের উত্তরসূরী হওয়ার সঠিক পথে চলার সত্যিকারের সুযোগ পেলে তিনি সত্যের আলোকবর্তিকা সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজকে কলুষমুক্ত ও পাপ-পংকীলতার অবক্ষয় হতে রক্ষা করে হয়ে উঠতে পারেন একজন সত্যবাহী কাণ্ডারী। যাঁকে অনুসরণ-অনুকরণ করে তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম যুগ যুগ ধরে সত্যালোকের সন্ধান পায়। সে আলোকরশ্মির উজ্জ্বলতম রাহে আত্মপরিচালনার মাধ্যমে নিজেরা যেমন উপকৃত হয় তেমনি পরহীত সাধনেরও সুযোগ পায়। পেয়ে যায় প্রকৃত আদর্শের অনুসন্ধান।

তাই এ সকল সৎ ও সত্যপথের পথিক মহাপুরুষগণ যুগ যুগ ধরে মানবতার হিদায়াতের সিপাহসালার হয়ে রয়েছেন। একথা যেমন বলা যায় তেমনি তাঁদের অনুকরণে শান্তি, সমৃদ্ধি ও ঘুনেধারা সমাজ পেতে পারে একটি সুন্দর, সচ্ছল ও মর্যাদাসম্পন্ন এক মৌলিক কাঠামো। যে কাঠামো তাকে ধীরে ধীরে তাঁর মাঝে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করে পৌঁছে দিতে পারে চরম ও পরম কাংখিত সুখের নীড় জান্নাতে। মহান আল্লাহও হতে পারেন এ পথের পথিকগণের প্রতি সন্তুষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে 'আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী মুজাদ্দেদীর (রহ.) ইসলামের প্রচার-প্রসারে অবদান' অভিসন্দর্ভ প্রণয়ণের মাধ্যমে মহান স্রষ্টার যথার্থ সন্তুষ্টি অর্জন করে মানবতার কল্যাণ ও জনহীতে উক্ত অভিসন্দর্ভখানি কাজে আসলে যেমন তা প্রণয়ন স্বার্থক হবে, তেমনি এ কথা দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত ও সূর্যালোকের ন্যায় দ্বীপ্তমান যে, তাঁর বিদেহী আত্মা পাবে শান্তি এবং অগ্রজগণ ও শুভাকাংখীবৃন্দ হবেন তুষ্ট। আমাদের এ অতীব ক্ষুদ্র প্রয়াসও হবে সফল এবং স্বার্থক।

-০-

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআন ও আল-হাদীস

১। আল-কুরআন

২। সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনুল করীম বাংলা তরজমা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪ খ্রি.

৩। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দেওবন্দ : কুতুবখানা রহীমিয়্যাহ, ১৩৯৩ হি.

৪। ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, ঢাকা : কুতুবখানা ইসলামিয়া।

৫। আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, *আল-জামে আত-তিরমিযী*, দিল্লী : কুতুবখানায়ে রশীদিয়্যাহ, তা.বি.

৬। আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস আস-সাজিস্তানি, *সুনান আবি দাউদ*, বৈরুত : দারুল কিতাবুল আরাবি, তা.বি.

৭। আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইব্ন মাজা আল্-কাযবীনী, *আস্সুনান লি ইবন মাজা*, দেওবন্দ : আল্-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হিঃ

৮। ইমাম আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান লিল-বায়হাকী*, দেওবন্দ : আল্-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮০ হি.

৯। ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমদ*, দেওবন্দ : আল্-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, তা.বি.

১০। আব্দুল গাফফার হাসান নদভী, *এন্তেখাবে হাদীছ*, অনুবাদ- আব্দুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনি, ২০০০ খ্রি.

ইসলামী ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ

১১। মৌঃ মোঃ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী, *মারেফাতের ভেদতত্ত্ব*, ঢাকা : সিদ্দিকীয়া প্রেস, ১৯৮৯,

১২। অধ্যাপক মুহাম্মদ আযহারুল ইসলাম, *হযরত শাহ মাখদুম রূপোশ (রহ.), -এর বিস্ময়কর জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮,

Dhaka University Institutional Repository

১৩। আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *ইসলামী তাসাউফের স্বরূপ*, ঢাকা : সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ২০০২,

১৪। এম.এ.বাকী, *উপমহাদেশে কওমী মাদরাসা*, কলকাতা : হেলমন্দ প্রকাশনী, ৫৬, মানিক তলা, ১৯৬৯

১৫। আব্দুল হক ফরিদী, *মাদরাসা শিক্ষা বাংলাদেশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫খ্রি.

১৬। মাও শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) (অনু.), *তা'লিমুদ্দিন*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী,

১৭। মুহা. আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০

১৮। খালীক আহমদ নিজামী, *তারীখে মাশায়েখ চিস্ত*, দিল্লী : ১৯৬৩,

১৯। স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম* (অনু. ড. রশীদুল আলম), কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯১ খ্রি.

২০। সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯

২১। সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২

২২। সংকলক, *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

২৩। সাইয়্যেদ মাহবুব রিযভী, *তারীখ-ই-দারুল উলুম দেওবন্দ*, দেওবন্দ : ১৩৯৭/১৯৭৭, খণ্ড-২

২৪। গাওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জীলানী সাহেব (রহ.), (অনু. মাওলানা আবদুল জলিল (রহ.)), *সিররুল আসরার*, ঢাকা : হক লাইব্রেরী, ১৯৮৬খ্রি.

২৫। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদভী, *তাযকিয়া ওয়া ইহ্সান* (অনু. মুহাম্মাদ আবুল বাশার আখন্দ), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.

২৬। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.), *তালিমুদ্দিন*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২য় খণ্ড

২৭। জালালুদ্দীন রূমী, *বোসতাহ*, চকবাজার, ঢাকা : এমদাদিয়া কুতুবখানা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬

Dhaka University Institutional Repository

২৮। ড. আ. ন. ম রইছ উদ্দিন, *সূফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়,* ঢাকা : ২০০১খ্রি.

২৯। ড. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বায়'আত,* সিদ্দিকনগর, মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১ খ্রি.

৩০। ড. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বিশ্ব তা'লিমে যিকর,* সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.

৩১। হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আব্দুল আলীম রিজভী, *স্মারক আসলাফ-ই-জামেয়া* (জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নীয়া, চট্টগ্রাম-এর মরহুম শিক্ষকমণ্ডলী স্মরণে) সম্পাদনায় : সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশক : জামেয়া শিক্ষক পরিষদ, প্রকাশকাল : ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ খ্রি.,

৩২। মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস,* ঢাকা : আজাদ অফিস, ১৯৬৫খ্রি.

৩৩। মোমিন উল্যা, *উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বরূপ,* ঢাকা : তামজীদ প্রকাশনী, ১৯৬৭ খ্রি.

৩৪। আব্দুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮খ্রি.

৩৫। আব্দুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাংগালী সমাজ,* ঢাকা : তা.বি.

৩৬। আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলার ধর্মজীবন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭খ্রি., খ.১

৩৭। নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২বাংলা

৩৮। মুস্তফা নূর উল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭খ্রি.

৩৯। রহীমদ্দীন, *আব্দুল লতিফের মাই পাবলিক লাইফ*, ঢাকা : মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি, ১৯৪১খ্রি.

৪০। ড. এম. আব্দুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৪১। ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি. প্রথম খণ্ড

৪২। ড. এম.এ.রহীম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,* ঢাকা: ১৯৭৬ খ্রি.

৪৩। ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩খ্রি., ১ম, ২য় এবং ৩য় খণ্ড।

৪৪। দৈনিক মিল্লাত, ২৭ মে, ১৯৯০ খ্রি. ফিচার পাতা থেকে উদ্ধৃত

৪৫। Common Wealth Universities Year Book, (Association of Commonwelth Universities, 1993), Part No. 21, pp. 1019, 1038, 1077, 1172, 1459

৪৬। Devid Laliveled, *Aligarh's First Generation,* London : Oxford University Press, 1935

৪৭। Dr. A.K.M. Aiub Ali, *Commisson on National Education (S.M.Sharif Commission), 1958 report.*

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে

১। শাহজাদা মাও. আব্দুল কাদের জিলানী, মরহুমের ১ম পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মহাদেবপুর, দালাল বাজার, লক্ষ্মীপুর- ৩৭০০, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৩০/০৫/১৬ খ্রি.

২। মো. এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী, তিনি করিম বক্স পাটোয়ারীর নাতি। তিনি এলাকার বর্তমান গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ও বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। সাক্ষাৎকার গ্রহণ- ১৭/০৮/২০১৬ খ্রি.

৩। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ তোয়াহা, মরহুমের চাচাতো ভাই। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৭/০৮/২০১৬ খ্রি.

৪। মাওলানা আবুল কাশেম, ইমাম, পশ্চিম নন্দনপুর পাঞ্জেগানা মসজিদ, পশ্চিম নন্দনপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর- ৩৭০০, মরহুমের প্রতিবেশী এবং মাহফিলের সফরসঙ্গী। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : তাং- ৩১/০৫/২০১৬খ্রি.

৫। মাওলানা কাজী রকীবুদ্দীন, কুমিল্লা মহানগর, মরহুমের প্রাক্তন ছাত্র, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০৬/০৬/২০১৬ খ্রি. ও ১৮/০৩/২০১৭ খ্রি.

৬। মুহাম্মদ মুদাচ্ছির হোসেন, আল্লামা নক্সবন্দীর চাচাত ভাই ও সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢা.বি. এর অফিস সহকারী। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৯/০৪/২০১৬ ও ২২/০৫/২০১৬ খ্রি.

৭। শাহজাদা ফেরদাউস করিম দরবেশ, মরহুমের ২য় পরিবারের ২য় পুত্র, পশ্চিম নন্দনপুর, দক্ষিন হামছাদি, লক্ষ্মীপুর। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৩০/০৫/২০১৬খ্রি.

৮। শাহজাদা জহিরুল করিম ফারুক, মরহুমের দ্বিতীয় পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. ও ২৩/১২/২০১৬ খ্রি.

৯। শাহজাদী মারজান বেগম সুফিয়া, মরহুমের ২য় পরিবারের দ্বিতীয় কন্যা; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২১/০৭/২০১৬ খ্রি. ও ২৩/১২/২০১৬খ্রি.

১০। শাহজাদী রাহনুমা জিলানী পাটোয়ারী, মরহুমের ১ম পরিবারের প্রথম পুত্রের স্ত্রী, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৯, ৩০ শে মে, ২০১৬ খ্রি.

১১। কবি মাওলানা রুহুল আমিন খান, সহ-সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, মরহুমের হাতে গড়া প্রাক্তন ছাত্র। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৮/০২/২০১৭ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১২। হাফেজ মোহাম্মদ সেলমি, মুয়াজ্জিন, নন্দনপুর ঈদাগাহ জামে মসজিদ, দক্ষিন হামছাদি, লক্ষ্মীপুর সদর, ল্ক্ষীপুর, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০২/০৬/২০১৬ খ্রি.

১৩। জনাব ইসমাইল মিস্ত্রী, ২নং ওয়ার্ড, নন্দনপুর, ২নং দক্ষিণ হামদাদি ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর-৩৭০০; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০৩/০৬/২০১৬ খ্রি.

১৪। ডা. আমিন উল্যা, এলেপ্যাথিক ফার্মেসী, নন্দনপুর বাজার, নন্দনপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর-৩৭০০, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০২/০৬/২০১৬ খ্রি.

১৫। কামরুন নাহার, আল্লামা নক্সবন্দীর (রহ.), দ্বিতীয় পরিবারের তৃতীয় কণ্যা, উত্তরা ১৪ নং সেক্টরের বাসিন্দা, ঢাকা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৭/০৮/২০১৬ খ্রি.

-০-